গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট

কুমিল্লা জেলার উত্তর পৌত্তালী ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধারার বিশ্লেষণ

এম ফিল ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভ

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
রেজিস্ট্রেশন নং- ৪৭/ ১৯৮৫-৮৬

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডিসেম্বর, ১৯৯২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
382780

M.Phil.

382780

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট

কুমিল্লা জেলার উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধারার বিশ্লেষণ

GIFT

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

Dhaka University Library
382780

382780

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট

কুমিল্লা জেলার উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধারার বিশ্লেষন

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

তত্ত্বাবধানে :

ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মন
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

তারিখ : 19.12.92

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382780

ডিসেম্বর, ১৯৯২

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উপক্রমণিকা

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটের উপর গবেষনার জন্য কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন (ইউনিয়নটি বর্তমানে চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত) বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে গবেষনার সুবিধার্থে আরও একটি ইউনিয়নও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের নেতৃত্ব ধারা বিশ্লেষনের জন্য ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত উল্লেখিত এলাকার চেয়ারম্যান ও মেম্বারগনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী যতদূর সম্ভব যাচাই বাছাই করে এই গবেষনার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখা গেছে, গ্রামে এসব চেয়ারম্যান-মেম্বার যেমন প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী, তেমনি শ্রেণী ভেদে তারা বিত্তবানও বটে। গ্রামের বিভিন্ন ঘটনাকে পুঁজি করে তারাই মূলতঃ জনগনের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে এবং জনগনকে দু দু পক্ষে আনার প্রয়াস চালায়। গ্রামীন রাজনীতি পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতির প্রতিও তাদের কম বেশী আগ্রহ রয়েছে এবং অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয় রাজনীতির সাথে জড়িতও রয়েছে। গ্রামীন রাজনীতির সাথে জড়িত এসব এলিট অধিকাংশই ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের পছন্দনীয় বা নিজেরা জড়িত থাকা দলের নাম প্রকাশ করে ক্ষমতাসীন দলের আনুকূল্য বঞ্চিত হতে তারা নারাজ। এসব এলিট নিজেদের সর্বদাই সরকারী দলের সমর্থক হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। এই গবেষনায় এসব বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে।

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের নিয়ে গবেষনা করার আকাংখা আমার দীর্ঘ দিনের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আমাকে এম. ফিল. করার সুযো-গ দেওয়ায় আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে এবিষয়ে গবেষনা করার কাজে আমি বিশেষভাবে উৎসাহিত হই। আমার এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাকে গবেষনার আপ্রান সাহায্য করেছেন। তাই তাঁর কাছে আমি সর্বাধিক কৃতজ্ঞ। পরবর্তীতে আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় ডক্টর তালেম চন্দ্র বর্মন আমার গবেষনার কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অত্র গবেষনা কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আমার কাছে আজীবন স্মরনীয় হয়ে থাকবে। যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে তিনি আমাকে গবেষনার কাজে সাহায্য করার ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা সত্যিই বিরল। তাই তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় ডক্টর এমাজউদ্দিন আহমেদ স্যারের কাছেও আমি বেশ ঋণী। গবেষনার শুরু থেকেই তিনি আমাকে এব্যাপারে নির্দেশনা ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। গবেষনার কাজে এসব নির্দেশনা ও উপদেশ ছিল বেশ মূল্যবান। শত ব্যস্ততার মাঝেও যখন তখন আমাকে সাহায্য করতে তিনি দ্বিধা করেননি। এজন্য তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। অতঃপর আমার কৃতজ্ঞতা রয়েছে অত্র গবেষনার জন্য মনোনীত ইউনিয়নদ্বয়ের চেয়ারম্যান-গনের প্রতি। বিশেষ করে উত্তর পৌহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ কে এম কোরবান আলী এবং দক্ষিণ পৌহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া আমাকে গবেষনার জন্য যেভাবে সাহায্য করেছেন, তা একান্তভাবেই অবিস্মরনীয়। সরেজমিনে গবেষনা পরিচালনার সময় আমি যখনই ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হয়েছি বা কোন এলিট সম্পর্কে অবহিত হতে গিয়েছি, অর্থাৎ কারও ঠিকানা সংগ্রহ করতে গিয়েছি তারা দু'জনই আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন মেম্বার বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি ব্যক্তিকে চৌকিদারের সাহায্যে তারা ডেকে এনেছেন। এছাড়া, স্থানীয় কয়েকজন প্রাক্তন মেম্বার, বেশ কয়েকজন প্রবীন লোক এবং আমার কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুর সহযোগিতার জন্য তাদের সবার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে এম. ফিল. করার সুযোগ দানের জন্য সবশেষে কৃতজ্ঞতা রইল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি।

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম :-	ভূমিকা - বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- প্রাক-পাকিস্তান আমলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন- সাবেক পাকিস্তান আমলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি- বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন- গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটের স্বরূপ ও বর্তমান গবেষনা- গবেষনার স্থান ও উত্তরদাতা নির্বাচন- তথ্য সংগ্রহ - তথ্য বিশ্লেষন - গবেষনার সীমাবদ্ধতা- গবেষনার শ্রেণী -বন্টনকরন	১ - ৩১
দ্বিতীয় :-	স্থানীয় ইতিহাস ও অন্যান্য প্রসংগ :- গৌহাটী ইউনিয়নের ইতিহাস- জাতীয় দৃশ্যপটে গৌহাটী ইউনিয়ন- গৌহাটী ইউনিয়নের সীমানা - গৌহাটী ইউনি -য়ন ও জাতীয় আকোলন - জনগনের সামাজিক ও ধর্মীয় বিন্যাস এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য - জনসাধারনের পেশা - স্থানীয় অফিস ও প্রতিষ্ঠানাদি - যোগাযোগ পরি -বহন ও বাজারের সুযোগ সুবিধা - আবাসিক অবস্থা- ভূমি ও কৃষি	৩২ - ৮৭
তৃতীয় :-	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন : দলাদলির রাজনীতি	৮৮ - ১০৭
চতুর্থ :-	গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের সামাজিক পটভূমি - লিংগ -বয়স- শিক্ষা- এলিট পরিবার পরিজনদের শিক্ষা- জমির মালিকানা- বাৎসরিক আয়- এলিট পরিবারের আয়তন ও প্রকৃতি - পূর্ব অভিজ্ঞতা - এলিটদের সংস্কৃতি - এলিটদের আত্মীয়তার বন্ধন	১০৮- ১৩৮
পঞ্চম :-	গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী - জনসাধারনের সমস্যা অনুধাবন ও সমাধানের উপায় দানের ক্ষমতা- পরিবার পরিকল্পনার প্রতি এলিটদের মনোভাব -	

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে এলি-টদের মনোভাব – সমস্যা নিরসনে এলিটদের দূরদর্শিতা – সরকারের ধরন সম্পর্কে এলিটদের মতামত – গ্রামীন উন্নয়ন সম্পর্কে এলিটদের মতামত – এলিটদের কর্তব্য জ্ঞান – ইউনিয়ন পরিষদের সভায় অংশ গ্রহন – জনসাধারনের কাছে ব্যয়িত সময় – গ্রামীন বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে এলিটদের ধারনা ১৩৯ – ১৬২

ষষ্ঠ :– রাজনৈতিক দলের সাথে এলিটদের সম্পর্ক – এলিটদের দলীয় অবস্থান – এলিটদের দলীয় আনুগত্য ও দল ত্যাগের কারন ১৬৩ – ১৬৯

সপ্তম :– উপসংহার ১৭০ – ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সারনী তালিকা

সারনী নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২:১-	বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে গৌহাটী ইউনিয়ন	৬৯
৩:১-	১৯৭৩ সালের নির্বাচনে মেম্বার প্রার্থীর তালিকা	৯৯
৩:২-	১৯৭৭ সালের নির্বাচনে মেম্বার প্রার্থীর তালিকা	৯৯
৩:৩-	১৯৮৪ সালের নির্বাচনে মেম্বার প্রার্থীর তালিকা	১০০
৩:৪-	ভাইস-চেয়ারম্যান প্রার্থীর তালিকা	১০৯
৩:৫-	চেয়ারম্যান প্রার্থীর তালিকা	১০২
৪:১-	বয়সের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ	১১১
৪:২-	শিক্ষা ভিত্তিক এলিটের শ্রেণী ভাগ	১১৪
৪·৩-	পেশা ভিত্তিক এলিটের শ্রেণী ভাগ	১১৯
৪·৪-	প্রতিপত্তির ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ	১২৮
৪·৫-	রেডিও-এর মালিকানা অনুযায়ী এলিটের শ্রেণী ভাগ	১৩২
৪·৬-	টেলিভিশনের মালিকানা ও দর্শনের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ	১৩৪
৪·৭-	খবরের কাগজ পঠন অনুযায়ী এলিটের শ্রেণী ভাগ	১৩৫
৫·১-	পরিবার পরিকল্পনার প্রতি মনোভাবের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ	১৪৫
৫·২-	ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা মেম্বারদের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে মনোভাবের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ	১৪৭
৫·৩-	যৌতুক সম্পর্কে মনোভাবের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ	১৪৯
৫·৪-	স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ	১৫০
৬·১-	রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থনের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ	১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়ন ক্ষেত্রে আজ ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনীতি অধ্যয়ন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনেকটা অকার্যকর প্রতিভাত হয়েছে। কেননা, ঐতিহাসিক পদ্ধতি পশ্চিমা রাজনীতির সংকীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল। পশ্চিমা পন্ডিতগন তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনায় ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো বেছে নিয়েছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনায় তাঁদের বেশ অনীহা ছিল। তাঁদের ধারনা ছিল, ইউরোপের বাইরে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, "এশিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, এশিয়ায় প্রকৃতপক্ষে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই।"[১] ঐতিহাসিক পদ্ধতির এই সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার দরুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই পদ্ধতির কার্যকারিতা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কেননা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক দেশই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এসব দেশের বেশীর ভাগ পশ্চিমা সংস্কৃতির ছোঁয়ামুক্ত তথা নিজস্ব সংস্কৃতির সত্ত্বা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার আলোচনায় সীমিত ঐতিহাসিক পদ্ধতির সংকীর্ণতা এড়িয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগন তাই রাজনীতি অধ্যয়ন ক্ষেত্রে নতুন পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। আর তাই উন্নয়নশীল তথা সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের রাজনীতি অধ্যয়নে এক নতুন দৃষ্টিভংগীর জন্ম হয়। উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি অধ্যয়নে এই নতুন দৃষ্টিভংগীর আলোকে এলিট অধ্যয়নই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে হয়। এপ্রসংগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাল্টোর মন্তব্য তুলে ধরা যায়। তিনি বলেছেন,

" Research on the social background of political elite holds particular promise in the study of Asian, African and Latin American politics, where the institutional approach tends to mislead and functionalist approach to confuse ."[২]

এলিট সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। সমাজে যারা প্রভাব, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখে, সাধারনতঃ তারাই এলিট

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে পরিচিত । Mosca তাঁর The Ruling Class গ্রন্থে বলেছেন ," In all societies- from societies that are very meagrely developed and have barely attained the dawning of civilization, down to the most advanced and powerful societies two classes of people appear-a class that rules and a class that is ruled. The first class always the numerous, performs all political functions, monopolizes power and enjoys the advantages that power brings, whereasthe second, the more numerous class, is directed and controlled by the first."[৩] সুতরাং আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসক ও শাসিত- এই দু'টি শ্রেণী রয়েছে। শাসক শ্রেণীটি সংখ্যায় কম হলেও রাজনৈতিক স্বার্থকলাপ ও ক্ষমতার সাথে এরাই সর্বাধিক জড়িত। তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই সমাজের যাবতীয় কার্যবলী সম্পন্ন হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এই শ্রেণীটিই রাজনৈতিক এলিট। এছাড়াও সমাজে আরও কয়েক শ্রেণীর এলিট রয়েছে। তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকলেও বা ক্ষমতার সাথে তারা সরাসরি জড়িত না থাকলেও তাদের বেশ প্রভাব রয়েছে। তারা রাজনীতিকে যেমন প্রভাবিত করতে পারে, তেমনি সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রেও স্বীয় স্বার্থ টিকিয়ে রাখার ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এসব এলিট হল- ক) ধর্মীয় এলিট, খ) সাংস্কৃতিক এলিট, গ) শিল্প এলিট, ঘ) ব্যবসায়ী এলিট, ঙ) সামরিক এলিট, চ) বুদ্ধিজীবি এলিট, ছ) পেশাজীবি এলিট প্রভৃতি। এসব এলিট শাসিত হয় ঠিকই, তবে পালাক্রমে এরাও শাসক হয়। তাছাড়া, রাজনৈতিক এলিটের সাথে এরা কোন না কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত। তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নে রাজনৈতিক এলিটের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয় সব চেয়ে বেশী।

বাংলাদেশের রাজনীতি অধ্যয়নেও এলিট অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এলিট অধ্যয়নে বেশ কিছু প্রয়াস চালানো হয়েছে। বলতে গেলে জাতীয় পর্যায়ের এলিটদের নিয়েই অধ্যয়ন কাজ চলেছে সবচেয়ে বেশী। আর সে তুলনায় স্থানীয় এলিট অধ্যয়নের মাত্রা খুবই কম। স্থানীয় এলিট অধ্যয়ন গ্রামীনবা শহর পর্যায়ের হতে পারে। তবে এই অধ্যয়ন গ্রামীন পর্যায়ের বিষয় গ্রামীনএলিটদের নিয়েই এখানে আলোচনা হবে। এসব এলিট ইউনিয়ন পরিষদে রীতিসিদ্ধ পদ মর্যাদায় আসীনহয়ে গ্রামীন রাজনীতি নিয়ন্ত্রন

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকে। আর ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সর্বনিম্ন স্তর।

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ইতিহাস খুব বেশী দিন আগের নয়। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনামলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। এর আগে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ততটা গুরুত্ব ছিলনা। বাংলাদেশে দুই ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন রয়েছে। এদের একটি গ্রামাঞ্চলের জন্য এবং অপরটি শহরাঞ্চলের জন্য। গ্রামীন স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। অত্র আলোচনায় ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্ব সহকারে বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরন দেওয়া গেল।

প্রাক-পাকিস্তান আমলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ব্রিটিশ শাসনামলে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও আইন প্রয়োজনীয়তা
-শৃংখলা পরিস্থিতির কারনেই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার/ইংরেজ শাসকরা অনুভব করে। ইংরেজ প্রশাসন তদীয় আরোপিত খাজনা ও বিভিন্ন কর আদায়ে ব্যর্থ হয়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কায়েম করার উদ্যোগ নেয়। লর্ড মেও-এর শাসনামলে সর্ব প্রথম স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সূত্রপাত ঘটে। ১৮৭০ সনে বাংলাদেশে সর্ব প্রথম স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কায়েমের উদ্যোগ নিয়ে আইন পাশ হয়। এর আগে যে গ্রামে কোন শাসন ছিল না, তা নয়। তবে যা ছিল তা ততটা সুসংগঠিত ছিল না এবং গ্রামে কোন স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানও ছিল না। গ্রামের স্থানীয় শাসন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট গ্রামেই সীমিত ছিল। এম এ চৌধুরী লিখেন, "The villages in the old days had Panchayats or the bodies of elders who were responsible to run village affairs." [৪]

১৮৭০ সনে The Village Chaukidari Act, 1870(Bengal Act VI of 1870) পাশ হয়। [৫] এই আইন'বেঙ্গল ভিলেজ চৌকিদারী এ্যাক্ট' নামে পরিচিত। এই আইনের ফলে ইউনিয়ন নামের স্বায়ত্ত শাসনের প্রাথমিক স্তর সৃষ্টি হয়, যা কতকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই আইন তিন থেকে পাঁচ সদস্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের বিধান জারি করে। পঞ্চায়েত গঠনের ক্ষমতা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট-কে প্রদান করে এর তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে," The Distrfict Magistrate may,- by an order in writing, appoint not less than three nor more than five residents in any village within the district of which he has charge to be the panchayat there of;" [৬]

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রাথমিক স্তর ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কেউ তা গ্রহনে অস্বীকৃতি জানালে বা দায়িত্ব উপেক্ষা করলে তাকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার বিধান ছিল। অপরদিকে, পঞ্চায়েতের সদস্য যে কেউ হতে পারতনা। কর প্রদানকারী ও জমি-জমার মালিক প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন ব্যক্তিই পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারত। কোন ব্যক্তি কোন গ্রামের অধিবাসী না হলে, বা সেই গ্রামে তার জমি-জমা না থাকলে পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা তার ছিল না। এই আইন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চায়েত নিয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করে। তবে গ্রামের অধিবাসীরা লিখিতভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পঞ্চায়েত নিয়োগের ব্যাপারে আবেদন জানালে আইনতঃ তা গৃহীত হত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মনঃপুত না হলে তিনি যে কোন পঞ্চায়েত সদস্যকে অযোগ্য ঘোষনা করে নতুন সদস্য মনোনীত করতে পারতেন।

পঞ্চায়েতের কার্যকাল ছিল তিন বছর। এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন পঞ্চায়েত সদস্যকেই তার সম্মতি ছাড়া পুনরায় পঞ্চায়েতের সদস্য নিয়োগ করা যেত না। পঞ্চায়েতের দায়িত্বের সীমাবদ্ধতা ছিল " appointing watchmen and assessing all owners in order to provide for payment of their salaries, over whom they were to exercise general control."[৭] তাছাড়া, পঞ্চায়েত গ্রামের জন্য চৌকিদারের সংখ্যা নির্ধারিন করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনক্রমে তাদের নিয়োগ করতে পারত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনক্রমে পঞ্চায়েত চৌকিদারের বেতন নির্ধারিন করত। চৌকিদারের বেতন ও সরঞ্জাম বাবদ খরচ মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানোর নিমিত্ত পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপর সমপরিমান কর এবং অতিরিক্ত ১৫% ভাগ কর ধার্য করা আদায় খরচ বা অনাদায়জনিত ক্ষতিপূরন বাবদ আরোপ করতে পারত। এরূপ কর প্রদানকারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে," All owners or occupiers of houses in any village, and any person who has within such village a cutchery for collecting rents, shall be liable to assessment."[৮] জনসাধারনের আর্থিক অবস্থা ও হেফাজতের নিমিত্ত বিষয় সম্পত্তি অনুসারে গ্রাম থেকে কর আদায়ের বিধান এই আইনে রাখা হয়। মোটকথা, গ্রামের জনসাধারনের মধ্যে যারা অর্থ-বিত্তের অধিকারী ছিল এবং সেসবের হেফাজতের জন্য গ্রাম চৌকিদারের পাহারার প্রয়োজন ছিল তাদের উপরই এই কর আরোপ করা হয়। এই কর সবার উপর সমানভাবে ধার্য্য ছিল না। এই করের পরিমান সম্পর্কে বলা হয়েছে," ... ... the amount to be assessed on any one person shall not be more than one rupee eight annas per mensem."[৯] ১৯২২ সনে প্রণীত বংগীয় চৌকিদারী আইনে এই করের পরিমান সংশোধন করা হয়। উক্ত আইনে এই কর এক টাকা আট আনার বদলে কেবলমাত্র এক টাকা ধার্য্য করা হয়। গ্রামে কর আরোপ এবং চৌকিদার নিয়োগ করলেও

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা ছিল পঞ্চায়েতের অন্যতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের একমাত্র অবলম্বন ছিল গ্রাম চৌকিদার। গ্রাম চৌকিদারের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা ছিল না। পঞ্চায়েত চৌকিদারের সংখ্যা নির্ধারন করে তাদের নিয়োগ দানের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন গ্রহন করত। তবে " The number of Chaukidars that could be employed was two for every fifty houses at a monthly salary of Rs. 3."[১০]

১৮৭০ সনের বংগীয় চৌকিদারী আইন পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি স্থানে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এই আইন যথাযথভাবে কার্যকরী করতে বংগীয় সরকারের তেমন আগ্রহ ছিল না। ফলে বাংলাদেশে এই আইনের তেমন সুফল পাওয়া যায়নি। এদিকে, ১৮৭১ সনে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কিত আর একটি বিল আনা হয়। মূলতঃ গ্রামের মানুষের কাছ থেকে কর ও খাজনা আদায়কে মূল উদ্দেশ্য করেই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কায়েমের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তবে ১৮৭১ সনের আইনের আর একটা তাৎপর্য ছিল। যদিও এই আইন ১৮৭০ সনের আইনেরই প্রতিধ্বনি, তথাপি এর একটা আলাদা বিশেষত্ব ছিল এই যে, এই আইন গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে।[১১]

১৮৮২ সনে তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের পুনর্গঠন করার সুপারিশ করেন। তাঁর এই সুপারিশ বিবেচনা করে ১৮৮৫ সনে 'দি বেঙ্গল লোক্যাল সেলফ গভার্ণমেন্ট এ্যাক্ট' পাশ হয়। এই আইন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করে। এগুলো হলো- ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমার জন্য লোক্যাল বোর্ড এবং জেলার জন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন কমিটি নির্বাচনের বিধান ছিল। এই কমিটি নির্বাচন করার অধিকার সেসব জনসাধারনেরই ছিল, যারা ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং যাদের বাড়ি-ঘর ও সহায় সম্পত্তি আছে। ইউনিয়ন কমিটিগুলোকে জেলা বোর্ডের অধীনে রাখা হয় এবং বৃহত্তর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা এই বোর্ডের হাতেই দেওয়া হয়। অপরদিকে, মহকুমা বোর্ড ইউনিয়ন কমিটি ও জেলা বোর্ডের মধ্যে সমন্বয়কারীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। " Since 1885, there were two types of local authorities at the union level, namely the Chaukidari Panchayats established under the Chaukidari Act of 1870 and the union committees set up under the Local Self Government Act of 1885."[১২]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫ সনের আইনে ইউনিয়ন কমিটিগুলোকে পৌর কার্যাবলী সংক্রান্ত ক্ষমতা, যেমন - স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা প্রভৃতি সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া হলেও গ্রাম চৌকিদারের ব্যবস্থাপনা ১৮৭০ সনের আইন মোতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনেই রেখে দেওয়া হয়। এভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের গ্রামীন পর্যায়ে দ্বৈত কর্তৃত্ব বহাল থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কোন কর্তৃপক্ষেরই ছিল না।

১৮৯২ সনে বংগীয় সরকার প্রশাসনিক কার্যক্রমের উপর রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি স্থানীয় সংস্থাগুলোর গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এদের ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের সুপারিশ করেন। কমিটি কর্তৃক পেশকৃত এই সুপারিশ তখন কার্যকরী করা হয়নি।

১৯১৯ সনে 'দি বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভার্ণমেন্ট এ্যাক্ট' পাশ হয়। ইউনিয়নের গঠন ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে এই আইন বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটিকে একত্রিত করে ইউনিয়ন বোর্ডে রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু জেলা বোর্ড অপরিবর্তিত থাকে এবং জেলা বোর্ডের পূর্বের ক্ষমতাও বহাল থাকে। ১৯১৯ সালের আইনে ৬ থেকে ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত ছিল। এদের দুই-তৃতীয়াংশ জনগন কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার এবং এক তৃতীয়াংশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হওয়ার বিধান এই আইনে রাখা হয়। প্রকাশ্য ভোট দানের মাধ্যমে এরূপ নির্বাচন সম্পন্ন হত। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। বোর্ডের সদস্যগনের মধ্য থেকে সদস্যদের নিজেদের ভোটে এই দুইজন নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন বোর্ড এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের নির্বাচন পদ্ধতি ১৯১৯ সনে চালু হলেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে মনোনীত করার বিধান অনেকদিন অব্যাহত থাকে। "The system of nomination continued till 1945 when it was abolished on the recommendation of the Bengal Administrative Enquiry Committee, 1944 - 45."[১৩] তাছাড়া, এই আইনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ইহা ইউনিয়ন বোর্ডকে বেশ কিছু ক্ষমতা প্রদান করে। " The functions of the Board were extended to cover watch and ward, communication, education, sanitation and

Dhaka University Institutional Repository

of
settling / property disputes in civil and criminal cases.The Board was authorised to levy local rate to meet its expenditure".[১৪] ইউনিয়ন বোর্ডগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য সার্কেল অফিসারের পদও এই আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়। এই আইন একদিকে নারীদের যেমন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে , তেমনি সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীও ভোটাধিকার পায়নি। কেবলমাত্র " The franchise was limited to those male persons of twenty one years and over, who paid one rupee as tax or cess."[১৫] এই আইনের সীমাবদ্ধতা গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে কেবল ভোটাধিকার থেকেই বঞ্চিত করেনি, ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হওয়ার পথও রোধ করেছে।

(খ) পাকিস্তান আমলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯১৯ সনে প্রণীত আইনের উপর ভিত্তি করেই ১৯৫৬ সনে ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল । তবে এসময়ের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল, এসময়ে ইউনিয়ন বোর্ডসহ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থাগুলোকে পূর্বের তুলনায় কিছুটা গণমুখী করা হয়েছিল। এসময়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ভোট দানের অধিকার প্রদানের পাশাপাশি ভোটদান পদ্ধতিরও পরিবর্তন করা হয়। বিশেষ করে " Introduction of secret ballots and direct election of the Union Board Presidents and Vice-Presidents marked further advances."[১৬] বস্তুত: স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার এটা একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, যদিও এদের কাঠামোগত কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

(গ) মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে সামান্য কিছুটা উন্নতি ছাড়া তেমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কিন্তু ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হওয়ার সাথে সাথে কেবল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনই নয়, সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক পদ্ধতিতেও ব্যাপক রদ বদল সাধিত হয়। এই পরিবর্তন সাধনের মূলে রয়েছে সামরিক সরকার

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভাবিত মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি।" The Basic Democracies were established exactly one year after the regime's seizure of power, and soon came to be regarded as the mainstay of the new political system. The Basic Democracies programme was variously hailed as the ultimate in the political wisdom on the one hand and on the other -r hand as a mere sop to democratic sentiment ." [১৭] সেনাপতি থেকে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহন করার পরই আইয়ুব খান এই মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতির জন্ম দেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল"To help create legitimacy for the Ayub regime by establishing a new cadre of rural political leaders who would recruit support for the regime." [১৮] এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতি তিরোহিত হয়ে যায়।আর এর বিকল্প হিসেবে ৮০০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী সৃষ্টি হয়, যার ৪০০০০ ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং ৪০০০০ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। এই ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী মূলত: আইয়ুব খানের একনায়কত্ব কায়েমের এক সুযোগ্য-বাহিনী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এসব মৌলিক গণতন্ত্রীর সমর্থন নিয়ে সেনাপতি আইয়ুব খান দইবার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এরা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী রাষ্ট্রপতিকেও নির্বাচিত করার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ আইয়ুব খান উদ্ভাবিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা ইউনিয়ন কাউন্সিলের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন করে চেয়ারম্যান, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং দেশের প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করার আইনগত অধিকার লাভ করে। মোটকথা, তারা একাধারে ৪টি ভোটের অধিকারী ছিল।

মৌলিক গণতন্ত্রের জন্মদাতা আইয়ুব খান ইহাকে পিরামিড আকৃতির ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন যে, মৌলিক গণতন্ত্র হলো এমন একটা ভিত্তি " on which an upward pyramid of a sound political system can be developed."[১৯] ইহা পাঁচ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কায়েম করে। এসব স্তর হলো,' Union Councils, Thana Councils, District Councils, Divisional Councils and Provincial Development Advisory Councils."[২০]

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বিত সাধন পরিচালনার সুবিধার্থে Provincial Development Advisory Councils গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সনে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের পর তা বিলোপ করা হয়। সংক্ষেপে, মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি চালু করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে আইয়ুব খান বলেছিলেন, "We have kept the following factors in view of determining the system of Basic Democracy for our country. First, this type of democracy will not be foisted upon the people from above. Instead, it will work from below gradually going to the top. Second, the people will not have to go far from their neighbourhood to elect their representatives. It is highly difficult for an electorate in rural areas where literacy does not prevail to elect their representatives from forty to one hundred persons in the constituency .... The third factor which will be formed will be free from the curse of party intrigues, political pressures and tub-thumping politicians that characterised the Assemblies in our country in the past ." [২১] জনগণের রাজনীতি সচেতন এবং রাজনীতিতে তাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই পদ্ধতি চালু করা হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণ যেমন রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়, তেমনি নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও তারা বেশ অজ্ঞ। জনগণের এই অজ্ঞতাই মূলত: মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত রচনায় সহায়তা করেছিল। " The Basic Democracies system was designed to accomplish multiple political activities. It was expected to mobilize the mass of the people especially in rural areas, for development actvities , and to give them a sense of active participation in local affairs." [২২] মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্তনকালে

Dhaka University Institutional Repository

জনগনের অংশ গ্রহনের বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো ভাবে ব্যক্ত করা হলেও প্রকৃত পক্ষে রাজনীতিতে তাদের অংশ গ্রহন অত্যন্ত সীমিত ছিল। জনগনের একটাই মাত্র ভোট ছিল। তাদের ভোটে নির্বাচিত মৌলিক গনতন্ত্রীরা জাতীয় পর্যায়ে বিরাট ভূমিকা পালন করত।

মৌলিক গনতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্তনকালে শহুরে অভিজাত শ্রেণী ও গ্রামীন সাধারন মানুষের মধ্যকার ব্যবধান এবং শহরের সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীকর্তৃক গ্রামের বৃহত্তর জন গোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব করার ঝিরিঝিরি তুলে ধরে আইয়ুব খান বলেছিলেন"... the people in the villages suffered from a sense of domination and exploitation by the elite of the town."[২৩] গ্রামীন মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা এবং গ্রামীন মানুষকে নেতৃত্বের লোভে ফেলে একনায়কতন্ত্রকে পাকা পোক্ত করাই ছিল এরূপ পদ্ধতির মূলকথা। তবে একথা সত্য যে, সীমিত পর্যায়ে হলেও মৌলিক গনতন্ত্র পদ্ধতি গ্রামীন নেতৃত্বে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। গ্রামীন মানুষের চিন্তা চেতনার প্রসার যেমন ঘটেছে, তেমনি এপদ্ধতির আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতেও তারা সক্ষম হয়েছে।

মৌলিক গনতন্ত্র পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করার জন্য গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে জনগনকে বেশ আকৃষ্ট করা হলেও ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আত্মসাৎ প্রভৃতি অপকর্মের দরুন জনগনের মাঝে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝেও দারুন হতাশার সৃষ্টি হয়। কারন গতানুগতিক রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রচল হয়ে পড়ায় চরম রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়। কেননা, পক্ষ-সমর্থন আদায়ের জন্য সভা-সমিতির আয়োজন করে ও প্রচারাভিযান চালিয়ে স্থানীয়,জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাদি জনগনের সামনে তুলে ধরে রাজনৈতিক দলের প্রতি বা দলীয় কর্মসূচীর প্রতি জনগনকে আকৃষ্ট করার পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তখন"the number of the electors was small, face to face contact, local issues and money were important factors."[২৪] বস্তুতঃমৌলিক গনতন্ত্র পদ্ধতিতে গনতন্ত্রকে জনগনের দোরগোড়ায় পৌছিয়ে দিতে গিয়ে দুর্নীতি, স্বজন প্রীতি, দোষন আর বৈষম্যকে যেভাবে জনগনের দোর গোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা-ই ডেকে এনেছিল '৬৯এর গণঅভ্যুত্থান।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক গনতন্ত্রের সর্বনিম্ন স্তর ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল। ব্রিটিশ শাসনামলে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডকে ১৯৫৯ সনে ইউনিয়ন কাউন্সিলে রূপান্তরিত করা হয়। প্রত্যেক ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। ইহাদের শতকরা ৫০ ভাগ মনোনয়নের মাধ্যমে নিযুক্ত করার বিধান ছিল এবং ডেপুটি কমিশনারকে এরূপ মনোনয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য ১৯৬২ সনের সংবিধান প্রনয়নের অনতিকাল পরেই এই মনোনয়ন বিধান বাতিল করা হয়।

ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যকাল ছিল পাঁচ বছর। তবে বিভাগীয় কমিশনারের আদেশে নির্ধারিত সময়ের আগেও তা ভেংগে দেওয়ার বিধান ছিল। সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বারগন নির্বাচিত হতেন এবং তাদের মধ্যে থেকে নিজেদের ভোটে তারা একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন। চেয়ারম্যানই ছিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাহী প্রধান এবং নির্ধারিত পাঁচ বছর শেষ হওয়ার আগে মেম্বারগন তাকে অপসারন করতে পারতো না। উল্লেখ্য, মৌলিক গনতন্ত্রে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের পদ চেয়ারম্যান পদে রূপান্তরিত হয় এবং ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ বিলুপ্ত করা হয়।

ঘ) বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

১৯৭০ সনে পাকিস্তানে প্রথম বারের মত সাধারন নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন সমাপ্ত হলেও একই সময়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে ১৯৬৫ সনে নির্বাচিত মৌলিক গনতন্ত্রীরাই ঐসময় পর্যন্ত ইউনিয়ন কাউন্সিলে গনপ্রতিনিধিত্ব করছিল, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর সে সব প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্বের বৈধতা আর থাকে না। ফলে নতুন ভাবে নির্বাচন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের পুনর্গঠন না করে অনুবর্তীকালীন ব্যবস্থা নেন। এই ব্যবস্থাধীনে গ্রামে গ্রামে রিলিফ সামগ্রী বিলি বন্টনের জন্য থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রান ও পুনর্বাসন কমিটি গঠন করেন। ক্ষমতাসীনদলের সদস্যদের মধ্য থেকে এসব কমিটির সদস্যদের মনোনীত করা হয়। প্রতি গ্রাম থেকে দুই বা তিনজন করে এই কমিটির সদস্য করা হয় এবং প্রতি ইউনিয়নের জন্য কমিটির একজন চেয়ারম্যানও মনোনীত করা হয়। কিন্তু অনতিকাল পরেই সরকার স্থানীয় সংস্থা গুলোর পুনর্গঠনের জন্য Bangladesh Local Councils and Municipal Committees

Dhaka University Institutional Repository

বা বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কমিটি (Dissolution and Administration) আদেশ, ১৯৭২ জারি করেন।[২৫] এই আদেশ বলে মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতির বিলোপ সাধন করা হয়। একই সংগে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে ইউনিয়ন পরিষদে, টাউন কমিটিকে শহর কমিটি, মিউনিসিপ্যালিটিকে পৌর সভা ও জেলা পরিষদকে জেলা বোর্ড নামকরন করা হয়। উল্লেখিত আদেশ বলে সরকার প্রত্যেক গ্রাম থেকে তিন বা ততোধিক সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করেন। একজন চেয়ারম্যান এই কমিটির প্রধান ছিল। এই কমিটি সাধারনভাবে ত্রান ও পুনর্বাসন কমিটি নামে পরিচিত ছিল। এরপর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৭/১৯৭২ জারি হয়।[২৬] পূর্ববর্তী আদেশের সংশোধনী হিসেবে এই আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশে মহকুমা প্রশাসককে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অল্পকাল পরেই রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১১০/১৯৭২ জারি করে[২৭] রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭/১৯৭২ এর দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয়। স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করার বিধান এই আদেশে জারি করা হয়। এই আদেশে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রশাসক হিসেবে কৃষি সহকারী বা তহশীলদারদের মনোনীত করার কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অনতিকাল পরেই রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১১৩/১৯৭২ জারির[২৮] মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭/১৯৭২ এর তৃতীয় সংশোধনী আনা হয়। এই আদেশে প্রতিটি স্থানীয় সংস্থাকে ১০ টি সাধারন ওয়ার্ডে বিভক্ত করার কথা বলা হয়।

এভাবে একের পর এক পরিবর্তন ও সংশোধনের মাধ্যমে এগিয়ে চললেও কোনটারই কার্যকারিতা সরকারের কাছে গ্রহনযোগ্য হয়নি। ফলে স্থানীয় শাসন সম্পর্কে সরকারকে আরও সুদূর প্রসারী ভূমিকা নিতে হয়। ১৯৭২ সনের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হয়। এই সংবিধান সরকারকে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা প্রদান করে। সংবিধানের ৫৯(১) ধারায় বলা হয়েছে, " নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠান -সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।"[২৯] আরও বলা হয়েছে, "..... সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"[৩০] সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন ও পৌরসভা) আদেশ, ১৯৭৩ তথা রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২/১৯৭৩ জারি করেন।[৩১] এই আদেশে ইউনিয়ন পরিষদের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদকে তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়। প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন করে মোট ৯ জন মেম্বার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এই আদেশ মোতাবেক চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও মেম্বারসহ ১১ জন প্রতিনিধিই জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান ইউনিয়নের অধিবাসীদের এবং মেম্বারগন স্ব স্ব ওয়ার্ডের অধিবাসীদের ভোটে নির্বাচিত হয়। এই আদেশ বলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৫টি ভোট দানের অধিকার লাভ করে। এই আদেশ জারির পর সরকার একই বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩ সনেই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আয়োজন করেন।

১৯৭৫ সনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়ও কিছুটা রদ বদল হয়। সরকার ১৯৭৬ সনে 'দি লোক্যাল গভার্ণমেন্ট অর্ডিন্যান্স' জারি করেন।[৩২] জারিকৃত এই অধ্যাদেশ দেশে তিন স্তরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই তিনটি স্তর হলো- ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, থানার জন্য থানা পরিষদ এবং জেলার জন্য জেলা পরিষদ। তবে এই অধ্যাদেশ প্রত্যেক ইউনিয়নে ৩টি ওয়ার্ড, প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য ৩জন মেম্বার এবং স্ব স্ব ওয়ার্ডে মেম্বার নির্বাচনের বেলায় জনগনের ৩টি ভোট প্রদানের অধিকার সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আদেশের শর্তগুলো অক্ষুন্ন রাখে। এই আদেশ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার আদেশ বাতিল করে দেয়। অর্থাৎ উক্ত পদটি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। জনগনের সরাসরি ভোটে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধানও এই আদেশে অক্ষুন্ন রাখা হয়। তাছাড়া, এই আদেশে প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য ২জন মহিলা মেম্বার মনোনীত করার বিধান রাখা হয়। এদু'জনকে মনোনীত করার ক্ষমতা মহকুমা প্রশাসককে প্রদান করা হয়। নতুন এই অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল পূর্বের ন্যায় পাঁচ বছরই রাখা হয়। এই নতুন এই আদেশের অধীনে ১৯৭৭ সনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৬ সনের অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করা হয়। এই অধ্যাদেশ মোতাবেক নির্বাচিত চেয়ারম্যানগন সম্মানী ভাতা পেত। তাছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদকে অধিক কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (অধ্যাদেশ নং ৬১/১৯৭৬)' জারি করা হয়।[৩৩] এতে গ্রামের ছোট খাটো অপরাধ ও ভূমি-সম্বা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার ভার ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যাদেশে ইউনিয়নের মধ্যে গ্রাম পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়। পরবর্তীতে সরকার এই আদেশ বলেই সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রাম সরকার গঠন করেছিলেন।

১৯৮২ সনে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর সামরিক সরকার ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যকালের উপর কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করেন। সামরিক সরকার 'দি লোকাল গভার্ণমেন্ট (ইউনিয়ন পরিষদস) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (অর্ডিন্যান্স নং৫১/১৯৮৩)' জারি করে।[৩৪] ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী ১৯৭৬ সনের অনুরূপ রাখা হলেও এই অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছরের স্থলে ৩ বছর করা হয়। অপরদিকে, মনোনীত মহিলা মেম্বারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ইতিপূর্বে এই সংখ্যা ইউনিয়ন প্রতি ২ জন ছিল। এই অধ্যাদেশে এই সংখ্যা ওয়ার্ড প্রতি একজন নিয়ে প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন করা হয়। তাছাড়া, এই আইনে চেয়ারম্যান ও মেম্বার – উভয়কেই সম্মানী দেওয়ার বিধান চালু করা হয়। এই আইনে গ্রাম আদালত বিলোপ করা হয়নি। উপরন্তু ইউনিয়ন পরিষদকে আরও অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯৮২ সনে জারিকৃত উক্ত অধ্যাদেশ মোতাবেক ১৯৮৪ সনে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট

স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এই আলোচনায় ইউনিয়ন পরিষদের ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে নির্বাচিত বা নির্বাচনের জন্য মনোনীত যে কোন ব্যক্তিই এলিট হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ এই আলোচনায় এরা সকলেই গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট। এখন প্রশ্ন হলো, কেন এদের গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট হিসেবে বিবেচনা করা হবে? এপ্রশ্নটি আপনা আপনিই এসে যায়। অত্র আলোচনায় এপ্রশ্নটির জবাব দেওয়ার অবকাশ রাখি। ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে নির্বাচিত বা নির্বাচনের জন্য মনোনীতদের কেন গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট হিসেবে বিবেচনা করা হবে, এপ্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে এলিট সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত দরকার বলে মনে করি। নিম্নে এতদসম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশের মাধ্যমে এলিটের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই আলোচনার শুরুতে অর্থাৎ ভূমিকায় এলিট সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে এবং সমাজের রাজনৈতিক ছাড়াও অন্যান্য এলিটের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সব সমাজে একই রকমের এলিট বিরাজ করে না। সমাজ ভেদে এলিটের শ্রেণী তারতম্য হয়ে থাকে। উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে শিল্প এলিট ও শ্রমিক এলিট শ্রেণী। তবে ইদানিং উন্নয়নশীল সমাজ ব্যবস্থায়ও এর কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটছে। অর্থাৎ শিল্প এলিট যেমন এসব সমাজে কিছু কিছু দেখা যায়, তেমনি শ্রমিক এলিটও কিছু কিছু দেখা যায়। যাহোক, এ আলোচনার ভূমিকায় কেবল মাত্র Mosca এর উদ্ভাবিত এলিটের আলোচনা হয়েছে মাত্র। এখানে আরও দু'একজন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত এলিট সম্পর্কে আলোচনা করব।

Mosca এর ন্যায় Pareto ও দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক সমাজেই শাসক ও শাসিত- এই দু'টি শ্রেণী বিদ্যমান। তিনি শাসক শ্রেণীকে শাসনকারী এলিট হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৫] এই শাসনকারী এলিটের সংখ্যা অতি নগন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই নগন্য বা ক্ষুদ্র শ্রেনীটির দ্বারাই সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শাসিত হয়ে থাকে। সমাজের অর্থবিত্ত তাদের হাতেই সীমিত বলে তারা কেবল শাসকই নয়, তারা ধনিক শ্রেণী ও।প্যারেটো বলেন "কোন দেশে সার্বজনীন ভোটাধি--কার থাকুক আর না থাকুক, সেখানে ধনীকতন্ত্রীরাই সব সময় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। সেখানে এমন সব পদ্ধতি খুঁজে বের করা হয় যার ফলে কতিপয় ধনীকতন্ত্রীর ইচ্ছাকে জনগনের ইচ্ছা বলে চালানো সম্ভব হয়।[৩৬] অপরদিকে বটোমোর এলিট বলতে তাদের বুঝিয়েছেন "who actually exercise political power in a society."[৩৭] C. W. Mills প্রতিষ্ঠানিক পদের ভিত্তিতে এলিটের সংজ্ঞা নির্ধারিত করেছেন। তাঁর মতে, এলিট বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ক্ষমতার উৎস হচ্ছে বিভিন্নগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মূলক পদ ও পদ মর্যাদা।[৩৮] তিনি আরও মনে করেন, ক্ষমতা প্রয়োগকারী এলিট হলেন ঐ সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তা যারা জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।[৩৯]

সুতরাং দেখা যায়, এলিট তত্ত্বের বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে মত ভেদের অভাব নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোন থেকে এলিট বাছাইয়ের চেষ্টা করেছেন। মোট কথা, কোন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগন একমত হতে পারেননি। "ক্ষমতা প্রয়োগকারী এলিট বা রাজনৈতিক এলিট, অথবা শাসনকারী এলিট এ সকল ধারনা সম্পর্কেও অনেক মতভেদ আছে। ক্ষমতা প্রয়োগকারী এলিট সম্পর্কে বলা হয়-তারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। কিন্তু কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কেও মতৈক্য নেই।"[৪০] কাজেই দেখা যায়, সংজ্ঞাগত জটিলতা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

হেতু এলিটদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এক দুরূহ ব্যাপার। এমতাবস্থায় গবেষনার সুবিধার্থে রাজনৈতিক এলিট চিহ্নিতকরনে ল্যাসওয়েল-এর অনুসরনে রীতিসিদ্ধ দিকটি অনুসরন করেছি। ল্যাসওয়েলের মতে," The political elite comprises the power holders of a body politic."[৪১] অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতাধারীরাই রাজনৈতিক এলিট গঠন করে। অত্র গবেষনার বিষয় যেহেতু গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন সংস্থা ইউনিয়ন পরিষদকে এই গবেষনার নির্দিষ্ট স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছি, সেহেতু ল্যাসওয়েলের সংজ্ঞার আলোকেই উল্লেখিত এলিটদের চিহ্নিতকরনের আশা পোষন করি।

বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকেই এক একটি ক্ষুদ্র গ্রামীন রাষ্ট্র বা সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। জাতীয় সরকারের ন্যায় এখানেও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। এখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনের পর প্রতিনিধিরা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহন করে থাকে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্বের সময়ও বেঁধে দেওয়া থাকে। এদের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা গ্রহনের পর থেকেই এদের অর্থাৎ চেয়ারম্যান ও মেম্বারগনকে গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট বলা যেতে পারে। বিশেষ করে একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নির্দেশ করেই গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট কথাটি ব্যবহার করেছি। রাজনৈতিক এলিট সম্পর্কে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগন যত কথাই বলেছেন এলিটদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে অর্থাৎ তাদের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে সকলেই এক মত পোষন করেছেন। আর তাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক বিবেচনা করেই তাদের গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটের স্বরূপ ও বর্তমান গবেষনা

ক) গ্রামীন এলিটের স্বরূপ

গ্রামীন এলিট বলতে সাধারনতঃ গ্রামের অভিজাত শ্রেণীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এমনটি অবশ্য অতীতের ধারনা। কেননা, অভিজাত শ্রেণী এখন আর এলিটের একক আসনে অধিষ্ঠিত নেই। অতীতের বংশ গৌরব এখন কেবল স্তিমিতই হয়নি, অনেক পরিবারেই কেবল বংশ মর্যাদার প্রভাব আঁকড়ে আছে-সমাজে তাদের আগের সেই প্রভাব আর নেই। গ্রামীন সমাজে আজ মর্যাদা ও প্রভাবের চাবিকাঠি হলো অর্থ-বিত্ত। আজিকার গতিশীল সমাজে দারুন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হচ্ছে বলে সময়ের বাস্তব চেতনা মানুষকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু অতীতে

Dhaka University Institutional Repository

বংশের দোহাই সাপের মন্ত্রের মত মানুষকে বশীভূত করত। কারন, সমাজের সব রকমের তদারকী ছিল তাদের হাতে। সমাজের সব সম্পদের মালিকও তারাই ছিল। ফলে তাদের অমান্য করার সামার্থ্য সাধারন মানুষের ছিল না। অথচ আজিকারদ্র সমাজে কোন ভিখারিনীর ছেলেও যদি অর্থ-বিত্তের মালিক হয়, তবে সমাজ তার কাছে নতিস্বীকারে বাধ্য হয়। মূলতঃ অর্থ বিত্তই ক্ষমতার মূল উৎস। আর একারই ক্ষমতা লাভের মোহ মানুষের সব মোহের উর্দ্ধে।

এই আলোচনার ভূমিকায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর এলিটের উল্লেখ করেছি। তবে বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে এমন সব এলিটের অস্তিত্ব একেবারে হুবহু বিদ্যমান নেই। কেননা, এখনকার সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি বিশ্লেষনে দেখা যাবে, পশ্চিমা পন্ডিতগনের উদ্ভাবিত এলিটের সংখ্যা এখানে কম। তবে ক্ষেত্র বিশেষে সামঞ্জস্য রেয়েছে। গ্রামের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী গ্রাম প্রধানরাই সবার আগে দৃষ্টিতে পড়ে। আর এদেরকেই প্রথম কাতারের এলিট বলা চলে। অনুরুল ভেদে গ্রাম প্রধানরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে থাকে। যেমন প্রধান, প্রধানিয়া, মাতব্বর, মোড়ল, গ্রামানিক, সরদার প্রভৃতি। গোটা গ্রাম এদের নখদর্পনে থাকে। গ্রামে এমন কিছু নেই, যা তারা জানে না। আবার এমন কোন ঘটনা গ্রামে ঘটেনা যাতে তারা জড়িত নেই। মোট কথা, গ্রামের অভ্যন্তরে এদের মূল এতদূর প্রবিষ্ট যে, ওদের দৃষ্টি এড়াতে পারে এমন কিছু নেই। ওদের চাল দাবা খেলার চালের চেয়েও আরও ভয়ংকর। ওরা তিনকে যেমন তাল করতে পারে, তেমনি তালকেও তিল করতে পারে। একথাই বলা হয়ে থাকে যে, গ্রামের রাজনীতি হলো শয়তানের চালবাজী। গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষই ওদের চালবাজী সম্পর্কে সম্পুর্ন ওয়াকেবহাল। কিন্তু তারা নিরুপায়- এদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। গ্রামীনমানুষ মাত্রই একথা জানে যে, ওদের চালবাজী দেখে আন্তর্জাতীক শয়তানও বোকা বনে যায়। তবে একথা সত্য যে, তারা সমস্যা যেমন সৃষ্টি করে, তেমনি সমাধানও করে থাকে। এসব গ্রাম প্রধান অতীতে বংশ পরম্পরায় সমাজে প্রধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হত। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে তারা ছিল কুলীনবংশের এবং সমাজে তারাই ছিল বিপুল সম্পদের অধিকারী। কিন্তু আজিকার গ্রামীনসমাজে সেই ধারা ম্লান হয়ে এসেছে। এখন পুরানো সেই ঐতিহ্যবহন করে খুব কম সংখ্যকই গ্রাম প্রধানের আসন পেয়ে থাকে। একই গ্রামে একাধিক প্রধান থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্ত আর পুচতুর জনকেই সকলে মান্য করে। বলা চলে, অঘোষিত ভাবে সেই বিজ্ঞজনই গ্রাম প্রধানদের প্রধান। আজকাল গ্রামে যে ব্যতিক্রম হাওয়া বইছে অর্থাৎ গ্রামে মাতব্বর হওয়ার পিছনে যে বিষয় কাজ করছে তা হলো সাহস,

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতা। এগুলো যার যাকে আছে, গ্রামের জনগন নিজেদের প্রয়োজনে তাকেই ডেকে থাকে। এক্ষেত্রে সম্পদ বা বংশের প্রয়োজনীয়তা আজ অনেকটা ফুরিয়েগেছে। তবে একথা সত্য যে, সমাজে সম্পদের প্রভাব সব কিছুর উর্দ্ধে। সম্পদশালী ব্যক্তি সকল দিক বিচারে সমাজের উত্তম ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

গ্রামের এসব মাতব্বরের শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই। কুটিলতার মাধ্যমে যে জটিলতা সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া রাখে গ্রামে মাতব্বরের আসন তার আছেই। আর এই কুটীলতার গুনে তারা নিজ এলাকায় বেশ সম্মানিত ও সমাদৃত। সালিশের জন্য তাদের যেমন ডাকতে হয়, তেমনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও। মোট কথা, তাদের বাদ দিয়ে কোন কিছু করার সাধ্য সাধারন মানুষের নেই। সাধারন মানুষ তাদের হাতে এক রকম জিম্মি। তাদের সন্তুষ্ট না রাখলে যে কোন কঠিন মোকাবেলা করতে হবে-গ্রামের মানুষ একথা জানে। আর এজন্যই প্রতিটি কাজে তাদের ডাকা হয়।

গ্রামের দ্বিতীয় সারির এলিট হিসেবে মুসলমান সমাজের আলেম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম গুরুদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের আমরা ধর্মীয় এলিট বলতে পারি। সমাজে এদের প্রভাব বলতে গেলে মাতব্বরদের উপরও রয়েছে। মাতব্বররা গ্রামের সব কিছুই নিয়ন্ত্রন করে। কিন্তু ধর্ম গুরুরা এদেরও নিয়ন্ত্রন করে থাকে। গ্রামের ধর্মভীরু লোকজন তাদের শরনাপন্ন না হয়ে পারে না। মুসলিম সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যেতে পারে। কোন আলেম যদি কোন মাতব্বরের কোন কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় তবে তাকে সমাজচ্যুত করার সম্ভাবনা থাকে শতকরা নিরানব্বই ভাগ। বিয়ে-সাদী, মিলাদ-মাহফিল, মৃতের জানাজা-দাফন, হিন্দুদের পুজা-পার্বন, মৃতের সৎকার, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্ম গুরুদের কাছে গ্রামের সকলেই দায়বদ্ধ। আর কেবল গ্রামই নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও তাদের নিয়ন্ত্রন রয়েছে। এদের পছন্দসই নেতার প্রতি সমর্থন দানের জন্য এরা জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ে এরা যে কোন শ্রেণীর লোক হতে পারে। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহন করে যে কেহই আলেম হতে পারে এবং এজন্য শ্রেণীর বাছ বিচার নেই। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহনেও কারও জন্য কোন বাধা নেই, বরং জ্ঞান অর্জন করাকে ইসলাম ধর্মে অত্যাবশ্যকীয় বলে ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা ভিন্ন। তাদের ধর্ম গুরুর দায়িত্ব বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। বিশ্ব বর্ন হিন্দুরা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহন করতে পারে না। এমনকি তাদের মধ্যে এমন এক আতংক জনক প্রবাদ আছে যে, ব্রাহ্মন ছাড়া অন্য কেহ ধর্ম গ্রন্থ স্পর্শ করলে সে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে ব্রাহ্মন শ্রেণীর বাহিরে কোন শ্রেণীর লোকই হিন্দুদের ধর্ম গুরু হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীন এলিটের তৃতীয় সারির এলিট হিসেবে পেশাজীবী শ্রেণীর নাম করা যেতে পারে। এই পেশাজীবী এলিটদের মধ্যে শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, হেকিম, চাকুরীজীবী, যারা গ্রামাঞ্চলে সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে ও কবিরাজ, দলিল লিখক ও অন্যান্য পেশার লোক রয়েছে। এরা সকলেই গ্রামীনজনগনের সাথে সংশ্লিষ্ট। ফলে তারা বেশ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। কোন সমাজে যারা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়, সে সমাজে তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ শ্রেণীর এলিট মোটামুটি ভাবে শিক্ষিত। আজকাল সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তির কদর বেশী। তাই অপরাপর গ্রামীন এলিটের চেয়ে এই শ্রেণীর এলিটের প্রতি গ্রামীন জনগন অধিক আস্থাশীল। উচ্চবিত্ত ও নিম্ন বিত্তের মধ্যবর্তী শ্রেণী হিসেবে এই এলিট শ্রেনীকে বিবেচনা করা যায়। এই শ্রেনী উক্ত দুই শ্রেনীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। কেননা, উভয় শ্রেনীই এই শ্রেনীর প্রতি আস্থাশীল।

চতুর্থ সারির এলিট হিসেবে ব্যবসাজীবীদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্রেনীটি সমাজে সর্বাধিক বিত্তবান। এরা একদিকে যেমন ভু-সম্পত্তির মালিক, অপরদিকে তেমনি ব্যবসায় পরিচালনা করে। ফলে সামাজিক সম্পদের চাবি কাঠি এদেরই হাতে রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে এখানে ভু-সম্পত্তির মালিকানা সমাজের প্রভাবশালী হওয়ার একটা বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এর পাশাপাশি ব্যবসায় পরিচালনা করে ব্যবসায়ী এলিটরা সমাজে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। গ্রামের মাতব্বর বা মোড়লরাও তাদের প্রভাবমুক্ত নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষনতাই গ্রামীন মোড়ল হওয়ার প্রধান মাপকাঠি। অর্থাৎ অর্থ বিত্ত আজ পুরাপুরি ভাবে গ্রামীন সমাজের মোড়লীপনা নির্ধারন করে না। স্বল্প বিত্তের বা নিম্ন বিত্তের লোকেরাও আজ গ্রামে মোড়লী করে থাকে। বলা চলে, এরা শ্রেনী বিশেষের প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু সমাজে সম্পদের যে প্রভাব, তা থেকে তারা মুক্ত নয়। আর সম্পদের মালিকানা ব্যবসাজীবীদের হাতে সীমাবদ্ধ থাকায় সমাজের সকলের উপর তাদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এরা সমাজের উচ্চবিত্ত এবং সাবেক জমিদার শ্রেনী থেকে আগত, বা কোন না কোন ভাবে জমিদার শ্রেনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। সমাজের স্বল্প বিত্তের বা নিম্ন বিত্তের লোকদের পক্ষে ব্যবসায়ের পুঁজি খাটানো সম্ভব নহে। ফলে গ্রামীন ভু-সম্পত্তির মালিকরাই ব্যবসায় বানিজ্য পরিচালনা করতে পারে এবং সামাজিক সম্পদ তারাই কুক্ষিগত করার সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া, স্বল্প বিত্তের লোকেরা এদের কাছে শ্রম বিক্রয় করে থাকে এবং অভাব অনটনের দিনে নানাভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকে বলে তারা এই শ্রেনীটির উপর মাথা তোলার সাহস পায়না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে আর এক শ্রেনীর এলিটের উদ্ভব ঘটেছে। এরা হলো মুক্তিযোদ্ধা। এদের প্রভাবের পিছনে কতকগুলো কারন রয়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেনী তাদের আভিজাত্য বজায়

Dhaka University Institutional Repository

রাখার জন্য পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন না করায় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তাদের প্রভাব ও মর্যাদা দারুনভাবে হ্রাস পায় এবং গ্রামীন জনগন নানা কাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য দিতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন না করায় এই শ্রেণীটির সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র মত পার্থক্য ঘটে, কিন্তু মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি সাধারন মানুষের আস্থাশীলতা সমাজে তাদের বেশ প্রভাবশালী করে তোলে। অবশ্য গ্রামীন মুক্তিযোদ্ধারা সমাজের সর্বশ্রেণী থেকে আগত। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকেই বেশীর ভাগ মুক্তিযোদ্ধার আগমন ঘটেছে। এরা গ্রামীন রাজনীতিতে সরাসরি ভাবে সকলে জড়িত নহে। তবে গ্রামে বসবাস করে বলে গ্রামীনরাজনীতির উর্ধে তারা থাকতে পারে না, সাধারন মানুষের ডাকে সাড়া দিতেই হয়। অপর দিকে, উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে একেবারে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি, এমন নয়। তবে অংশ গ্রহনকারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

এ প্রসংগে গ্রামীন মানুষের শ্রেণী ভাগ সম্পর্কে কিছু বলার অবকাশ রাখি। গ্রামীন মানুষের শ্রেণীভাগ একদিনে গড়ে উঠেনি। আদিম সমাজে আর্য-অনার্যের ভাগাভাগি ছিল। এরপর আধুনিক সভ্যতার পরশ পাওয়ার পরও বাংলার গ্রামীন শ্রেণীভাগ নির্মূল হয়নি, বরং সময়ে সময়ে তা চাংগা হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে বাংলাদেশের আজিকার শ্রেণীভাগ ব্রিটিশেরই অবদান। দীর্ঘ দুই শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে ব্রিটিশ রাজ তার স্বার্থ সমুন্নত রাখার জন্য বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী কায়েম করেছিল। এপ্রসংগে ১৮৭১ সনের আইনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আইন যদিও খাজনা ও কর আদায়ের জন্য প্রণীত হয়েছিল, তথাপি তা বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। "It established various classes of municipalities, cities and rural villages and revised the taxes which might be levied in each class, with a view to regulate more exactly their weight and incidence and considerably to extend the scope and objects of taxation."[৪২]

বস্তুতঃ এই আইন কেবল অঞ্চলেরই শ্রেণী ভাগ করেনি, মানুষের মধ্যেও শ্রেণী ভাগ করেছে কর ও খাজনার ভিত্তিতে। এমনকি এই শ্রেণীভাগ অদ্যাবধি বিদ্যমান। চৌকিদারী ট্যাক্সের উপর ভিত্তি করে এখনও গ্রামে মানুষের শ্রেণী ভাগ করা হয়ে থাকে। চৌকিদারী ট্যাক্স না দিলে কেউই আদালতে কোন প্রকার সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার ভোগ ব্রিটিশ শাসনামলেও করত না এবং অদ্যাবধিও করে না।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসনামলেও এসব শ্রেণী ভাগ ছিল। তবে তা করা হত প্রতিভা, মেধা ও গুণের ভিত্তিতে। "মুসলিম সমাজে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর কোন কায়েমী সুবিধার অস্তিত্ব ছিল না। বরং মেধা ও প্রতিভার সুবিধা ছিল। প্রত্যেক মেধাবী ও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ গুণে সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাংখা পোষন করতে পারতেন।"[৪৩] আর তাই দেখা যায়, অনেক ক্রীতদাসও স্বীয় মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার গুণে সিংহাসনে আরোহ -ন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের শ্রেণী ভাগ ছিল সংঘাতমুখী। অর্থাৎ এই শাসনাম -লে বিভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রেণীগুলির পরস্পরের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে ব্রিটিশ রাজ তন্ত্রীয় শাসন কায়েম রাখার প্রয়াস পায়। আদিতে মুসলমান সমাজে শ্রেণী ভাগ ছিল নামমাত্র। আরব দেশ থেকে আগত সুফী-দরবেশগন ভারত বর্ষে ইসলাম প্রচার করেন এবং নব দীক্ষিত মুসলমানদের সাথে তারা একাকার হয়ে যান। অবশ্য এখানে তারা স্বদেশীয় গোত্র পরিচয় অক্ষুন্ন রাখেন। অর্থাৎ এখানে তারা যেমন স্বগোত্রীয় খেতাব বহাল রাখেন তেমনি নব দীক্ষিত মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের মধ্যেও সে খেতাব বন্টন করেন। মুসলিম সমাজে তারা বেশ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন বলে তাদের পরিবারগুলি সমাজে উচ্চাসন লাভ করে। কিন্তু তথাপিও উঁচু নীচু ভেদাভেদ না করে মুসলমানরা এক বংশের সাথে অপর বংশ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে বৈষম্যহীন মুসলিম সমাজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে।

ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য এতদূর গড়ায় যে, কাল-ক্রমে তা 'আশরাফ-আতরাফ' রূপ নেয়। বংশের ভিত্তিতে মুসলমানরা সমাজে নিজেদের আসন করে নেওয়ার প্রয়াস পায়। অপরদিকে, হিন্দু সমাজের বর্ণ প্রথা ছিল এক ভিন্ন চরিত্রের। মুসলমা-ন সমাজের মত মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা ও গুনের কদর তাদের মধ্যে ছিল না। এসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তুলতে পারত না। অদ্যাবধি হিন্দু সমাজে এই ধারা অব্যাহত থাকলেও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আজকাল মিশ্রন লক্ষ্য করা যায়। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে বর্ণ মিশ্রন কেবলমাত্র নিম্নবর্ণের কিছু কিছু ঘটতে দেখা যাচ্ছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা সংখ্যায় যেমন নগন্য, তেমনি বর্ণ মিশ্রনও তাদের মাঝে লক্ষ্য করা যায় না। ব্রিটিশ শাসনামলে উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে খেতাব বন্টন করে উচ্চ সমাজের বর্ণবৈষম্য -কে প্রকট করে তুলেছিল। তবে স্বাধীন বাংলাদেশে আজ আর সেই খেতাবধারীদের অবস্থান তেমন মজবুত নহে। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, গ্রামীন শ্রমজীবী মানুষের মাঝে আজকাল শ্রেণী চেতনার বিকাশ ঘটতে সুরু করেছে। ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে এরূপ চেতনার কিছুটা নজির পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের গ্রামীন এলিটের উপর অনেকেই গবেষনা চালিয়েছেন। তাঁদের গবেষনা মুলতঃ ব্রিটিশের বন্টন করা খেতাব আর জমিদারীর আওতা ছেড়ে বাইরে যেতে পারেনি। পাকিস্তানী শাসনকালেও এসব বংশধারী ও অভিজাত শ্রেনীর প্রতাপ অক্ষুন্ন ছিল। তাঁদের গবেষনা সেই গন্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ১৯৭০ সনে Bertocci কুমিল্লা জেলার দু'টি গ্রামের উপর গবেষনা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গ্রামের সরদারী উত্তরাধিকার সুত্রেই প্রাপ্ত হয়। তিনি বলেছেন" the sardars in addition to being the formal political leaders in the indegenous political system often gain position in the official organs of local government."[৪৪] স্বাধীনতা উত্তর কালের গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে, সরদারী গ্রাম প্রধানের উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত নয়, এটা একান্তভাবেই গ্রামের মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ১৯৭৭ সনে রাজশাহীর একটি গ্রামের উপর গবেষনা চালিয়ে এম, জামান উল্লেখিত তথ্য দিয়েছেন। তিনি সরদারকে সমাজের প্রধান হিসাবে দেখেছেন এবং তাকে ধর্মীয় কাজের নেতৃত্বেই সীমিত রেখেছেন। আসলে আজিকার দিনে এমন ধারনা সঠিক নয়। কারন, আজকাল কোন গ্রামের লোকই একক ব্যক্তির নেতৃত্বে ধর্ম-কর্ম পরিচালনা করে না। এই আলোচনার স্থানীয় ইতিহাসে এতদসম্পর্কে জানা যাবে। ধর্মীয় ব্যাপারে একক আধিপত্য কারও নেই। তিনি গ্রামীন রাজনীতির নেতৃত্ব হিসেবে প্রামানিকদের দেখিয়েছেন। এসব প্রামানিক, তাঁর মতে, বেশ সম্পদশালী এবং তারা বৃহৎ গোত্র বা গোষ্ঠী থেকে আগত। বর্তমান সমাজে আধুনিকীকরনের যে হাওয়া লেগেছে তাতে সমাজ কোন ব্যক্তি বিশেষের তাবেদারীতে লিপ্ত নয়। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে ধনী নির্ধন সকলেই কম বেশী আধুনিকীকরনের ছোঁয়া পেয়েছে। ফলে প্রাচীন গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রতাপ এবং আভিজাত্যের দোহাই আজকাল আর সমাজকে রক্ষা করার মন্ত্র নয়। গ্রামের সাধারন মানুষ এখন অভিজাত শ্রেনী বা বৃহত্তর গোষ্ঠীর বদলে-শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতিই অধিক আস্থাশীল। ফলে পুরানো ধাঁচের এলিটী প্রতাপ আধুনিক কালের গ্রামীন সমাজে বেশ অচল হয়ে পড়েছে। তবে স্থান বিশেষে এখনও তেমন বাধা বিচিত্র নয়।

বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজের এলিট সম্পর্কিত গবেষনা একান্তভাবেই অপ্রতুল। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে দীর্ঘ দিন বসবাসের মাধ্যমে গবেষনা লব্ধ অভিজ্ঞতাই মুলতঃ গ্রামীন এলিটের স্বরূপ উদঘাটনে সহায়ক হবে। গবেষনার নামে দু'চার দিন গ্রামে অবস্থান নিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন সম্ভব নয়। গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায় আজ এতই বিশৃংখলা বিরাজ করছে যে, কোন সমাজে কোন শ্রেনীর লোক নেতৃত্ব দিচ্ছে তা সহরে বসে অনুমান করা সহজ নহে। তথাপি গ্রামীন এলিট সম্পর্কিত

Dhaka University Institutional Repository

গবেষনা সমূহকে একেবারে অর্থহীনবলা যায় না। কেবলমাত্র ধারনা হিসেবেই ধরে নেওয়া যায়। যাহোক, গ্রামীনএলিট সম্পর্কে সঠিক তথ্য উদঘাটন করা যেমন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তেমনি ব্যাপক গবেষনারও দরকার। বলা চলে, গ্রামীন সমাজের রাজনীতি এক রকম খেলাধুলা। খেলার মাঠে দু'পক্ষের খেলা দেখতে গেলে যেমন বুঝা যায় কারা খেলছে, কারা খেলা দেখছে আর কারা খেলা পরিচালনা করছে, তেমনি গ্রামে সংঘটিত যেকোন ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শী হলেই কেবল বুঝা যায়, এঘটনার নেপথ্য নায়ককারাই মূলতঃ গ্রামীন এলিট। সব কিছুর কেন্দ্র বিন্দু এরাই। এরা গ্রামের মাতব্বর হতে পারে, ধর্মীয় নেতা হতে পারে। ধনবল নতুবা জনবল দু'টোর যেকোন একটার অধিকারী ব্যক্তিই গ্রামীন সমাজের এলিট। আজকাল গ্রামীন সমাজে এটাই স্বতঃসিদ্ধ।

ঘ) বর্তমান গবেষনাঃ

গ্রামীন নেতৃত্ব নিয়ে সামান্য গবেষনা হলেও ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে অতি সামান্যই গবেষনা হয়েছে। অথচ গ্রামীন সমাজের এটি একটি ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। অতি সম্প্রতি এ প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষনার কাজ সুরু হয়েছে। আর এই গবেষনার কেন্দ্র বিন্দু এখনও শহর। ফলে গবেষকরা ইউনিয়ন পরিষদকে কেবল ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবেই জানে, এর অভ্যন্তরে আসলে কি আছে তা জানার পথ পায় না। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীন রাজনীতির মোহনা। আর এই মোহনাই রাজনীতির গতিধারা সৃষ্টি করে। সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদ কেবল গ্রামীনরাজনীতির কেন্দ্র বিন্দুই নহে, জাতীয় রাজনীতিরও চাবিকাঠি।

পাকিস্তানী শাসন যুগে অর্থাৎ আইয়ুব দশকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বাররা মৌলিক গণতন্ত্রী নামে পরিচিত ছিল এবং তারা রাষ্ট্রপতিকেও নির্বাচিত করত। সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এক গুরুত্বপূর্ন বিষয়। এই নির্বাচনের একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক ইউনিয়নে যতজন চেয়ারম্যান প্রার্থী হবে প্রতি ওয়ার্ডে তাদের সমর্থনেএক একজন করে মেম্বার প্রার্থী থাকবে। মজার ব্যাপার হলো, অনেক সময় নির্বাচনের পর দেখা যায়, চেয়ারম্যানের সমর্থিত মেম্বাররা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেনি। সব ক্ষেত্রে অবশ্য এমনটি ঘটে না। চেয়ারম্যা-নের বিরোধী শিবির থেকে নির্বাচিত মেম্বাররা কারনে অকারনে চেয়ারম্যানের বিরোধিতা করায়ফলে ইউনিয়নে পরিষদেও দলাদলি দেখা যায়। সাধারনতঃ গ্রাম্য দলাদলিকে কেন্দ্র করেই মেম্বার প্রার্থীগন চেয়ারম্যানের পক্ষ নিয়ে থাকে। আর এভাবে গ্রামের দলাদলি ইউনিয়ন পরিষদ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের উপর ১৯৬৯ সনে গবেষণা চালিয়ে এম এ চৌধুরী দেখতে পান যে, প্রকাশ্য ভোট দান পদ্ধতি ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয়নি। তিনি মন্তব্য করেন যে, যেহেতু প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে এবং প্রার্থী বা তাদের নিয়োজিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ঘোষনার মাধ্যমে ভোটারদের ভোট দিতে হত, সেহেতু তারা কদাচিৎ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারত। স্থানীয় জমিদার ও মহাজনরা ভোটারদের উপর বেশ প্রভাব খাটাত। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, ব্রিটিশ রাজত্বকালের সামাজিক শ্রেণী প্রথার কোনরূপ পরিবর্তন পাকিস্তান আমলে হয়নি। প্রাচীনজমিদার বা তাদের আমলা এবং অন্যান্য অভিজাত শ্রেণীই ইউনিয়ন বোর্ডের পদগুলো করায়ত্ত করত। রেহমান সোবহান ১৯৬৮ সনে মৌলিক গনতন্ত্রীদের (১৯৫৯ ও ১৯৬৪ সনে নির্বাচিত) ভূ-সম্পত্তির মালিকানা ও আয়ের উপর গবেষনা চালিয়ে দেখতে গেয়েছেন, তাদের চেহারারই বদল হয়েছে।

অত্র গবেষনার কাজে যে বিষয়ে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সেগুলো হল- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন প্রকৃতি তথা কি উপায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে তা পরীক্ষা করা, যেহেতু ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়েছি, সেহেতু সে সব নির্বাচনে নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বারদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি পর্যালোচনা করা, ইউনিয়ন পরিষদে সরকারী কার্যবিলী ছাড়া গ্রামে তারা আর কোন বিষয়ের সাথে জড়িত আছে কিনা তা নিরূপন করা, তাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ পরীক্ষা করা, আধুনিক জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মনোভাব যাচাই করা, তাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগীর সাথে পরিচিত হওয়া, জাতীয় রাজনীতির সাথে তাদের সংযুক্তি, তাদের দলগত অবস্থান ও জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা বিশ্লেষন করা।

গবেষনার স্থান, উত্তরদাতা নির্বাচন

স্থান নির্বাচন :- বর্ণিত গবেষনার উদ্দেশ্যাবলী যথাযথভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের সমস্ত গ্রাম বেছে নেওয়া একান্তভাবেই অসম্ভব ব্যাপার। একজন গবেষকের পক্ষে এত বিশাল স্থান নিয়ে গবেষনা করা সম্ভব নহে। কেননা, তাতে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা বেশ কঠিন হবে। আর এমনটি ভেবে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের স্বার্থে আমি ইউনিয়ন পরিষদ বেছে নিয়েছি। ইহার নাম "গৌহাটী"। ইহা উত্তর-দক্ষিণ - এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহা কুমিল্লা জেলায় (বর্তমানে চাঁদপুর জেলায়) অবস্থিত। কুমিল্লা জেলার কচুয়া থানার ১২ টি ইউনিয়নের মধ্যে এই দুইটি(গৌহাটী উত্তর ও দক্ষিণ) ইউনিয়নই আলোচনায় স্থান পাবে। গবেষনার

Dhaka University Institutional Repository

স্থান হিসেবে গৌহাটি ইউনিয়ন বেছে নেওয়ার অন্যতম কারন হলো, এ দু'টো ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখানকার বাসিন্দা দু'টো ইউ-নিয়নের বেশীর ভাগ এলিটের সাথেই আমার ব্যক্তিগত জানা শোনা রয়েছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থান ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারনা রয়েছে। অপরদিকে, ১৯৭৩, ১৯৭৭ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচন সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সৌভাগ্যবশতঃ দুটো ইউনিয়নের ছয়টি কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতেই আমি হাজির হয়েছিলাম। সেদিনের লব্ধ অভিজ্ঞতাই মূলতঃ ইউনিয়ন পরিষদের উপর গবেষনা চালাতে আমাকে প্রেরনা যুগিয়েছিল। আমি তখন থেকেই ইউ-নিয়ন পরিষদের উপর গবেষনা করার আশা পোষন করতে থাকি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ আমাকে সে সুযোগ দেওয়ায় আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য আমি এই গৌহাটি ইউনিয়ন গবেষনার স্থান হিসেবে নির্বাচন করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উক্ত ইউনিয়ন এবং নির্বাচন আমার গবেষনার বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

ইউনিয়নদ্বয়ের ১৯৭৩, ১৯৭৭ও১৯৮৪ সনের নির্বাচন সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে অনেক বিষয়ই অবগত হয়েছি। এছাড়া আমার ব্যক্তিগত পরিচিতি স্থানীয় এলিটগনও আমাকে নির্বাচন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান ও সরবরাহ করেছেন। এর ফলে অত্র গবেষনার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা আমার জন্য অনেকটা সহজ হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচন সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহে আমার কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটেনি।

উত্তরদাতা নির্বাচন

অত্র গবেষনার মূল উদ্দেশ্য হলো ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃত্বের ধরন বের করা। গ্রামীন রাজনীতিতে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বাররা যেহেতু নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেহেতু অত্র গবেষনা তাদের কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে। তাই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪-এই তিনটি নির্বাচন গবেষনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা, একটি মাত্র নির্বাচনের উপর নির্ভর করে নেতৃত্বের প্রকৃত ধরন বা নমুনা বের করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই একটি মাত্র নির্বা-চনের উপর নির্ভর করা সমিচীন মনে বিধায় উল্লেখিত দু'টি নির্বাচনই গবেষনার জন্য নেওয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম নির্বাচন ১৯৭৩ সনে, দ্বিতীয় নির্বাচন ১৯৭৭ সনে এবং তৃতীয় নির্বাচন ১৯৮৪ সনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সনের নির্বাচন প্রতিটি ইউনিয়নে ১জন চেয়ারম্যান,

Dhaka University Institutional Repository

১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন করে ৩টি ওয়ার্ডে মোট ৯জন মেম্বারসহ ১১জন নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এনির্বাচনে দু'টি ইউনিয়নে তাই প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ২২ । অপরদিকে, ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে ১জন চেয়ারম্যান, ৯জন মেম্বার এবং মনোনীত ২জন মহিলাসহ মোট ১২ জন প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত ছিল। আর তাই এনির্বাচনে দু'টি ইউনিয়নে প্রতিনিধির মোট সংখ্যা ছিল ২৪। একইভাবে ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে ১জন চেয়ারম্যান, ৩ টি ওয়ার্ডে ৯জন মেম্বার এবং ৩ টি ওয়ার্ড থেকে মনোনীত ৩জন মহিলাসহ মোট ১৩ জন প্রতিনিধি ছিল। এনির্বাচনে দু'টি ইউনিয়নে তাই মোট প্রতিনিধি ছিল ২৬ জন। দু'টি ইউনিয়নে ১৯৭৩ সনে ২২জন, ১৯৭৭ সনে ২৪ জন এবং ১৯৮৪ সনে ২৬জন প্রতিনিধিসহ মোট ৭২জন প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করছিল। ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ২২ জন প্রতিনিধির ১২ জন ১৯৭৭ সনে পুনরায় নির্বাচিত হয়। এনির্বাচনে কেবলমাত্র ৮জন নতুনভাবে নির্বাচিত হয়। অপরদিকে, ১৯৮৪ সনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে পুনরায় নির্বাচিত ১২ জনের ৪ জন এবং নতুনভাবে নির্বাচিত ৮ জনের ৪জন পুনরায় নির্বাচিত হয়। ফলে এনির্বাচনে নতুনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা হলো ১২। ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে মনোনীত মহিলার সংখ্যা ছিল ১০। ৩ টি নির্বাচনে এলিটের মোট সংখ্যা ৭২ হলেও ব্যক্তির হিসেবে এই সংখ্যা ৫২। তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিত বা মনোনীত এই সংখ্যক এলিটের মধ্যে ১জন চেয়ারম্যান ও ৮জন মেম্বারসহ মোট ৯জন প্রতিনিধি মারা গিয়েছে। তাছাড়া, ৫জন মেম্বার চাকুরী নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়ায় মৃত এলিটগনসহ মোট ১৪ জন প্রতিনিধির অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তবে ৮জন মেম্বারের ৫জনই পুনরায় অর্থাৎ ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিল। ব্যক্তি হিসেবে এলিটের সংখ্যা ৫২ হলেও ব্যক্তি হিসেবে কেবলমাত্র ৩৬জনকেই আলোচনায় নেওয়া হয়েছে। তবে প্রতিনিধি হিসেবে এই সংখ্যা ৪৬ দেখানো হয়েছে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র, যেমন- বয়স, শিক্ষা, সামাজিক শ্রেণী প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫৩ দেখানো হয়েছে। এসব ক্ষেত্র ছাড়া অনুপস্থিত এলিটদের বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু আলোচনা করা হয়নি। মৃত ও বিদেশে চাকুরীরত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়েই প্রতিনিধি হিসেবে ৪৬ জন এলিট নিয়ে অত্র গবেষনা সাধিত হয়েছে। মনোনীত মহিলা সদস্যদেরও আলোচনাভুক্ত করা হয়নি। কেননা, তারা ইউনিয়ন পরিষদের মনোনীত কেতাবী সদস্য মাত্র। ইউনিয়ন পরিষদের কোন কাজেই তাদের পাওয়া যায় না। স্বামীদের বাধা ডিঙিয়ে তারা ঘরের বাইরে আসতে পারে না। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর্ম-কান্ডের সাথেই তারা জড়িত হতে পারে না। আর

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যই তাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

তথ্য সংগ্রহ

গবেষনা কাজে তথ্য সংগ্রহ করা বেশ জটিল ব্যাপার। কেননা, অনেক সময় এমন সব তথ্য পাওয়া যায়, যা আদৌ সত্য নয়। আর তাই গবেষনার তথ্য সংগ্রহ কাজে যথেষ্ঠ সাবধানতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। তথ্য সংগ্রহ কাজে সাক্ষাৎকার, প্রশ্নপত্র, পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অত্র গবেষনার অগ্রগতি সাধনে প্রশ্নপত্র, সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব নিয়ে যেহেতু এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন গবেষনা, সেহেতু তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষনায় অন্তর্ভুক্ত এলিটদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করা একান্ত অপরিহার্য। উল্লেখিত পদ্ধতির সাহায্যে গ্রামীন এসব প্রতিনিধি বা এলিটের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা বেশ সহজ হয়েছে।

গবেষনার পূর্বে একটা প্রশ্নপত্র তৈরী করেছি এবং তা পূর্বোল্লেখিত দু'টি ইউনিয়ন পরিষদে ১৯৭৩ ,১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে নির্বাচিত এলিটদের সরবরাহ করি। প্রশ্নপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। এতে অতি সাধারন প্রশ্নই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এমনটি করার কারন হলো, গ্রামের উল্লেখিত এলিটরা অশিক্ষিত হলেও যাতে সহজে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে এবং প্রশ্নপত্রের কোন কিছুই তাদের কাছে দুর্বোধ্য না হয়। উল্লেখিত প্রশ্নপত্রে তিনটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগের প্রশ্নাবলীতে এসব গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটের আত্মপরিচয় তথা তাদের পারিবারিক পরিচয়, শিক্ষা, বয়স, আয়-রোজগার, ভূ-সম্পত্তির মালিকানা, পেশা, সমাজের অপরাপর এলিটের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের প্রশ্নাবলীতে রয়েছে স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে এলিটদের দৃষ্টিভংগী, সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, আধুনিকতা সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা, গ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও আশাবাদ প্রভৃতি। আর তৃতীয় ভাগের প্রশ্নাবলীতে রয়েছে জাতীয় রাজনীতির সাথে এলিটদের সম্পর্ক এবং তাদের দলগত অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়াবলী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করার আগে তার সুষ্ঠুতা ও যথার্থতা যাচাই করার জন্য একটা খসড়া প্রশ্নপত্র তৈরী করে তা পাঁচজন উত্তর দাতার নিকট প্রেরণপূর্বক তাদের মতামত গ্রহন করি। উক্ত ৫ জনই প্রান্তস্থ ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত মেম্বার ছিলেন। এরূপ মতামত গ্রহন করে আশানুরূপ ফল পেয়ে কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই প্রশ্নপত্রটি চূড়ান্তরূপে গ্রহন করি এবং মনোনীত উত্তরদাতাদের নিকট প্রেরণ করি।

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অত্র গবেষনার কাজে প্রশ্নপত্র, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষনার জন্য এরূপ পদ্ধতি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৩ , ১৯৭৭ এবং ১৯৮৪ সনের নির্বাচন আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি যেহেতু অত্র ইউনিয়নের বাসিন্দা, সেহেতু উল্লেখিত নির্বাচন তিনটি প্রত্যক্ষ করা আমার পক্ষে বেশ সহজ ছিল। নির্বাচন সময়ে দু'টি ইউনিয়নের ৬টি ভোট কেন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখা আমার জন্য কঠিন কাজ ছিল না। আর এভাবে দেখার মাধ্যমে আমি প্রতিটি কেন্দ্রের নির্বাচন সম্পর্কেই শুধু অবহিত হইনি, ভোটারদের ভোট দান পদ্ধতি, প্রার্থী ও তাদের নিয়োজিত এজেন্টদের ভোট সংগ্রহ প্রক্রিয়া, প্রার্থী কর্তৃক নিয়োজিত এজেন্টদের কার্যকলাপ, ভোটারদের প্ররোচিত করার বিভিন্ন উপায় প্রভৃতি সম্পর্কেও অবহিত হয়েছি। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে আমি দেখতে পেয়েছি কারা ভোট নেয়, আর কারা ভোট দেয়। এখানে দেখতে পেয়েছি ভোট সংগ্রহের জন্য একজন প্রার্থী বা তার পক্ষে প্রচারনা -য় লিপ্ত কর্মীরা একজন ভোটারের সাথে কেমন আচরন করে বা একজন ভোটারকে প্রভাবিত করার জন্য কি ভূমিকা তারা গ্রহন করে। এখানে আমি জানতে পেরেছি ভোটাররা সত্যিকার অর্থেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয় কিনা , তারা কি আসলে প্রচারনার শিকার, নাকি চাপের মুখে ভোট কেন্দ্রে আসে , ভোট কেন্দ্রে তাদের প্রলুব্ধ করার কি কি ব্যবস্থা প্রার্থীরা গ্রহন করেছে। মোটকথা, যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, কোন ইস্যু ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে প্রভাবিত করে থাকে। এভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমি যে সব বিষয় অবহিত হয়েছি , সেগুলের সাহায্যে অত্র গবেষনার তৃতীয় অধ্যায় রচনা করতে সক্ষম হয়েছি। তাছাড়া, মাঠপর্যায়ে গবেষনার কাজ চালানোর সময় আমি গ্রামীন উন্নয়ন কাজও (যা বর্তমানে চলছে) প্রত্যক্ষ করেছি। অপরদিকে , ইউনিয়ন পরিষদদ্বয়ের মাসিক সভায় উপস্থিত হয়েছি । এতে ইউনিয়ন পরিষদে গবেষনা চলাকালীন সময়ে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিদের ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থিতির হার ও তাদের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের সকল এলিট আমার কমবেশী পরিচিত। বিশেষ করে ১৯৭৩ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম বিধায় উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রামের প্রত্যেকটিতেই আমাকে যেতে হয়েছিল। আর এই হিসেবে উক্ত ইউনিয়নের প্রায় সকল এলিটের কাছেই আমি পরিচিত। ফলে তথ্য সংগ্রহে উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নে আমাকে খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি। এইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য তাই আমি সরাসরি অত্র গবেষনায় অন্তর্ভুক্ত এলিটগনের শরনাপন্ন হয়েছি। অপরদিকে, দক্ষিণ গৌহাটী ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহের কাজে উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের অফিস সেক্রেটারী এবং একজন সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান আমাকে সাহায্য করেছে। এছাড়া, আমার কয়েকজন কলেজ সহপাঠীও আমাকে এব্যাপারে সাহায্য করেছে।

গবেষনার স্বার্থে আমি সাক্ষাৎকার গ্রহনের উপরও গুরুত্ব দিয়েছি। অত্র গবেষনায় অন্তর্ভুক্ত এলিটদের ছাড়াও উভয় ইউনিয়নের কিছু গণ্যমান্য ও বয়স্ক লোকের এবং কয়েক-জন মৌলিক গনতন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এই সাক্ষাৎকার গ্রহন ছিল সম্পূর্ণরূপে অনানুষ্ঠানিক। এলিটগন ছাড়াও অন্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের কারন হলো স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কেননা, স্থানীয়ভাবে বা জাতীয়ভাবে এইউনিয়নদ্বয়ের লিখিত কোন ইতিহাস নেই। তাই প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা,ও সাক্ষাৎকার দাতাদের জবাব হতে প্রাপ্ত তথ্য,জনশ্রুতি এবং বৃদ্ধ লোকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি উল্লেখিত ইউনিয়নদ্বয়ের ইতিহাস রচনা করেছি। কেননা, এলিটদের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য স্থানীয় ইতিহাস অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। গবেষনার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ১৯৮৯ সনের মে মাস থেকে একই সনের জুলাই পর্যন্ত সংগ্রহ করেছি। ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত অপরাপর তথ্যের জন্য থানা কেন্দ্রের বিভিন্ন অফিসে হাজির হয়েছি। এসব অফিস ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য সরবরাহে অপারগ হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কোন তথ্যের জন্য আমি জেলা নির্বাচন অফিসেও গিয়েছি।

তথ্য বিশ্লেষণ

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইহাদের শ্রেণী বিভক্ত ও সংকেতাবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে এসব তথ্য যথার্থ ফলপ্রদ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষনার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের ন্যায় অশিক্ষিত গ্রামীন জনগনের মাঝে গবেষনা পরিচালনা করা বেশ কঠিন ব্যাপার। গ্রামে গ্রামে অঞ্চলে অঞ্চলে মানুষে মানুষে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি সামাজিক পার্থক্যও রয়েছে। অত্র গবেষনা মাত্র দু'টি ইউনিয়ন পরিষদের উপর পরিচালিত হয়েছে। তাই এই দু'টি মাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বের গবেষনাকে ভিত্তি করে সমগ্র বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃত্বকে একই সাধারন শ্রেণীভুক্ত করতে পারি না। কেননা, এখানকার এলিটের সবগুলো বৈশিষ্ট্য অন্য ইউনিয়ন পরিষদের এলিটদের মাঝে নাও থাকতে পারে। তাই এই দু'টি ইউনিয়নের এলিট প্রকৃতির আলোকে সব ইউনিয়ন পরিষদের এলিটদের একই প্রকৃতির হিসেবে বিচার করতে পারিনা। তবে গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায় এক সমাজের সাথে আর এক সমাজের যেরূপ সামঞ্জস্য আমরা লক্ষ্য করি, সেই আলোকে বলা চলে যে, সকল ইউনিয়ন পরিষদের এলিট প্রকৃতি এক না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তারা একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

গ্রামীন মানুষ যেহেতু অশিক্ষিত, সেহেতু গবেষনা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অনেক শিক্ষিত লোকও এব্যাপারে ওয়াকেবহাল নয়। পূর্বোল্লেখিত সময়ে আমি উত্তর দাতাদের সংগে সাক্ষাৎ করেছি। উত্তর দাতার কাছ থেকে প্রশ্নের জবাব পাওয়া বেশ কঠিন। একদিকে, আগন্তুক দেখে উৎসুক লোকের ভীড়, অপরদিকে, উত্তর দাতার নিজেকে চাপিয়ে রাখার চেষ্টা- এই দ্বৈত সংকটের মধ্য দিয়েই গবেষনা চালাতে হয়েছে। উত্তর দাতার উত্তর কতটা সঠিক বা যথার্থ, তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। কেননা, গ্রামের মানুষ যতটা মুর্খ, তারও অধিক ধুর্ত। আগন্তুককে কোন কথা বলতে তারা সর্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। একজন সাবেক বা বর্তমান মেম্বার যা বলেছে, তা মিথ্যা জেনেও কোন মানুষ এটার বিরুদ্ধে কিছু বলবে না, এটার প্রতিবাদ করতে আসবে না। এমনি অবস্থায় তা-ই যথেষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, উত্তরদাতা প্রশ্নের জবাবে স্বেচ্ছায় যা বলেছে। কেননা, বিস্তারিতভাবে যাচাই করা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এজন্য দীর্ঘ দিন গ্রামে অবস্থান নেওয়া তথা গ্রামীন সমাজের সাথে নিজেকে একাকার করে দিতে হবে। তবে এই গবেষনার তথ্য সম্পর্কে আমার খুব বেশী একটা সন্দেহ নেই। কেননা, আমি এই এলাকার বাসিন্দা এবং আমার জানা মতে উত্তর দাতারা তেমন গঠতার আশ্রয় নেয়নি+ কেবল আমেসম্পর্কিত বিষয়গুলো ছাড়া। আমেসম্পর্কিত বিষয়- যেমন, আয়-রোজগার, জমির মালিকানা প্রভৃতি বিষয়গুলো যার তার কাছে তুলে ধরতে তারা ভয় পায়। কারন, দেশে যখন সমাজতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

হাওয়া বয়েছিল তখন গুজব চলছিল যে, যাদের সম্পত্তি বেশী আছে সরকার তার একটা অংশ নিয়ে যাবে। এই আতংক তাদের মনে এখনও দানা বেঁধে আছে। অপরদিকে, আয়কর সম্পর্কেও তারা আজকাল বেশ খবরাখবর রাখে। সম্পত্তি বা আয়-রোজগারের কথাটা সত্যিকার অর্থে প্রকাশ করে দিলে তাদের উপর আয়কর ধার্য্য করার আশংকাও তারা পোষণ করে। ফলে দু'টি বিষয়ে তারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। মোটকথা, তারা যা প্রকাশ করেছে তার বেশী তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাদের প্রদত্ত এ তথ্যই যথেষ্ট বলে মনে করি।

গবেষনার শ্রেণীবদ্ধকরন

এই গবেষনাকে ৭ টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ভূমিকা থেকে শ্রেণীবদ্ধকরন পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে স্থানীয় ইতিহাস ও অন্যান্য প্রসংগ সম্পর্কিত আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও গ্রাম্য দলাদলি সম্পর্কিত আলোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের সামাজিক পটভূমি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে তাদের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে এলিটদের দলগত অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা এবং পরিশেষে সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় ইতিহাস ও অন্যান্য প্রসংগ

গৌহাটী ইউনিয়নের ইতিহাস

রাজনৈতিক এলিটরা গ্রামীন হউক বা শহুরে হউক, তারা কোন না কোন সমাজে স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকে। কাজেই কোন স্থানের এলিট সম্পর্কে জানতে হলে সেখা -নকার ইতিহাস জানা আবশ্যক। কারন, ইতিহাস সর্বদাই অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। আর অতীতের উপর ভিত্তি করেই সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়।

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট সম্পর্কে জানতে হলে গ্রামের ইতিহাস অবহিত হওয়া দরকার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম নিয়ে যেমন রাষ্ট্রের অবয়ব গঠিত হয়, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসই বৃহত্তর জাতীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে। আধুনিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র শহর হওয়ায় শহর কেন্দ্রিক ইতিহাস রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু তথাপি একথা সত্য যে, গ্রামের মানুষই শহর গড়ে তুলেছে। আর তাই কোন দেশের ইতিহাসের বৃহত্তর অংশই গ্রাম আর গ্রামীন মানুষকে নিয়ে রচিত হয়। গ্রামের ইতিহাস বৃহত্তর জাতীয় ইতিহাসের একটা বিরাট অংশ এবং জাতীয় ইতিহাসের সাথে রয়েছে গ্রামের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। গ্রামকে বাদ দিয়ে কোন দেশেরই জাতীয় ইতিহাস পূর্ণাংগ হতে পারে না।

অত্র গবেষণার জন্য মনোনীত ইউনিয়নও বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই অতি সংক্ষেপে জাতীয় ইতিহাসের আলোকে অত্র গবেষনার জন্য নির্বা -চিত গৌহাটী ইউনিয়নের ইতিহাস নিম্নে পেশ করা গেল :-

গৌহাটী ইউনিয়নের স্থানীয় ইতিহাস আলোচনার আগে প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গবেষনার বিষয়ে কেবলমাত্র উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধারার বিশ্লেষনের কথা উল্লেখ থাকলেও গবেষনার সুবিধার্থে দক্ষিণ গৌহাটী ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধারাও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা, গৌহাটী ইউনিয়ন উত্তর গৌহাটী ও দক্ষিণ গৌহাটী - এই দুই অংশে বিভক্ত। আগে এটি একটি ইউনিয়নই ছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৯ সালে এটিকে উল্লেখিত দু'টি অংশে বিভক্ত করা হয়। দেখা গেছে, দক্ষিণ গৌহাটী ইউনি-য়নকে বাদ দিয়ে গবেষনা পরিচালনা করলে অনেক তথ্যই অনুদঘাটিত থেকে যাবে। কেননা, সীমা রেখা দ্বারা বিভক্ত হলেও দু'টি ইউনিয়নই সকল কাজ কর্ম এবং জনগনের পারস্পরিক সম্পর্কের দিক দিয়ে একান্তই ঘনিষ্ঠ এবং পরস্পর নির্ভরশীল। বলা আবশ্যক যে, দু'টি ইউনি-য়নের অফিসই একই স্থানে অবস্থিত- উভয়ের দুরত্ব বড় জোর তিন শত গজ হবে। আর এজন্যই **দক্ষিণ গৌহাটী** ইউনিয়নকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সংগে উহারও নেতৃত্ব ধারা বিশ্লেষন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সুপ্রাচীন কালের কোন ইতিহাস **লেখা নেই।** সত্যিকারের প্রাচীন ইতিহাস আজও অজানা রয়ে গেছে। তাছাড়া, প্রাচীন কালে বাংলা **নামের কোন অস্তিত্ব ছিলনা।** সময় ভেদে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। একমাত্র মুসলিম শাসনামলেই বাংলা নামকরন করা হয়েছে বলে জানা যায়। আহমদ আহসান দানী বলেছেন, "বংগ, বাংগাল ও বাংলা এই শব্দ-গুলো এই ভূ-খন্ডে বহু পুরানো কাল থেকেই প্রচলিত। ... ... ঐতিহাসিক বিশ্লেষন থেকে জানা যায়, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ-এর শাসনের কিছু কাল আগে এবং তাঁর সময় এই বাংলা, বাংগাল এবং বংগ শব্দ ব্যাপ্তি লাভ করে।"[১] ইতিহাসে দেখা যায়, বাংলায় মুসলিম শাসনের সুচনা হয় ১২০১ সালে। অর্থাৎ ১২০১ সালে বখতিয়ার খলজী বংগদেশ জয় করেন। আর শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের শাসনামল শুরু হয় ১৩৪৩ সাল থেকে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, ১২০১সাল থেকে ১৩৪৩ সালের মধ্যেই বাংলা নামের উদ্ভব ঘটে।

আজিকার বাংলাদেশ বলতে যা বুঝায়, প্রাচীন বাংলার তুলনায় তা নিতান্তই ক্ষুদ্র। প্রাচীন বাংলার সীমা রেখা সম্পর্কে নাজির আহমদ লিখেন, "প্রকৃতির লীলা বৈচিত্রে লাস্যময় বাংলাদেশ সৃষ্টিকর্তার সব রকম আশীর্বাদ লইয়া উপমহাদেশের **পূর্বাঞ্চল** ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ড হিসাবে চিরকাল বিদ্যমান। পরবর্তী কালে এই দেশই সরদীপ, কাম্বোজ, কাশ্মীরের পূর্ব, হিমালয়ের উত্তরী শৃংগমালার দক্ষিণ, সিলেট, কামরূপ, কুমিল্লা, চাটগাঁ এবং আরাকানের কতকাংশ লইয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[২]

প্রাচীন বাংলায় আর্য ও অনার্য - এই দুই জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল। আর্যদের

Dhaka University Institutional Repository

বসতি ছিল বাংলার পশ্চিমাংশে এবং অনার্যরা ছিল পূর্বাংশে। পূর্বাংলের এই অনার্যদের মধ্যে আরবগন ছিল অন্যতম। আর্যদের কাছে তারা ম্লেচ্ছ এবং " তাদের অধ্যুষিত জনপদ ম্লেচ্ছ দেশ নামে অভিহিত হইয়াছে।" আরবরা তাদের বসতি অঞ্চলে নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। ত্রিপুরাকে কুমিল্লা নামকরন আরবদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচায়ক। আর্য সংস্কৃতির সাথে অনার্য সংস্কৃতির বিরাট ব্যবধান ছিল এবং ফলশ্রুতিতে কারও মধ্যে ভাবের বিনিময় হত না। অনার্য ম্লেচ্ছদের পরিচয় হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ বেদে এভাবে দেওয়া হয়েছে :-

"গোমাংস খাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহু ভাষতে
সর্বাচার বিহিনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যাভিদ্বেয়েতে ।।"[৪]

আর্য- অনার্যের ধর্ম ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আর্যরা মূর্তি পূজারী ছিল। কিন্তু এক আল্লাহর উপাসক হিসেবে আরবরা নিজেদের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। আর একারনে তারা আর্যদের মূর্তি পূজার বিরোধী ছিল। যুগে যুগে নবী- রাসুলদের অধিকাংশই আরব মুলুকে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আল্লাহর একত্বের কথা প্রচার করেছেন, যা মূর্তি পূজার সম্পূর্ণ বিরোধী। নবীগনের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে আরবরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের সংস্কৃতিও আল্লাহর একত্ববাদের আলোকে গড়ে তোলে । ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়লেও জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা ব্যবসা-বানিজ্যের পথ বেছে নেয়। বাংলার পূর্বাংশেও একই উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে তাদের আগমন ঘটে। বেদ গ্রন্থের পূর্বোক্ত বর্ণনা থেকে একথা সহজেই অনুমেয় যে, প্রাচীন বাংলার পূর্বাঞ্চলে অনার্য তথা আরবদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলোর আঞ্চলিক ভাষায় অদ্যাবধি যথেষ্ট পরিমানে আরবী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আর এটা মূলতঃ এতদাঞ্চলে আরবদের এক চেটিয়া আধিপত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রাচীন বাংলার পূর্বাংশে আর্যদের কথিত ম্লেচ্ছ বাস করলেও ১২০০ সাল পর্যন্ত বংগ দেশ হিন্দু শাসনাধীনেই ছিল। কিন্তু ১২০১ সালে বখতিয়ার খলজীর বংগ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে এবং আরব অধ্যুষিত অংশে মুসলিম শাসন সাদরে গৃহীত হয়। বখতিয়ারের বিজয়ের পর থেকে সমগ্র বাংলায় একটানা

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম শাসন বহাল থাকে।

১৭৫৭ সালে বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। এবং ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয়। ইংরেজরা কলিকাতাকে মহানগরীতে রূপান্তরিত করে। হিন্দুরা দলে দলে কলিকাতায় আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে কলিকাতার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। সেখানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস আদালত প্রভৃতি গড়ে উঠে। সুচতুর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী মুসলমান ও হিন্দু-উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিপরীতমুখী ধর্মীয় ভাবাবেগের সুযোগ গ্রহন করে Divide & Rule নীতির আশ্রয় নেয়। অপরদিকে, হিন্দুদের অধিক সুযোগ সুবিধা দান করে মুসলমানদের আরও অধিক হিন্দু বিদ্বেষী করে নিজেদের শাসন নিরাপদ করার প্রয়াস পায়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন করে মুসলমানদের সমস্ত জমি-জমা কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়। ফলে এক শ্রেণীর নবীন হিন্দু জমিদারের উদ্ভব ঘটে এবং তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী পেতে থাকে। দীর্ঘ দিন মুসলিম শাসনাধীনে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। আর তাই ইংরেজের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তাদের আস্থাভাজন হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করত এবং জমিদারীর সুযোগে মুসলমানদের উপর শোষন-নির্যাতন চালাত। ইংরেজ-হিন্দু সম্প্রীতি যে কতটা গভীর ছিল স্যার জন ম্যালকমের বক্তব্য থেকে তা সহজেই অনুমেয়। ১৮৩৩ সালে লন্ডনে সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রদত্ত এক বক্তব্যে তিনি বলেন, " আমি মনে করি মুসলিম জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ঠিক সেই রকম সন্তুষ্ট নয়। কারন, তাদের স্মৃতিতে কেবল বিলুপ্ত ক্ষমতার দহন আছে, যা হিন্দুদের স্মৃতিতে নেই। ------ আমাদের সংগে এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতবর্ষে আমাদের প্রধান নিরাপত্তার কারন।"[৫]

হিন্দু জমিদাররা কেবল মুসলমানদেরই শোষন করেনি, পূর্ব বংগের সমগ্র জনগোষ্ঠিকেই তারা শোষন করেছে। তবে ইংরেজের সাথে বন্ধুত্বের কারনে মুসলমানদের উপরই শোষনের মাত্রা ছিল বেশী। সঞ্জীব চন্দ্র চ্যাটার্জী তের ধরনের অতিরিক্ত কর

ন

Dhaka University Institutional Repository

আবওয়াবের কথা উল্লেখ করেছেন, যা নির্ধারিত খাজনা ছাড়াও আদায় করা হত।[৬] মইনুদ্দিন লিখেছেন, " ...... Krishna Dev preceeded others in this respect, and Abdul Gafur Siddiqi has listed five items of such illegal taxes imposed by him including beard tax of two and a half rupees per head."[৭] অর্থাৎ অতিরিক্ত করের বোঝা মুসলমানদেরই বহন করতে হত সবচেয়ে বেশী। দাঁড়ি রাখার জন্যও তাদের কর প্রদান করতে হত। মুসলমানদের উপর সীমাহীন শোষণের প্রতি ইংগিত করে ভারত সরকারের তৎকালীন একজন কর্মচারী স্যার চার্লস মেটকাফ বলেছেন," ----- এ নীতি হচ্ছে অন্যায়-অবিচারের চূড়ান্ত, কোন দেশেই এরকম নজির নেই যেখানে সমস্ত জমি-জমা যাদের প্রাপ্য তাদের না দিয়ে এক গোষ্ঠী বাবুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। যে সব বাবুরা নানা দুর্নীতি ও উৎকোচের আশ্রয় নিয়ে দেশের ধন-সম্পত্তি চুষে খেতে চায়।"[৮]

নব্য হিন্দু জমিদাররা কেবল শোষণই করত না, হিন্দু সংস্কৃতিভুক্ত করার জন্য তাদের উপর জবরদস্তিও চালাত। হিন্দুদের পূজা-পার্বনে হাজির হতে, হিন্দুয়ানী কায়দায় করজোড়ে জমিদারদের প্রনাম করতে এবং হাঁটুর উপর ধুতি পরতে মুসলমানদের বাধ্য করা হত। মুসলমানরা পবিত্র কোরবানীর ঈদেও গরু জবাই করতে পারত না। নিম্ন বর্ণের হিন্দু-দের ন্যায় মুসলমানদেরও অচ্যুত জাত বিবেচনা করে হিন্দু ছেলেদের সাথে মুসলমান ছেলেদের লেখা-পড়া শিখতে দেওয়া হতনা। তীতু মীরই সর্ব প্রথম ইংরেজের নীতি এবং জমিদারদের এমন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ধুতি পরা, অবৈধ কর প্রদান এবং অনৈসলামিক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি মুসলমানদের আহবান জানান।[৯]

রাজ্যহারা ও ভূমিহারা মুসলমানদের ক্রোধ শেষ পর্যন্ত ইংরেজের চেয়ে হিন্দু জমিদারদের উপরই ঠেকেছে সবচেয়ে বেশী। আর তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দিন দিন দূরত্ব দীর্ঘতর হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও মুসলমানেরা তাতে যোগদানে বিরত থাকে। ইতিপূর্বে হিন্দুদের মাঝে কোন ধর্মীয় উন্মেষ পরিলক্ষিত না হলেও কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে হিন্দু পুনর্জাগরণের ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটাতে তারা সচেষ্ট হয়। বিশেষ করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব-

Dhaka University Institutional Repository

পন্থ নেতাদের প্রভাবই কংগ্রেসকে মুসলিম বিদ্বেষী একটা প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়। ফলে মুসল-মানরা কংগ্রেসে যোগদানে উৎসাহ বোধ করেনি। কংগ্রেসের এসব প্রভাবশালী নেতাদের অন্যতম ছিলেন বালগংগাধর তিলক। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বালগংগাধর তিলকের চরম মুসলিম বিরোধী প্রচারনা এবং কংগ্রেসে তাহার প্রভাব বৃদ্ধির ফল স্বরূপ কংগ্রেসে মুসলমানের অংশ গ্রহন হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯০৫ সালে বেনারসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবে-শনে ৭৫৬ জন ডেলিগেটের মধ্যে মাত্র ১৭ জন মুসলমান ছিলেন।"[১০] এভাবে উভয় সম্প্র-দায়ই ধর্মের গন্ডিতে আবদ্ধ থাকায় তাদের পারস্পরিক ঐক্য ব্যাহত হয়।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা মূলতঃ হিন্দুদের একটা একক শক্তি-তে পরিনত করে। এতে মুসলমানরাও নিজেদের জন্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উৎসাহ বোধ করে. এবং ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এদিকে, বাংলার মুসলমানদের চরম দুরাবস্থার কথা ভেবে এবং মুসলিম নেতাদের দাবীর মুখে ভারত সরকার বংগ বিভক্তির কথা ঘোষনা করেন। এতে হিন্দুরা আর3 অধিক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। কলিকাতার জমিদার, অভিজাত মহল, শিক্ষিত সমাজ, **বুদ্ধিজীবী**, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক **সরকারের** এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ তোলে। তাছাড়া, " The partition of Bengal announced on 3 December 1903 and carried out on 16 October 1905 had given a great shock to the Congress leaders and stirred up a violent nationalism in Bengal."[১১] বংগ ভংগ প্রতিহত করার জন্য হিন্দুরা আমরন সংগ্রামে অবতীর্ন হয়। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক বংকিম চট্টোপাধ্যায় বংগ ভংগ প্রতিহতকারীদের পক্ষে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন। "কলকাতায় এক বিরাট **প্রতিবাদ** সভায় বংগ ভংগ না মানার প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করেন কবি রবীন্দ্রনাথ।"[১২] তাছাড়া, বংকিম তাঁর সকল লেখাতেই মুসলিম বিদ্বেষী ভাব প্রকাশ করেন এবং উস্কানীমূলক বক্তব্য দেশের পাশাপাশি ইংরেজ শাসকেরও প্রশংসা করেন। তিনি তার রচনায় লিখেছেন ,"মুসলমান পরাভূ-ত হইয়াছে। ----- অনেক যবন নিহত হইয়াছে, অনেক মুসলমান দাঁড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল"মুই হেঁদু"। ------ ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে- নিস্কন্টকে ধর্মাচরণ

Dhaka University Institutional Repository

করিবে। -- -- ইংরেজ মিত্র রাজা। ইংরেজের সংগে শেষ যুদ্ধে জয়ী হয় এমন শক্তিও কাহারও নাই।" [১৩] এছাড়াও ছিল বংকিমের 'বন্দে মাতরম' সংগীত, যা মুসলমানরা বরদাশত করতে পারতনা। কেননা, 'বন্দে মাতরম' হল হিন্দুদের দেব-দেবীর গুণ কীর্তন সম্বলিত সংগীত। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস দেব-দেবী বিরোধী।

বংগ ভংগ প্রতিহত করার জন্য হিন্দুরা স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে এবং ব্রিটিশ পন্য বর্জনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজকে বংগ ভংগ আদেশ রহিতকরনে বাধ্য করার পথ বেছে নেয়। এই আন্দোলনের পাশাপাশি তারা শিবাজীকে জাতীয় বীর আখ্যায়িত করে শিবাজী উৎসবও পালন করে। অথচ শিবাজী মুসলমানদের কাছে বেশ ঘৃণিত একটা নাম। "*A new festival was celebrated in Calcutta. It was the Shivaji Festival and Tilak himself spoke at one of the meetings.*" [১৪] হিন্দু ছাত্ররাও বংগ ভংগ প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হয়ে উঠে এবং নিজেদের মধ্যকার ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্য তারা" রাখি পূর্ণিমার দিনে রাস্তায় নেমে সকলের হাতে ঐক্যের প্রতীক হলদে সুতার রাখি বেঁধে দেয়। "[১৫] হিন্দু পত্রিকাগুলোও নানাভাবে হিন্দুদের উত্তেজিত করে বংগ ভংগ রদ করার সংগ্রামে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করে। এসবের মধ্যে 'হিতবাদী' নামক পত্রিকায় বিলাতী পন্য বর্জনের আহবান জানিয়ে বলা হয়," *The authorities must be brought to their senses by a throughout boycott of English goods-'Bande Mataram' should henceforth be our only instrument instead of prayers and petitions.*"[১৬]

বলা বাহুল্য, মুসলমানদের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পত্রিকা না থাকায় বংগ ভংগ টিকিয়ে রাখার মত আন্দোলন তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া, সমগ্র ভারত উপ-মহাদেশের মুসলমানদের জন্য বংগ ভংগ কোন কল্যানের কারন ছিল না। তাই এই অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই বংগ ভংগ আন্দোলন সীমিত ছিল। কিন্তু তথাপি স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশী পন্য বর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়, তাতে অনেক মুসলমান ব্যবসায়ীকে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। শেষটাতে "*The boycott movement placed the Muslims in awkward position and the refusal of some Muslim traders and vendors to agree to boycott British goods led to rioting.*" [১৭]

মুসলিম লীগকে হিন্দু সম্প্রদায় বেশ অবজ্ঞা করত এবং ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে এরূপ

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রূপ ভাব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হিন্দু পত্রিকাগুলো নানা ধরনের ব্যঙ্গাত্মক কথা-বার্তা প্রচার করে। বাংগালী নামক একটি পত্রিকা মুসলিম লীগকে "... ... ... *Salimullah's League and Nawab Salimullah's latest fad*" [১৮] বলে আখ্যায়িত করে।

হিন্দুদের আবেদন নিবেদন এবং দুর্বার সংগ্রামের মুখে ভারত সরকার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং এসবের জবাবে ভারত সচিব জন মর্লি ঘোষনা করেন, "--- --- --- **the partition is a settled fact**" [১৯] ওদিকে, কতিপয় মুসলিম নেতার দাবীর প্রেক্ষিতে ভারত সরকার কর্তৃক" ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি মালায় মুসলমানদের পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর দাবীকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়।" [২০] ফলে হিন্দু-মুসলিম দাংগা ভারত উপ-মহাদেশকে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। আর তাতে ইংরেজ- হিন্দু সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশেষে রাজা পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে আসেন এবং বংগ ভংগ রহিত করার কথা ঘোষনা করেন।

বংগ ভংগের ঘোষনা দেওয়ার পর মুসলিম- হিন্দু উভয় সম্প্রদায় যত-টা আন্দোলনমুখী হয়েছিল, এর আগে কোন ঘটনাই তাদের এতটা নাড়া দেয়নি। বস্তুতঃ বংগ ভংগই ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। আর ওদিকে, বংগ ভংগ আদেশ রহিত করে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের খুশী করলেও এদেশের মানুষ তা মেনে নিতে পারেনি। এদেশের মানুষ ভারতীয় জাতিসত্ত্বা থেকে নিজেদের পৃথক হিসেবেই বিবেচনা করত। তাদের এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৬ সনের সাধারন নির্বাচনে।

১৯০৯ সালে পৃথক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেয়ে মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক শক্তি রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করার পর সরকার গঠন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম বৈরিতার আশ্রয় নেয়। মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করলেও কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে এবং স্ব-উদ্যোগে মন্ত্রীসভা গঠন করে সর্বত্র হিন্দুস্থানী সংস্কৃতি চালু করার কাজে ব্রতী হয়। বিভি

Dhaka University Institutional Repository

-র অফিস-আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশোকচক্র খচিত কংগ্রেসী পতাকা উত্তোলন করে ও বিতর্কিত বন্দে মাতরম সংগীত গাওয়া মুসলমানদের জন্যও বাধ্যতামূলক করে দেয়। এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতেই মুসলমানরা দ্বিজাতি তত্ত্বের বিকাশ ঘটায়। এবং এরই ভিত্তিতে ১৯৪০ সনে লাহোরে মুসলিম লীগের এক সম্মেলনে ভারত বিভাগ দাবী করে মুসলিম নেতারা এক প্রস্তাব গ্রহন করে। ফলে সমগ্র ভারতে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত চরম রূপ নেয়। এই প্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার সাধারন নির্বাচনের আয়োজন করে । আর এই নির্বাচনের ফলাফল মুসলমানদের পৃথক আবাস ভূমি কায়েমের অনুকূলে পাওয়া যায়। এদিকে, এই নির্বাচন এবং ইহার ফলাফলকে কেন্দ্র করে ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাংগা ছড়িয়ে পড়ায় ব্রিটি-শ সরকার ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি পৃথক রাষ্ট্র কায়েমের কথা ঘোষনা করে এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগষ্ট ভারত কায়েম হয়।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পাকিস্তান কায়েম হলেও এদেশের মানুষের আশা-আকাংখার বাস্তব প্রতিফলন তাতে ঘটেনি। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, " No constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles viz that geographically contigious unitts are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial adjustments as may be necessary, that the area in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North Westrn and East Zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."[২১] এই প্রস্তাব মোতাবেক একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে " The Lahore Resolution was however, subsequently sidetracked in the sense that another resolution was passed in a meeting of the elected representati-

Dhaka University Institutional Repository

ves of the Muslim League in the federal and provincial legisla-ture on April 9, 1946."[২২] সংশোধিত প্রস্তাবের মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাব সংশো-ধন করে একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান কায়েম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তথাপি কংগ্রেসের নীতির কারনেই এদেশের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিল।

লাহোর প্রস্তাব মতে বাংলাদেশ একটা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সংশোধিত হওয়ায় প্রস্তাবটি একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে কোন ভূমিকা রাখার সহায়ক হয়নি। তাই পূর্ব ও পশ্চিম-এই দু'টি অংশ নিয়েই পাকিস্তান গঠিত হয়। কিন্তু এই দুই অংশের মধ্যে ছিল ভাষা, সংস্কৃতি আচার, আচরন প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান। " মনের শত মাইল দূরত্বে অবস্থিত দুইটি অঞ্চল নিয়াই পাকিস্তান গঠিত হয় নাই। ভাষা, সংস্কৃতি , কৃষ্টি, সভ্যতা এবং আচার-আচরনের দুইটি অঞ্চলে ভিন্নতা রহিয়াছে। অথচ এই বিচিত্র রাষ্ট্রটি জনগনের ইচ্ছা ও আগ্রহের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কেহ জোর করিয়া চাপাইয়া দেয় নাই।" [২৩] এর পিছনে যে কারনটি ছিল তা হলো-কলিকাতার হিন্দু জমিদারদের এদেশের মানুষের প্রতি অবহেলা, শোষন, জুলুম প্রভৃতি। এসবের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা এবং সুরাজ কায়েম করাই ছিল পাকিস্তান কায়েমের আসল লক্ষ্য। কিন্তু পাকিস্তান কায়েমের পর এদেশের মানুষের আশা-আকাংখা ধুলি-সাৎ হয়ে যায়। দেখা গেল, পতাকা, নাগক আর মানচিত্রই কেবলমাত্র বদল হয়েছে, মানুষের ভাগ্যের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। সেই ব্রিটিশ আমলের মতই জনগনের উপর শোষন চলতে থাকে। পাকিস্তানের সুচনালগ্নেই দুই অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাং-স্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানের প্রশাসনিক কার্যক্রম ১৯৫৬ সন পর্যন্ত পরিচালিত হয়। এই আইনে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে কেন্দ্রের হাতে যেমন অধিকতর ক্ষমতা ছিল , তেমনি গভর্ণর জেনারেলও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে-ছিল। ফলে পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার কায়েমের স্বপ্ন তিরোহিত হয়ে যায়। গভর্ণর জেনারে-লের হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকার সুযোগে ৯২ (ক) ধারা বলে ১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। অথচ পাকিস্তানের পূর্ববংগ প্রদেশে যুক্তফ্রন্ট নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। মোট ২৩৭ টি প্রাদেশিক পরিষদ আসনের ২২৮ টি আসনই যুক্তফ্রন্ট লাভ করেছিল। অথচ তারপরও এদেশকে কেন্দ্রের **শাসনাধীনে নিয়ে** যাওয়া হয়। এরপর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয় এবং এই সংবিধানে এদেশের মানুষের কোন অধিকারেরই স্বীকৃতি মিলেনি। তাই এদেশবাসী উক্ত সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে এবং এদেশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবী করে।

এর আগে ১৯৫২ সালে ঘটে যায় ইতিহাসের এক **কলংকজনক ঘটনা।** এদেশের মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তে মেতে উঠে শাসক গোষ্ঠী। বাংলা ভাষার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার হীন উদ্দেশ্যে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার শুরু থেকেই শাসক গোষ্ঠী পাঁয়তারা শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচীতে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে, "উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়।"[২৪] তমুদ্দুন মজলিশ নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং প্রদেশ ব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের আয়োজন করে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে "সর্ব দলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ" গঠিত হয়।

ভাষা সংক্রান্ত জটিলতাকে আরও ঘনিয়ে তোলেন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকা এলে তাঁকে দেওয়া এক নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় ২১ মার্চ রেইস কোর্স ময়দানে তিনি ঘোষণা করেন, " Let me make it very clear that the State Language of Pakistan: is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan."[২৫] সংগে সংগে 'না' 'না' বলে প্রতিবাদ উঠে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে শাসক জনতার মধ্যে প্রথম বারের মত মুখামুখি লড়াই শুরু হয়। রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে এদেশের ছাত্র-জনতা যখন দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে তখন বেসামাল হয়ে শাসক গোষ্ঠী ছাত্র-জনতার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবী নিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের (বর্তমানে জগন্নাথ হল) দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে শাসক গোষ্ঠী সকল সভা-

Dhaka University Institutional Repository

বেশ নিষিদ্ধ করে এই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্রেরা তা অমান্য করে সেদিকে অগ্রসর হলে সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের উপর বেপরোয়া গুলী চালায়। ফলে অনেক ছাত্রকেই সেদিন প্রাণ দিতে হয়।

১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালের ঘটনাবলী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অংগনকে উত্তপ্ত করে তুললে শাসক গোষ্ঠী এদেশের মানুষকে শান্ত করার মানসে তড়িঘড়ি করে ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের জন্য একটা সংবিধান প্রনয়ন করে। এতে বাংগালীর কোন অধিকারই স্বীকৃতি পায়নি। তাছাড়া, ভাষা ও যুক্তরাষ্ট্র শাসন সংক্রান্ত জটিলতার কোনই সুরাহা হয়নি। তবে " the 1956 constitution could still work to achieve the participation of the Bangalees in the national affairs on an equal basis provided democratic principles, conventions and precedents were honoured and practised."[২৬] এই সংবিধান জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রনয়ন করেনি। তাছাড়া, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহনকারী কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এই সংবিধান প্রনয়নের সাথে জড়িত ছিল না। তথাপিও সংবিধান প্রনয়নের পর পাকিস্তানের সর্বত্রই সাধারন নির্বাচনের জোর দাবী উঠে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে এ দাবী তীব্র আকার ধারন করায় শাসকগোষ্ঠী ১৯৫৯ সনে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষনা দিয়ে এদেশের মানুষকে শান্ত করার প্রয়াস পায়। কিন্তু ১৯৫৮ সনে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার ফলে পাকিস্তানে একনায়কের শাসন কায়েম হয় এবং রাষ্ট্রপতি চরম ক্ষমতার মালিক হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের দুঃখ-দুর্দশা ও অধিকারহীনতা আরও বেড়ে যায়। " উলংগ ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা মানুষের মনে যে লালসা সৃষ্টি করে, তাহাতে অনেকের সাধারন বিচার-বুদ্ধি, নীতিজ্ঞান, এমনকি পরলৌকিক ভীতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। কাহারো একক হস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে তাহার অনুগ্রহ লাভের আশায় চাটুকার শ্রেণীর কখনও অভাব হয়না।"[২৭] ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই চাটুকার শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সমাগম লক্ষ্য করা গেছে। তারা জাতীয় স্বার্থে জলাঞ্জলী দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলে মাতোয়ারা ছিল। অথচ এসব চাটুকার দুই পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য অনুধাবন করার প্রয়াস মোটেই পায়নি। পাকিস্তান হওয়ার সময় " Among the ICS(Indian Civil Service) and IPS(Indian

Dhaka University Institutional Repository

Police Service) Officers who opted for Pakistan only two were from East Bengal."[২৮] কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর নগন্য সংখ্যক বাংগালীকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগ দান করা হয়েছিল। "১৯৬৬ সনের তথ্য অনু-যায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মচারীদের হার ছিল নিম্নরূপঃ-[২৯]

দপ্তর	বাংগালী	পশ্চিম পাকিস্তানী
প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েট	১৯%	৮১%
দেশ রক্ষা	৮.১%	৯১.৯%
শিল্প	২৫.৭%	৭৪.৩%
স্বরাষ্ট্র	২২.৭%	৭৭.৩%
শিক্ষা	২৭.৩%	৭২.৭%
তথ্য	২০.১%	৭৯.৯%
স্বাস্থ্য	১৯%	৮১%
কৃষি	২১%	৭৯%
আইন	৩৫%	৬৫%

সেনাবাহিনীর চাকুরীতেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের নিয়োগ সীমিত ছিল।" পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫০০০০০ লোকের মধ্যে বাংগালী ছিল মাত্র ২০০০০ জন অর্থাৎ মাত্র ৪%।"[৩০] তাছাড়া, "১৯৬৬ সনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মোট ১৭ টি উচ্চ পদস্থ সামরিক পদের জেনারেল, ২টি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও ১৪ টি মেজর জেনারেলের মধ্যে ১ টি ছিল বাংগালী, তাও মেজর জেনারেলের পদে।"[৩১]

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর রাজনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানই

Dhaka University Institutional Repository

সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারন, ব্রিটিশ ভারতে পূর্ব বাংলার অর্থনীতি ছিল মাড়োয়ারী হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রনে। তারা এদেশের সম্পদ ভারতে পাচার করত। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর তারা পুঁজি প্রত্যাহার করে ভারতে চলে যায়। এর ফলে পূর্ব বংগের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট শূন্যতা পুরনের জন্য সরকার কোন পদক্ষেপই নেয়নি। তাছাড়া, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় পূর্ব বংগের স্থানীয় পুঁজিপতিরাও এখানে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী ছিল না। অপরদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি ব্রিটিশ আমল থেকেই কিছুটা উন্নত ছিল। সেখানে বেশ কিছু বৃহৎ শিল্প-কারখানা আগেই স্থাপিত হয়েছিল। তদুপরি, ভারত থেকে হিজরতকারী মুসলমানরা কেন্দ্রীয় রাজধানীর দিকেই ছুটে গিয়েছিল নিজেদের নিরাপদ করে তোলার জন্য। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে পর্যাপ্ত পুঁজি বিনিয়োগ হলে পশ্চিম পাকিস্তান অতি দ্রুত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে। কেননা, সরকারী সাহায্য না দিয়েও পুঁজি বিনিয়োগ সেখানে বেশ সহজ ছিল। তাই "West Pakistan nad better start in economic terms and their per capita income was higher than in East Bengal in 1947."[৩২] অপরদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে যারা হিজরত করেছিল তারা ছিল দীন-মজুর, শ্রমিক, ভূমিহীন প্রভৃতি শ্রেণীর। পূর্ব পাকিস্তানের বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে এসব হিজরতকারীরাও মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। এরূপ অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু পুঁজিপতি পূর্ব পাকিস্তানে কিছু কিছু শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এদেশের উৎপাদিত পাট, চা, চামড়া প্রভৃতির মুনাফার ভাগ তাই পশ্চিম পাকিস্তানেই যেতে থাকে। " পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত ১৮০০০ তাঁতযুক্ত ২৬ টি পাটকলের প্রায় সবগুলো-ই সরকারী সহায়তায় পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের মালিকানাধীনে চলে যায়। এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রধানীর নিয়ন্ত্রণ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা।"[৩৩] অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও ছিল চরম বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার আগে যে সব শিল্প-কারখানা ছিল সেগুলোর উৎপাদন বাড়ানোর কোন পদক্ষেপই সরকার নেয়নি। "দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের ভাগে যে ৭৩ টি লৌহ প্রস্তুতের কারখানা পড়ে তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৬১ টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১২ টি।---- পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ রুপী ব্যয়ে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটা এবং পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামে ২৭ কোটি রুপী ব্যয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন ক্ষমতা সম্পন্ন আর একটা আধুনিক ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল।"[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

এই কারখানা দু'টির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের কারখানায় সাড়ে পাঁচগুনেরও বেশী অর্থ ব্যয় করে উহার উন্নতি সাধন করা হয়েছিল এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকারী পুঁজি বিনিয়োগের হার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৭৫% ভাগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ২৫% ভাগ। শিল্পায়িত না হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভরশীল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। ফলে খাদ্যের উৎপাদন জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পায়নি। তাছাড়া, সার, বীজ, ঔষধ, কৃষি ঋণ, উন্নত চাষাবাদ প্রভৃতির অভাব কৃষির উৎপাদন ব্যাহত করছিল। সরকার এসবের দিকে নজর না দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থে পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিকে আবাদযোগ্য করে তুলছিল। এদেশের রপ্তানীকৃত সম্পদে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ৭৫% ভাগ ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানে। এই অর্থের বেশীর ভাগই সেখানে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করা হত। ফলে ২২টি কতক পুঁজিপতি সমগ্র পাকিস্তানের অর্থনীতির ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়ায়। " ... ... by 1968 the 22 largest families controlled 66 percent of industrial assets, 70 percent of insurance funds and 80 percent of bank assets." ৩৫

পাকিস্তানী নেতৃত্বের এহেন শোষন ও চক্রান্তের দরুন এদেশে চরম গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়। কতিপয় রাজনৈতিক চাটুকার ছাড়া এদেশের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন। " বাংলাদেশ মুসলিম লীগের প্রধান ঘাঁটি হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগে বাংলাদেশের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ছিল না।" ৩৬ এদেশের দেশ প্রেমিক মুসলিম লীগ নেতারা তাই ১৯৪৯ সনেই মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। অতঃপর একই সনের ২৩ শে জুন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। কারন, শাসকগোষ্ঠী একের পর এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের জনপ্রিয় মুসলিম নেতাদের ঘায়েল করছিল,যাতে তারা দেশ প্রেমের নজির স্থাপন করে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষকে উত্তেজিত করার প্রয়াস চালাতে না পারে। এরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক মুসলিম লীগ নেতারা দেশবাসীকে নব্য ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে রক্ষার তাগিদে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের দাবী তোলেন। এই দাবী উঠার সাথে সাথেই পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী জাতীয় সংহতির নামে ইসলামের দোহাই দিতে শুরু করে। কারন, পাকিস্তান আন্দোলনে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় আবেদন যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল তাকে পুঁজি করেই মূলতঃ তারা বাংগালী জাতি -কে গোলাম বানিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ধর্ম তখনই মানুষের মাঝে আবেদন সৃষ্টি করে এবং ঐক্য ও সংহতি জোরদার করে যখন ভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠী দ্বারা কোন এক সম্প্রদায়ের লোক শোষিত ও নির্যাতিত হয়। " পাকিস্তান আন্দোলন কালে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বিধানকল্পে ধর্মেরও ব্যবহার কার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ চাকরী-বাকরী , ব্যবসা-বানিজ্য, জমিদারী-মহাজনি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল , সেই আধিপত্য হইতে নিস্কৃতি লাভ করা এবং ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে লইয়া একটা নিজস্ব শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।"[৩৭] কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির এই আশা যোন আবাই বরবাদ হয়ে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনীতে পরিনত হয়। ইসলামের রক্ষক সেজে তারা ইসলামের দোহাই দিতে শুরু করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইসলামের দরদী শাসক গোষ্ঠী দীর্ঘ তেইশ বছরে পাকিস্তানের জন্য একটা ইসলামী আইনও কার্যকরী করতে পারেনি। কারন, তারা ইসলামীমনা ছিলনা এবং ইসলাম সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ ছিল। ইসলামের কোন রীতিও তাদের মধ্যে ছিল না। সর্বোপরি, বড় কথা হলো- ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগারদের বেশীর ভাগ ছিল শিয়া মুসলমান। অথচ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানই সুন্নী মুসল-মান। ফলে শিয়া পন্থার ইসলাম পাকিস্তানে কায়েম করার যে কঠিন সমস্যা তাদের মোকা-বেলা করার আশংকা ছিল, তা থেকে গা বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তারা ইসলামী শাসন কায়ে -মের বদলে মৌখিক ইসলাম দ্বারা পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। আর এজন্যই শোষন, নির্যাতন, জুলুমও বৈষম্য সৃষ্টি করে মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার মত স্পর্ধা দেখাতেও তারা সক্ষম হয়েছিল। অথচ ইসলামে এসব পুরাপুরি নিষিদ্ধ। বস্তুতঃ শুরু থেকে পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম হলে পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের কাছে ধর্মের দোহাই ছিল অত্যন্ত বাড়াবাড়ির ব্যাপার। কারন, যেখানে মুসলমান আছে, সেখানে তারা তাদের ধর্মই চর্চা করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মাঝে তাই ইসলা-মের দোহাই ছিল বেমানান। অবশ্য ইসলামকে ভিত্তি করেই উভয় পাকিস্তানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। " Islam had served as the unifying link between Muslims belonging to various sects like the Sunnis and Shiahs or ethnic groups like Punjabis, Sindhis and Pukhtuns ... ."[৩৮] পাকিস্তানী

Dhaka University Institutional Repository

শাসক গোষ্ঠী একের পর এক বাংগালী জাতির স্বার্থে কুঠারাঘাত হেনে সেই ঐক্য বিনষ্ট করে দেয়।

১৯৫৮ সালে ক্ষমতা গ্রহন করে সেনাপতি আইয়ুব 'হাঁ' 'না' ভোটের আয়োজন করেন এবং 'না' বাক্সের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। এরপর তিনি মৌলিক গনতন্ত্রের জন্ম দিয়ে পাকিস্তানের প্রচলিত রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্মের সমাধি রচনা করেন। মৌলিক গনতন্ত্র চালু করে আয়ুব খান দম্ভোক্তি করে বলেছিলেন, *"The biggest weapon of politician is his tongue, which we have controlled. I think, things are going to be quiet for a while."*৩৯ মৌলিক গনতন্ত্র চালু করে আইয়ুব খান ৮০ হাজার মৌলিক গনতন্ত্রীর ভোটে ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় দলন নীতি। এদেশের মানুষকে স্বায়ত্ব শাসনের দাবী পরিত্যাগে বাধ্য করার জন্য আইয়ুব খান মরিয়া হয়ে উঠেন। তিনি ১৯৬২ সনে পাকিস্তানের জন্য একটা সংবিধানও রচনা করেন। কিন্তু তাতে এদেশের মানুষের কোন অধিকারই স্বীকৃতি পায়নি। উপরন্তু, একনায়কের শাসন বহাল রাখার যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থাই এতে সন্নিবেশিত হয়েছিল। আসলে এই সংবিধান ছিল নামমাত্র। শাসনের মূল হাতিয়ার ছিল সামরিক ডান্ডা। " এই রাষ্ট্রের সারাটি জীবন কাটিয়াছে আমলা-তান্ত্রিক চক্রান্তে আর সামরিক ডান্ডাবাজিতে। দেশবাসী একদিনের তরেও স্বাধীনতার স্বাদ চাখিতে ও স্বাধীন নাগরিকের অধিকার ভোগ করিতে পারে নাই।"৪০

বাংগালী জাতির দীর্ঘ দিনের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর কোনই সুরাহা না করে আইয়ুব খান ১৯৬৫ সনে পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। এনির্বাচনে বাংগালী জাতি মিস ফাতিমা জিন্নাহর নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দলে (কমবাইন্ড অপোজিশন পার্টি) ঐক্যবদ্ধ হয়ে একনায়ক আইয়ুবের কুশাসন ঠেকাবার প্রয়াস পায়। আইয়ুবের চাটুকার দল সে সময় বাংগালী জাতির উপর দোষ চাপায় যে, তারা পাকিস্তান ভাঙতে চায়। আইয়ুব তনয় গওহর আইয়ুব বাংগালী জাতির স্বায়ত্ত শাসনের দাবীকে কটাক্ষ করে এবং পাকিস্তান ভাঙ্গার অভিযোগ এনে বলেছিলেন, " *In case the Combined Opposition Party won the presidential elections, each party would try to break up*

Dhaka University Institutional Repository

the unity of the country into as many parts and establish its hegemony over the area."[৪১] এই নির্বাচনে অর্থের বিনিময়ে মৌলিক গণতন্ত্রীদের কাছ থেকে ভোট কিনে আইয়ুব খান জয়ী হয়েছিলেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অংগনে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। এমনি সময়ে ১৯৬৬ সনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সর্বদলীয় বৈঠক আহবান করে ঐতিহাসিক ছয়দফা প্রনয়ন করেন এবং ছয়দফার ভিত্তিতে বাংগালী জাতির সমস্যা সমাধানের জোর দাবী জানান। ছয়দফাকে পাকিস্তান ভাংার ষড়যন্ত্র অভিহিত করে আইয়ুব খান লাহোরে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে ঘোষনা করেন, "প্রয়োজন বোধে ছয়দফা আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা হইবে।"[৪২]

১৯৬৫ সনের নির্বাচনে জয়লাভের পর আইয়ুবের বাকী রাজত্বকাল ছিল ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ। নির্বাচনের পর ছয়দফা আইয়ুবের যে গাত্রদাহ সৃষ্টি করে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আইয়ুব তদীয় বাংগালী চাটুকার গভর্ণর মোনায়েম খানের সহযোগিতায় ১৯৬৮ সনে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করায়। ১১ জন আসামীর মধ্যে অন্যতম আসামী কয়েকজনকে জেলে নেওয়া হয়ে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনেই কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়েছিল। বস্তুতঃ এই ষড়যন্ত্র মামলাই আইয়ুবের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। এমনকি এদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যও জনগনের মনে তখনই প্রেরনা জেগেছিল। আইয়ুব খানের ষড়যন্ত্রমূলক মামলার ফলে '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান ঘটে এবং আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা সমর্পন করে দিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সনের ডিসেম্বরে ও ১৯৭১ সনের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এদেশের মানুষকে শান্ত করার প্রয়াস পান।

১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর আশা করা হয়েছিল যে, ইয়াহিয়া খান নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে পাকিস্তানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত ঘটে গেল। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী

Dhaka University Institutional Repository

লীগের নিরংকুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে ছয়দফার পক্ষে জনগনের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টিতে জয়লাভ করে। ফলে ছয়দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগেরই সরকার গঠনের কথা। কিন্তু নির্বাচ-নের ফলাফল বানচালের উদ্দেশ্যে বাংগালীর উপর চরম নির্যাতন চালাতে শুরু করে দেয়। Jr. Robert Laporte লিখেছেন "*January and February saw riots and violence in Dhaka and the East with a death toll from military civilian clashes estimated at over 300.*"[৪৩] বস্তুতঃ সাধারণ নির্বাচনের পর সেনাবাহিনীর সাথে এদেশের মানুষের অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন কল-কারখানায় বাংগালী অবাংগালী দাংগা বাধিয়ে রাজনৈতিক অংগনকে উত্তপ্ত করে তোলা হয় এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে। ছয়দফা সমর্থনকারীদের তারা পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। "যারা পাকিস্তানে বিশ্বাস করে না, পাকিস্তানে তাদের বাঁচিবার কোন অধিকার নাই।"[৪৪] শাসক গোষ্ঠী ছয়দফাকে এদেশের মানুষের অধিকারের সনদ হিসাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই এ জাতিকে রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে হয়েছিল। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার গঠন করতে দিতে তাদের বেশ অনীহা ছিল। আর তাই পশ্চিম পাকি-স্তানের নেতা ভুট্টোকে দিয়ে নানা রকম ছল-চাতুরী করে এবং নানা রকম বিরোধ সৃষ্টি-মূলক বক্তব্য পেশ করিয়ে ইয়াহিয়া খান এদেশবাসীর উপর চরম হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি-লেন।

১৯৭১ সনের পঁচিশে মার্চ নেমে এলো ইতিহাসের সেই নারকীয় কালো রাত্রি। হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সামরিক বাহিনীর লোকে-রা। হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এক রাতের মধ্যেই। প্রথমটাতে নিরস্ত্র জনতা কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। অগনিত লোকের লাশের উপর দাঁড়িয়ে জীবিতরা বুঝতে পারে প্রকৃত ঘটনা এবং তখনই তারা শপথ নেয় রক্তের উপর দাঁড়িয়েই স্বাধীনতার নীড় রচনা করতে হবে-লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হবে। " লাহোর প্রস্তাবে ফিরিয়া যাইবার মত গনতান্ত্রিক ও প্রতিশ্রুত পন্থার জন্য যুদ্ধ করিতে হইল, এই স্বীকৃত অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

ও মেজরিটির বাঁচার দাবী আদায়ের চেষ্টায় নিরস্ত্র মেজরিটি সশস্ত্র মাইনরিটির হাতে বিশ্বের নিষ্ঠুরতম বর্বর গণহত্যার শিকার হইল।[৪৫] ২৫ শে মার্চের কালো রাত্রে জল্লাদ ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী হত্যা আর অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে যে কলংকিত অধ্যায় রচনা করেছে, তার তুলনা করার মত ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইতিপূর্বে অসহযোগের ডাক দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঢাকার রেইসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণে জাতিকে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার আহবান জানান। উক্ত জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, "যার যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাক। --- --- ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। --- --- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[৪৬]

স্বায়ত্ত শাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে এদেশের মানুষ সংগ্রাম করে আসছিল। কিন্তু ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ থেকে তারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। বাংগালী জাতি এজন্য প্রস্তুত ছিল না। অনাকাংখিত যুদ্ধ তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালে তারা অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষেই রায় দিয়েছিল নিজেদের অধিকার আদায়ের তাগিদে। কিন্তু ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ থেকে তারা সব দাবী পরিত্যাগ করে একমাত্র স্বাধীনতার দাবী নিয়ে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর মোকাবেলা করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ লাভ করে।

এবার জাতীয় ইতিহাসের আংগিকে গৌহাটী ইউনিয়নের ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে। গৌহাটী ইউনিয়ন প্রাচীন বাংলারই একটা অংশ। তবে কখন এখানকার জনপদ গড়ে উঠেছে, তার সঠিক কোন ইতিহাস লেখা নেই। প্রাচীন বাংলার কোন্ রাজার শাসনাধীনে এই এলাকা ছিল, তাও সঠিকভাবে জানা নেই। তবে এই এলাকা যে ত্রিপুরার হিন্দু রাজার শাসনাধীনে ছিল পুরানা কাগজ-পত্রে তা-ই প্রতীয়মান হয়। লিখিবদ্ধ কোন ইতিহাস না থাকায় এই এলাকার উৎপত্তি, লোক বসতি স্থাপন, জনপদের প্রাচীন পেশা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা সম্ভব নহে। স্থানীয় জনশ্রুতি, নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বৃদ্ধ লোকের প্রদত্ত তথ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করেই এখানকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে।

জনশ্রুতি অনুসারে এই এলাকা এক কালে নদী গর্ভে ছিল। কালক্রমে চর

Dhaka University Institutional Repository

জায়গায় এই এলাকায় দিন দিন জনপদ বিস্তার লাভ করে। এখন এখান থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে মেঘনা নদী অবস্থান করছে। কিন্তু কোন এক কালে পূর্বদিকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরবর্তী লালমাই পাহাড়ের পাদদেশ ছুঁয়ে নদীটি দক্ষিণদিকে "লমলম" সাগরে পতিত হত। "লমলম" সাগর বলতে বংগোপসাগরকে বুঝানো হয়ে থাকে। এটা উক্ত সাগরের স্থানীয় নাম। কালক্রমে মেঘনা নদী পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে গেলে এখানকার এই জনপদ-সহ এবং এর আশে পাশের জনপদসমূহ গড়ে উঠে।

জানা যায়, এখানকার বেশ প্রাচীন লোকালয় ছিল উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের পালপিরি এবং কচুয়া ইউনিয়নের উজানী গ্রাম। এই দুই গ্রামের মাঝখানে দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার। এই দুই গ্রামের মধ্যবর্তী বর্তমান লোকালয় আগে নদী গর্ভ ছিল বলে জানা যায়। এই দু'টি গ্রামেই কিছু প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে, যা এদের প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে। প্রাচীন লোক কাহিনীর বেহুলা-লখিন্দরের কিছু স্মৃতি এবং তাদের নিয়ে নানা জন-শ্রুতিও রয়েছে উজানী গ্রামে। বেহুলার দীঘি এবং বেহুলার শীলপাটা এখনও নানা রকম মুখরোচক কাহিনী ছড়িয়ে রেখেছে এই গ্রামে। মাত্র কিছুদিন আগে শীলটা নিখোঁজ হলেও পাটাটা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। জনশ্রুতি মতে বেহুলা-লখিন্দরের জীবন সায়াহ্ন এখানেই হয়েছে। অপরদিকে, পালপিরি গ্রামে রয়েছে দু'টি দীঘি। এগুলো কোন কালে কে খনন করেছে তার কোন ইতিহাস কারও জানা নেই। এদের একটির নাম দুলাল রাজার দীঘি এবং অপরটির নাম থানা পরীর দীঘি। এই দুই দীঘির উল্লেখিত দু'টি নামকে কেন্দ্র করেও এলাকায় নানা রকম কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের হালিমপুর এবং বুরগী গ্রামেও অনুরূপ কিছু প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে। হালিমপুর গ্রামে তিনটি দীঘি রয়েছে। এগুলো হলো -মুন্সির দীঘি, বামুন পদুয়ার দীঘি এবং গোমস্তার দীঘি। দীঘিগুলো বেশ বড় না হলেও এদের পিছনেও রয়েছে নানা লোক কাহিনী। কিন্তু বুরগী গ্রামের নিদর্শন একটু ব্যতিক্রমধর্মী। বুরগী নামটা আগে ঠিক এভাবে ছিলনা। আগে এই নাম ছিল বর্গী। বহিরাগত বর্গীরা এই গ্রামে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল এবং এখান থেকে বিভিন্ন লোকালয়ে হামলা চালাত বলে জানা যায়। আর তাই এই স্থানের নাম হয়েছিল বর্গী। পালপিরি গ্রামের ঠিক উত্তর পাশে এই গ্রামটা

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত পালশিরি গ্রামে দুলাল রাজার দীঘি থাকলেও গ্রামটিতে রাজ বাড়ীর কোন নিদর্শনই অদ্যাবধি মিলেনি। কিন্তু বুরগী গ্রামের একটা বাড়িতে মাটির নীচে বেশ প্রাচীনকালের ইটের সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে যাবতীয় কোন বাড়ীর নিদর্শন হবে বলে অনুমিত হয়। এক ফুটেরও বেশী দীর্ঘ এবং ৯ ইঞ্চির মত চওড়া ইটগুলো এখানে মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায়। এতে অনুমান করা যায় যে, এখানে প্রাচীন কালে কোন রাজবাড়ী ছিল এবং সম্ভবতঃ তা পালশিরি গ্রামের দীঘির নামের সাথে জড়িত দুলাল রাজার বাড়ীই হবে। এই বুরগী গ্রামের পূর্ব প্রান্তের গ্রামের নাম হাশিমপুর। এই গ্রামের সীমানার মধ্যে বুরগী গ্রামের পূর্ব পাশে রয়েছে গোমস্তার দীঘি। দীঘিটির পশ্চিম পাড় বেশ উঁচু। সম্ভবতঃ এখানে কোন বসত বাড়ী ছিল। দীঘির নামানুসারে অনুমান করে বলা যায়, এখানে কোন কালে কোন রাজ কর্মচারীর বাড়ী ছিল। অপর প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে দক্ষিণ সৌহার্দী ইউনিয়নের শাহারপাড় গ্রামে। গ্রামের নামানুসারে দীঘির নাম রাখা হলেও দীঘিটির খনন কাল, খননকারী প্রভৃতি বিষয় অজ্ঞাত। বিশাল আয়তনের এই দীঘিটিকে ঘিরেও রয়েছে নানা রকম কিস্সা-কাহিনী।

বহিরাগত হামলাকারীরা স্থানীয়ভাবে বর্গী নামে পরিচিত ছিল। বয়স্ক লোকেরা মনে করেন, বর্গীরা অহরহ হামলা চালিয়ে নদী বক্ষের চরাঞ্চলের জনপদ ধ্বংস করে দিত। জনগনকে পরাস্ত করে তারা রাজপুরীতে হামলা চালাত। এর ফলে এতদাঞ্চলের রাজারা ধ্বংস হয়ে গেলে জনগনও কোন রকমে নিজেদের প্রান বাঁচিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হত। ধারনা করা হয়, এতদাঞ্চল বেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের শাসনাধীনে ছিল এবং তাদের নিজেদের কোনরূপ ঐক্য ও সহযোগিতা ছিল না বলে নদী পথে আগত দস্যুরা আক্রমন চালিয়ে সহজেই তাদের ধ্বংস করে দিত। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রমও ঘটত। রাজারা ধ্বংস হয়ে গেলেও জনগন তাদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে যাওয়ার আগে হামলাকারীদের সাথে অবশ্যই সংঘর্ষ হত। অর্থাৎ রাজারা হেরে গেলেও জনগন বহিরাগত দস্যুদের বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিত না। হামলাকারীদের কাছে পরাস্ত হওয়ার পরই কেবল তারা পালাতে বাধ্য হত। মগ মুল্লুকের মগ এবং ভারতের মারাঠাসহ বিভিন্ন দেশের সামুদ্রিক দস্যুরা ছিল এখানকার জন্য চরম আতংকের বিষয়। এসব দস্যু অত্যন্ত হিংস্র ছিল। জানা যায়, বর্গী নামের এসব বহিরাগত বুরগী গ্রামে বসতি স্থাপন করলেও স্বদেশে আর ফিরে যেতে পারেনি। স্থানীয় লোকজন

Dhaka University Institutional Repository

এবং মুসলিম শাসনামলে মুসলিম শাসকগন দ্বারা আক্রান্ত হয়েই এক সময়ে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন গ্রামে তাদের ডুবে যাওয়া নৌকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। পুকুর খননের সময় প্রাপ্ত এসব নৌকার অংশগুলো বহিরাগতদের নৌকার অংশ হবে বলে মনে করা হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারনে অনেক জনপদ বিরান হয়ে যেত। অথবা লোকজন মরুবাসী যাযাবরের মত সর্বদা স্থান পরিবর্তন করে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে ফিরত। সবল-দুর্বলের দ্বন্দ্বের জনশ্রুতিও এখানে রয়েছে। বহিরাগত হামলা ছাড়াও আভ্যন্তরীন শত্রুতা এখানকার জনবসতি বিরান হওয়ার পিছনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। উঁচু এলাকার লোকেরা নীচু এলাকার লোকদের চেয়ে একটু বেশী সুখ ভোগ করত। তাই নীচু এলাকার লোকদের লোলুপ দৃষ্টি সব সময় উঁচু এলাকার প্রতি নিবদ্ধ থাকত এবং সুযোগ মত তারা হামলা চালিয়ে উঁচু এলাকার লোকদের ঘায়েল বা বিতাড়িত করে দিয়ে এলাকাটিতে নিজেদের বসতি গড়ে তুলত। আবার কখনও স্থানীয়দের দুর্বার প্রতিরোধের মুখে উঁচু এলাকার হামলাকারীরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। জানা যায়, এখানকার অধিকাংশ গ্রামেই বহিরাগত হামলার মোকাবেলায় রাজার সাহায্য বঞ্চিত গ্রামবাসী নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনী পুষত। বহিরাগতদের হামলা প্রতিহত করার বা তাদের কাবু করার জন্য এসব লাঠিয়াল মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করত। এধরনের প্রতিরোধের মুখে বহিরাগতরা অনেক সময় বিনা আক্রমনেই এলাকা ছেড়ে পালাত। আবার মাঝে মাঝে এসব সাময়িক বাধা অপসারন করে বহিরাগতরা কোন গ্রাম বা জনপদের নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনীকে পরাস্ত করার সাথে সাথে জনসাধারনও কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেত, নতুবা বহিরাগতদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। আভ্যন্তরীন শত্রুর দ্বারা কোন জনপদের পতন ঘটলেও সাময়িকভাবে তারা সেখান থেকে সরে পড়লেও তারা একদিকে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং অপরদিকে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। একদিন সুযোগ মত হামলা চালিয়ে নিজেদের এলাকা তারা পুনরায় দখল করে নিত। এভাবে দীর্ঘ কালের হামলা, পাল্টা হামলার মধ্য দিয়ে এখানকার জনপদ স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

উপরে উল্লেখিত এসব জনশ্রুতি ও ধারনার আলোকে বলা যায়, নদী গর্ভ থেকে জেগে উঠা চরে বর্তমানের মত স্থায়ী বসতি গড়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছে। প্রয়োজ-

Dhaka University Institutional Repository

নীয় শক্তি, সামর্থ্য ও পারস্পরিক ঐক্যের অভাবে এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তিগুলো বহিরাগত দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। স্থায়ী জনবসতি তখনও গড়ে না উঠায় সে সব রাজা বা শাসকদের কাহিনী পুরুষানুক্রমে লোক সমাজে বিদ্যমান থাকেনি। নদী বক্ষের চরায় তাদের নির্বাসিত কালের সাক্ষী হয়েও টিকে রয়নি। কেবলমাত্র তাদের খননকৃত উঁচু পাড় বিশিষ্ট দীঘিগুলোই স্মৃতি হয়ে আছে। এসব দীঘি হয় নিজেদের স্মরণীয় করে রাখার জন্য নতুবা শুকনো মওসুমে পানি মওজুদ রাখার জন্য এত উঁচু উঁচু পাড় বেঁধে খনন করা হয়েছিল।

এখানকার জনপদ বহুবার বিরান হয়েছে – এটা সহজে অনুমেয়। একমাত্র মুসলিম আমলেই স্থায়ী বসতি কায়েম হতে শুরু করে। অবশ্য এর গবেষণার জন্য নির্বাচিত ইউনিয়নদ্বয়ের সব এলাকার জন্য একথা প্রযোজ্য নয়। আজিকার দিনের মত তখনকার পরিবেশ ছিল না। লোক বসতি যেমন কম ছিল, তেমনি ছিল নদী-নালা, খাড়ি-জংগল প্রভৃতি। বয়োবৃদ্ধদের মতে, এখানকার বেশীর ভাগ গ্রামই গভীর অরণ্য সাফ করে উঠেছে। এগুলোতে বন্য হাতী, মহিষ, বাঘ, ভালুক ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু বাস করত। বাঘের উৎপাত সম্পর্কিত নানান কাহিনী বৃদ্ধজনেরা শুনে গল্পচ্ছলে বলে থাকে। দিনের বেলাতেও বাঘে-মানুষে লড়াই হয়েছে এবং লড়াইয়ের পরিণতিতে কারও মৃত্যু ঘটেছে, আবার কেউ কেউ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে – এসব বৃদ্ধজন তাদের কাউকে কাউকে দেখেছে এবং তাদের নামে আজও গল্প করে থাকে। মাত্র কয়েক বছর আগের ইতিহাস যদি এমনি হয়ে থাকে তবে প্রাচীন কালের ইতিহাস যে আরও ভয়াবহ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক বছর আগেও প্রাচীন কালের দীঘিগুলোর উপর জমে থাকা ঘাসের উপর দিয়ে মানুষ বা অন্যান্য ভারী জন্তু অনায়াসে চলাচল করতে পারত। নানান অন্ধ বিশ্বাসের কারণে লোকজন সে সব পরিস্কার করত না। যাহোক, নিকট অতীতের ইতিহাসের আলোকে বলা যায় যে, যে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ তখন বাস করত, সেই অবস্থায় একের সাথে অপরের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে বন-জংগলের মধ্য দিয়ে তবে মানুষকে চলাচল করতে হত। কাজেই এমনি অবস্থায় পারস্পরিক যোগাযোগ না স্থাপন করা দুঃসাধ্য ব্যাপারই ছিল।

শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যে সব জনপদ টিকেছিল তাদের স্থায়িত্বের গ্যারান্টি দিলে মুসলিম আমলে। বর্গীদের তাড়িয়ে দিয়ে মুসলিম শাসকরা এখানে শান্তির দ্বার উন্মোচন করেন। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই অঞ্চল ঘন জনবহুল এলাকায় পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই আমলেই স্থানীয় জনগন এবং মুসলিম শাসকদের সম্মিলিত হামলার মুখে বর্গীরা নিশ্চিহ্ন হয় এবং পরবর্তীতে তাদের কোন দল এতদঞ্চলের উপর আগের মত উপর্যুপরি হামলা ও লুটপাট চালাবার সাহস পায়নি। মুসলিম শাসকদের এরূপ সাহসী ও কল্যাণকর ভূমিকার জন্যই এখানকা-র জনগন দলে দলে ইসলামী পতাকাতলে সমবেত হয় বলে অনুমান করা হয়। তবে কোন মুসলিম শাসকের আমলে বর্গীরা এখান থেকে উচ্ছেদ হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। এখা-নকার গ্রামগুলোর নামের প্রতি দৃষ্টি দিলে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, মুসলিম শাস-কদের আমল থেকেই এখানকার জনগন বহিরাগত হামলামুক্ত জীবন যাপন করতে শুরু করেছে এবং ইসলামের প্রতি অনুপ্রানিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতির আলোকেই বিভিন্ন স্থানের নামকরন করে। দেখা গেছে, এখানে বেশীর ভাগ গ্রামের নামই মুসলিম সংস্কৃতির প্রতীক বহন করে। যে সব গ্রামে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল , বা পুরাপুরি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল সে সব গ্রামের নাম এখনও হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিই বহন করে।

মুসলিম আমলেও এখানকার কিছু কিছু জনপদ বিরান হওয়ার আলামত পাওয়া যায়। এজন্য সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারীই দায়ী হবে। 'কলাউঠা' তখন এক চরম আতংকের রোগ ছিল। কোন জনপদে কারও এই রোগ দেখা দিলে অন্যেরা ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেত। ফলে কোন কোন এলাকা একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ত এবং কালক্রমে সে সব স্থানে গভীর অরন্য গড়ে উঠত। এমনি এক গভীর অরন্যের ভিতর পালগিরি গ্রামে একটি অক্ষত মসজিদ পাওয়া গেছে। সুতরাং দেখা যায়, নানা কারনে বারংবারের উত্থান-পতনের কষাঘাতে বর্তমান জনপদের মাঝে অতীতের ইতিহাস অজানা রয়ে গেছে।

মধ্যযুগে এই এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে ছিল এবং দু'টি ইউনিয়ন দুই পরগানাভুক্ত ছিল। উত্তর গৌহাটী ছিল সোনাই নবাবপুর পরগানাভুক্ত এবং দক্ষিণ গৌহাটী ছিল মেহার পরগানাভুক্ত। আর সে সময় ইউনিয়ন নামের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। ব্রিটিশ আমলে বর্তমান ইউনিয়নদ্বয়ের এলাকা নিয়ে গৌহাটী নামের একটি ইউনিয়ন কায়েম হয়। " জাতীয় প্রেক্ষাপটে গৌহাটী ইউনিয়ন " অংশের আলোচনায় এব্যাপারে আরও আলোকপাত করা হবে। মধ্যযুগের এই এলাকার ইতিহাস সম্পর্কেও বেশী কিছু জানা যায় না। এসময়ে সুফী দরবেশদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। বজরায় চড়ে যারা এদেশে আসেন। তারা মানু-ষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তালিম দিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আকিদা কায়েমে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। গ্রামের মানুষের মধ্যকার সমস্যাবলী সমাধানের ক্ষেত্রে এসব সুফী-দরবে

Dhaka University Institutional Repository

-শ বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। গ্রামের মানুষের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদ মিমাংসার জন্য এসব দরবেশ বা তদীয় মনোনীত খলিফারগন গ্রামে সালিশ ডেকে ইসলামী ব্যবস্থার আলো-কে সব বিবাদের মিমাংসা করে দিতেন। সুফী-দরবেশদের এরূপ বিচার বা বিবাদ মিমাংসার ব্যবস্থা শের শাহকে বেশ আকৃষ্ট করেছিল বলে তিনি তার শাসনামলে পঞ্চায়েত গঠন করে গ্রাম শাসনের ভার পঞ্চায়েতের উপর ছেড়ে দেন। "শেরশাহ গ্রামগুলিকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করেন। প্রত্যেক গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগনকে লইয়া পঞ্চায়েত গঠিত ছিল। পঞ্চায়েত গ্রামের বিবাদ মিমাংসা করত এবং গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলসেচ, প্রহরা এবং অন্যান্য জনকল্যানমূলক কার্যাবলী সম্পন্ন করিত।"[৪৭] গ্রামে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বলবৎ থাকলেও জনগনের উপর সুফী দরবেশদের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশী। মুসলিম শাসনামল সম্পর্কে এর বেশী কিছু জানা যায় না।

এর পর আসে ব্রিটিশ আমলের কথা। এসময়ে বাংলার অন্যান্য এলাকার জনগনের মত এখানকার জনগনও শোষিত এবং নির্যাতিত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেক মুসলমান সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং উপায়ান্তর না দেখে তারা পরিবার পরিজন নিয়ে আসামের পাহাড় অঞ্চলের দিকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। জানা যায়, ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের পর সে সব লোকদের কিছু কিছু বংশধর এখানে এসে 'রিফুজি' হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। আরও জানা যায়, ব্রিটিশ আমলের শুরুতেই খাজনার ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন আসে। তখন এই এলাকা হিন্দু জমিদারের অধীনে চলে যায়। এই আমলের জমিদারদের অনেক নৃশংসতার কাহিনী আজও লোকমুখে শোনা যায়। সে সময় গৌহাটী এলাকায় কোন হিন্দু জমিদার ছিল না। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বর্তমান চান্দিনা থানার আমলকী ও কৈলাইন এবং বরুড়া থানার গালেমপুর গ্রামে জমিদার ছিল। সম্ভবতঃ গালেমপুরের জমিদাররাই পরিপূর্ণ জমিদার ছিল এবং এই এলাকা তাদের জমিদারীর অধীন ছিল। অপরদিকে, কৈলাইন এবং আমলকী গ্রামের জমিদার বলে কথিত পরিবারগুলো প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ জমিদার ছিল না। তাদের প্রত্যক্ষ জমিদারী ছিল কিনা এ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, গালেমপুরের জমিদারদের অধীন জমিদারীর খাজনা আদায়ের জন্য উক্ত দুই গ্রামের কথিত জমিদাররা কতিপয় এলাকা নিয়ে নিয়েছিল। কৈলাইন গ্রামের সিংহ উপাধিধারী এবং আমলকী গ্রামের বর্ধন উপাধিধারী হিন্দুরা পাকিস্তান হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রভাব অক্ষুন্ন রেখেছিল। অত গৌহাটীর উপর তাদের জমিদারী বহাল না থাকলেও হিন্দু জমিদার হিসেবে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে মাথা তোলা ব্রিটিশ

Dhaka University Institutional Repository

শাসনামলে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তথাপি এলাকায় তাদের চেয়ে বেশী প্রভাবশালী এবং জনগনের কাছে সবচেয়ে বেশী আতংকের কারন ছিল গালেমপুরের জমিদাররা। তাদের বংশগত উপাধি ছিল 'কর্তা'। তারা ছিল পূর্ণ জমিদার এবং অত্র এলাকা থেকে গ্রামটি প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে।

উল্লেখিত তিনটি হিন্দু জমিদার গোষ্ঠীর অত্যাচারের কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবেও কোন কোন বয়স্ক লোক বর্ণনা করেছেন। তাদের হাত থেকে মুসলমান তো দূরের কথা, নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও রেহাই পেত না। এব্যাপারে কয়েকজন বয়স্ক হিন্দুরও মতামত নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, গালেমপুরের জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী সকলের বর্ণনায় এক রকম। এসব জমিদার সব সময় হাতী চড়ে বেড়াত। যে কোন প্রজা সামনে পড়লেই দেবতাকে সম্মান করার ন্যায় মাথা নত করে তাদের পা ছুঁয়ে ভক্তি করতে হত। খাজনা আদায়ের ব্যাপারে তাদের আচরন ছিল অতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক। খাজনা দিতে কারও দেরী হলে বা কেউ ব্যর্থ হলে তার বাড়ী ক্রোক করা হত এবং তাকে ধরে নিয়ে হাতীর পায়ে পিষে মারা হত। নতুবা শীতের রাতে [illegible] পানিতে বেঁধে রেখে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হত। তাদের কর্মচারীদের কোন নিকট আত্মীয় হলে উক্ত কর্মচারীদের সুপারিশে ক্ষেত্র বিশেষে কেউ কেউ ছাড়া পেত। কোন সুন্দরী নারীর প্রতি তাদের নজর পড়লেই তাকে জোর করে তুলে নিত। মুসলমানদের দাঁড়ি রাখা, ইসলামী লেবাছ এবং গরু জবাই করা নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি বিভিন্ন পূজা-পার্বনে ধুতি পরে নগদ নজরানা নিয়ে হাজির হতেও মুসলমানদের বাধ্য করা হত। অন্যান্য সময়ও ধুতি পরা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে মুসলমানদের সাথে উল্লেখিত গালেমপুরের জমিদারদের এমনি আচরন ছিল। তাদের তুলনায় কৈলাইন এবং আমলকী গ্রামের জমিদাররা অনেকটা নমনীয় ছিল। তবে প্রজাদের, বিশেষ করে মুসলমানদের সকলেই হেয় চোখে দেখত। জমিদার বাড়ির পাশ দিয়ে মুসলমান বা হিন্দু কেহই ছাতা মাথায় দিয়ে বা জুতা পরে যেতে পারত না। এমনকি তাদের বাড়িকে পিঠ দেখিয়েও চলা যেত না। হিন্দু-মুসলমান যে কেহই তাদের সামনে করজোড়ে দাঁড়াতে বাধ্য ছিল।

গালেমপুরের জমিদারদের জুলুম থেকে এখানকার জনসাধারন কিছুটা

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপদ ছিল একদিকে পূর্বোক্ত দু'টি গ্রামের নিম-জমিদারদের কারনে। নিম-জমিদার বলতে স্থানীয়ভাবে তাদেরই বুঝানো হত যারা পুরাপুরি জমিদার নয়। অপরদিকে, পালেমপুরের নিকটবর্তী শাকপুর গ্রামের মুসলমানদের কারনেও এখানকার লোকজন অনেকটা নিরাপদ ছিল। জানা যায়, শাকপুর গ্রামের মুসলমানরাই সর্বপ্রথম জুলুমবাজ জমিদারদের বিরুদ্ধে গোচ্চার হয়ে উঠে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা জমিদারদের গতিকেও চ্যালেঞ্জ করে। ব্রিটিশের আশ্রয়-প্রশ্রয় ছিল বলে জমিদারদের কাবু করতে মুসলমানরা সক্ষম হয়নি। তবে তারা জমিদারদের কাছে বেশ আতংক হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের ভয়ে জমিদাররা পশ্চিমদিকের এসব এলাকায় দিকে হাত বাড়াতে সাহস পেত না। আর এজন্যই হয়তো জমিদাররা এ অঞ্চলের জমিদারীর ভার নিম-জমিদারদের হাতে ছেড়ে দেয়।

এই এলাকায় হিন্দু জমিদার না থাকলেও এখানে বেশ কিছু প্রভাবশালী হিন্দু ছিল এবং জমিদারদের সাথে তাদের আত্মীয়তা বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া, ইংরেজের সাথে সম্প্রীতির কারনে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর পুরাপুরি প্রভাব খাটানো সম্ভব ছিল। পালগিরি, মাউলা, পাথার পাড়া ও গোবিন্দপুর গ্রামের হিন্দুরা ছিল এসব প্রভাবশালী হিন্দুদের অন্যতম। কলিকাতায় তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তাদের ছেলে-মেয়েরা সেখানে লেখা-পড়া করত। অপরদিকে, এখানে তাদের মহাজনী ব্যবসা ছিল। চড়া সুদে মুসলমানদের ঋণ দিয়ে বিনিময়ে তাদের জমি-জমা কেড়ে নিত। ফলে দিন দিন এখানে মুসলমানরা ভূমিহীন হয়ে পড়তে থাকে। আর এজন্যই জমিদার শ্রেণী ও প্রভাবশালী হিন্দুদের প্রতি এখানকার মুসলমানদের ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। পরবর্তীতে কোন এক সময় ইউনিয়ন দু'টো নায়ার নবাবদের অধীনে চলে যায়। আর তখন থেকেই পূর্বোক্ত জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এখান থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। তবে হিন্দুদের প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে। "জনগনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাস এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য" আলোচনার ক্ষেত্রে এব্যাপারে আরও কিছুটা আলোকপাত করার আশা করি।

১৯০৫ সালে বংগ ভংগের পর থেকেই এখানকার ইতিহাস লোর মুখে বেশ কিছুটা জানা যায়। এক্ষেত্রেও বয়োবৃদ্ধ লোকেরাই একমাত্র উৎস। বংগ ভংগকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে অবনতি ঘটে এবং পরবর্তী কয়েক বছর ধরে তার জের

Dhaka University Institutional Repository

চলতে থাকে- এমন সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও কয়েকজনকে পাওয়া গেছে। বয়স একশত বছরের কাছাকাছি হবে এমন বৃদ্ধ বয়সীদের বাল্যকালের ঘটনা ছিল ১৯০৫ সালের পরবর্তী ঘটনাবলী। অর্থাৎ বংগ ভংগ কেন্দ্রিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তারা মোটামুটি ওয়াকেবহাল। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বংগ ভংগের প্রতি সমর্থন না দেওয়ার জন্য প্রভাবশালী হিন্দুরা মুসলমানদের মধ্যে নানা রকম প্রচারনা চালাত। মুসলমানদের বলা হত - বংগ ভংগ আদেশ জারি করে ইংরেজরা মুসলমানদের চিরদিন গোলাম বানিয়ে রাখবে। এমনকি বংগ ভংগ সমর্থন করার পরিনতি সম্পর্কেও মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হত। তাদের বলা হত - বংগ ভংগ সমর্থনকারীদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভারতীয় কংগ্রেস আত্মঘাতী দল গঠন করেছে এবং হাট- বাজারে প্রায়ই গুজব রটে যেত যে, কংগ্রেসের আত্মঘাতী দলের কর্মীরা বাজারে হামলা করতে ছুটে আসছে। প্রাণ ভয়ে লোকজনের কেউ কেউ ছুটে পালাত। আবার অনেকেই 'নারায়ে তকবীর/ আল্লাহু আকবর' শ্লোগান দিয়ে মুসলমানদের একত্রে জড়ো করার প্রয়াস চালাত। এরূপ বিশৃংখলার সুযোগে কেউ কেউ লুটপাটের সুযোগ নিত। ১৯০৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পরই অবস্থা শোচনীয় রূপ নেয়। এসময়ে অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের আশে পাশের এলাকাগুলোতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এমনকি অনেক জায়গায় অনেক ছোট খাটো ঘটনা ও ঘটে গিয়েছিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, কচুয়া থানার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল রহিমানগর বাজার। এটা কেবল অত্র ইউনিয়নদ্বয়েরই মিলনস্থল নয়, আশে পাশের কয়েকটি ইউনিয়ন এবং এমনকি কচুয়া থানার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের থানাগুলোর বিরাট অংশেরও মিলনস্থল। চান্দিনা থানার দক্ষিণাংশ এবং বরুড়া থানার পশ্চিমাংশের লোকের কাছে এই বাজার বেশ সুপরিচিত। তারা নিয়মিত এই বাজারে এসে তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক দ্রব্যসামগ্রী কেনা-কাটা করে থাকে। ফলে এই বাজারের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। আর তাই এখানে কিছু ঘটলে তার ঢেউ আশে পাশের এলাকায় যেমন লাগত, তেমনি অন্য অন্য কোথায়ও কিছু ঘটলেও এই বাজারে খবর পৌঁছে যেত এবং বাজার গরম হয়ে উঠত। অর্থাৎ আশে পাশের এলাকার ঘটনাবলীও এ বাজারের উপর বেশ প্রভাব ফেলত।

অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের প্রভাবশালী হিন্দুরা ছাড়াও অন্যান্য ইউনিয়নের বা এলাকার প্রভাবশালী হিন্দুরাও এখানকার ঘটনাবলীর সাথে জড়িয়ে পড়ে। আর তাই মুসলিম - হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই একে অপরের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাংগায় মেতে উঠে। ছোট খাটো অনেক ঘটনাই প্রতিদিন ঘটতে থাকে। তুলনামূলকভাবে এখানে হিন্দুরা সংখ্যায় কম হলেও

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রভাবশালী হিন্দুদের সমর্থনে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এগিয়ে না এলেও কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকার বিদ্যমান থাকায় হিন্দুরা মুসলমানদের উপর প্রভাব খাটাতে বেশ তৎপর ছিল। জানা যায়, কংগ্রেসী সরকারের নির্দেশে এখানকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক বংকিম রচিত 'বন্দে মাতরম' সংগীত গাওয়ানো হত। এই সংগীত গাইতে মুসলমান ছেলেরাও বাধ্য ছিল। এই সংগীত তথা 'বন্দে মাতরম'-এর পাশাপাশি বাধ্যতামূলক স্লোগান ছিল 'গান্ধী কি জয়'। এমন স্লোগান দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় অনেক মুসলমান শিক্ষককে চাকুরী হারাতে হয়েছে। ফলে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে এই ক্ষোভের জের চলতে থাকে।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনোত্তর কালে এই এলাকায় ভয়াবহ দাংগা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রথমতঃ রহিমানগর বাজারেই এই দাংগার সূচনা হয়। বাজার বসার নির্দিষ্ট দিন হলো রবিবার ও বৃহস্পতিবার। এই বাজার প্রতিদিন বসলেও অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রতিদিন পাওয়া গেলেও উল্লেখিত দিনে বাজার বেশ জমজমাট হয়ে থাকে। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এই বাজারে আসে। নির্বাচনে মুসলমানরা পাকিস্তান-এর পক্ষ সমর্থন করায় হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে নাকি তাদের উপর হামলা চালায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দাংগা সংঘটিত হয়েছিল বৃহস্পতিবার দিন। এই দাংগা সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। কারও মতে দাংগার জন্য হিন্দুরা দায়ী। আবার কেউ কেউ এজন্য মুসলমানদের দায়ী করেছে। তবে সকলেই এব্যাপারে এক মত যে, কলিকাতায় সংঘটিত দাংগার জের হিসেবেই এখানেই এই দাংগা সংঘটিত হয়েছে। এখানকার মুসলমানদেরও কিছু সংখ্যক কলিকাতায় চাকরী-বাকরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। কলিকাতায় দাংগা সংঘটিত হলে এখানকার হিন্দুরা নাকি কলিকাতায় এখানকার মুসলমানদের অনেককে হত্যা করে এবং তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুটপাট করে নিয়ে যায়। এদের কেউ কেউ কোন রকমে প্রান বাঁচিয়ে এলাকায় এসে এখবর দিয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর এখানকার মুসলমানদের মাঝে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাও ছিল দাংগার অন্যতম কারন। অনেকের মতে, কলিকাতা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালানো মুসলমানরাই এখানকার দাংগার জন্য দায়ী। এই দাংগার দিন বাজারে গুজব ছড়ায় যে, একজন মুসলমান যুবককে 'বন্দে মাতরম' সংগীত গাইতে বাধ্য করতে না পেরে হিন্দুরা তাকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এখবর বাজারে ছড়িয়ে পড়ার

Dhaka University Institutional Repository

পর মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। সেদিন বাজারে পুলিশের লোক এসেছিল। বিনা প্রয়োজনে এবাজারে সাধারণতঃ পুলিশ আসত না। কিন্তু দাংগার দিন পুলিশ দেখতে পেয়েই মুসলমানরা গুজবের সত্যতা খুঁজে পায় এবং পুলিশের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠে। একই সময়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ও দাংগায় মেতে উঠে। পুলিশ প্রথমে হিন্দুদের পক্ষ নিলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ তার সমর্থন ধরে রাখতে পারেনি। মুসলমানদের হামলার মুখে পুলিশ নিজের জীবন রক্ষা করতেই অক্ষম হয়ে পড়ে। অবশেষে পুলিশ গুলী চালায় এবং ঘটনাস্থলেই কয়েক জন মুসলমান মারা যায়। এতে মুসলমানদের জেদ আরও বেড়ে যায় এবং তারা পুলিশের উপর আত্মঘাতী হামলা চালালে কয়েকজন পুলিশ ঘটনাস্থলে মারা যায়। অন্যেরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এরপর দাংগা প্রতিশোধের রূপ নেয়। কিন্তু মুসলমানেরা বাজারের হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। এই সুযোগে বাজারে ব্যাপক লুটপাট সংঘটিত হয়। সন্ধ্যার পর এই দাংগা গ্রামের দিকেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষতঃ যাদের টার্গেট করে এই দাংগার সূত্রপাত হয়েছিল তারা বাজার থেকে পালিয়ে যাওয়ায় দাংগা গ্রামের দিকে ছড়ায়। প্রভাবশালী হিন্দুরা যে সব গ্রামে বাস করত, রাতে তাদের বাড়ী-ঘরে হামলা চালিয়ে তাদের অনেককে ঘায়েল করা হয়। জানা যায়, এদের আত্মীয়-স্বজনরাই কলিকাতায় এখানকার মুসলমানদের হত্যা করেছিল। এই দাংগার হাত থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল তারা ব্রহ্মপুত্রে আরতে চলে যায়। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এই দাংগায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সমর্থন করেনি বা কোনভাবে দাংগায় জড়ায়নি। ফলে প্রভাবশালী হিন্দুদের প্রভাব এখানে চুরমার হয়ে যায়।

পুলিশ নিহত হওয়ায় পরদিন থেকে বাজারে সৈন্য মোতায়েন করা হয়। শিখ সৈন্যরা বাজারে গরু জবাই নিষিদ্ধ করায় মুসলমানদের মধ্যে আবার উত্তেজনা দেখা দেয়। মুসলমানদের উত্তেজনার সুযোগে পাঠান সৈন্যরা এগিয়ে আসে এবং নিজেরা গরু জবাই করে গরুর গোশত প্রদর্শন করে মুসলমানদের দোকান-পাট খোলার আহবান জানায়। এখানকার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সাহসিকতায় ও সর্বোপরি পাঠান সৈন্যদের সহযোগিতার দিক লক্ষ্য করে শিখ সৈন্যরা এখানে হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকে। ফলে দাংগায় অংশ গ্রহনকারী হিন্দুরা বেশ বিপদাপন্ন অবস্থায় পড়ে যায়।

১৯৪৬ সনে সংঘটিত এই দাংগা প্রভাবশালী হিন্দুদের কেবল প্রভাবই চূর্ণ করেনি, তাদের এদেশ ত্যাগে বাধ্য করে। অপরদিকে, এখানকার মুসলমানরাও কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে চলে আসে। দাংগার পরও যে সব হিন্দু এখানে ছিল ,তারা কেবল তাদের সম্পত্তি দেখা-শুনা করার জন্যই ছিল।অর্থাৎ দু'একজন করে কেবলমাত্র বাড়ি-ঘর আর জায়গা সম্পত্তি পাহারার জন্য এখানে অবস্থান করছিল। ১৯৭৭ সনের পর বেশীর ভাগ উচ্চ বর্ণের হিন্দুই জমিজমা বিক্রী করে ভারতে চলে যায়। এরপর যারা ছিল তারা ১৯৬৫ সালের ভারত - পাকি -স্তান যুদ্ধের পর সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে ভারতে চলে যায়। প্রসংগক্রমে এখানে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বিষয়েও কিছুটা আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। তারা এখানে **শ্রমজীবী** মানুষ। এই শ্রেণীটির খুব কম সংখ্যকই ভারতে গিয়েছে। কারন, এখানে দাংগা হওয়া সত্বেও মুসলমানদের দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি হয়নি।**দাংগায়**অংশ নেয়নি বলে নিজেরাও দাংগার শিকার হয়নি। এদেশকে তারা জন্মভূমি **হিসেবেই** ভালবাসে এবং মুসলমানদেরও ভাইয়ের মত মনে করে। তবুও ভারতের প্রতি তাদের একটা **স্বাভাবিক দুর্বলতা** রয়েছে। আরএকে দুর্বল -তার মূলে রয়েছে ধর্ম। কেননা, তাদের পবিত্র ধর্মীয় **স্থানগুলো ভারতে** রয়েছে। এই একই ধর্মীয় কারনে মুসলমানরাও আরবের প্রতি দুর্বল। সেখানে কিছু ঘটলে এদেশে অবস্থান করেও তারা তা বরদাশত করতে পারেনা- এখান থেকেই তারা গর্জে উঠে। ধর্মের প্রতি মানুষের যে আকর্ষন ও ভালবাসা এমনটি আর কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় না।বিষয়-সম্পত্তি, আপন-স্বজন, দেশ-জাতি প্রভৃতি বিসর্জন দিয়েও মানুষ আপন ধর্মের পরিচয় উর্ধ্বে রাখতে চায়। এখানকার . মুসলমান-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মের ব্যাপারে এমনি দুর্বলতা রয়েছে। তবে অদ্যাবধি একের দ্বারা অন্যের ধর্ম পালনে কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্বেও এখানে মুসলিম-হিন্দু সম্প্রীতি সত্যিই এক বিরল দৃষ্টান্ত। এখানকার বেশীর ভাগ মানুষ যেহেতু **শ্রমজীবী**, সেহেতু তারা স্বাভাবিকই নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম এবং ধর্মীয় রীতি -নীতিই কেবলমাত্র **ব্যবধান**। তারা একে অপরের সুখে-দুঃখে সমান ভাগে ভাগী হয়। তাদের সম্প্রীতি এতই মধুর যে, ছেলে-মেয়ের বিয়েতে প্রতিবেশীকে দাওয়াত না করলে যেন বিয়ের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যায়।একই সিমা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা একই সাথে লেখা-পড়া করে থাকে। হিন্দুদের মেলা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে মুসলমান ছেলেরা যেভাবে দলে দলে যোগদান করে , দেখে মনে হয়, এদের উপস্থিতি ছাড়া এদের অনুষ্ঠান জমজমাট হয় না, বা বিরক্তি হয়। আবার মুসলমানের মিলাদ বা ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

জলসায় হিন্দুরা যেভাবে হাজির হয়, তাতে মনে হয়, তাদের অনুষ্ঠানে মুসলমানদের হাজিরার ঋণ তারা পরিশোধ করছে। মুসলমান হেকিমের দেওয়া ঔষধ বা মৌলবী সাহেবের পড়া পানি গ্রহন করে হিন্দুরা যেমন ধন্য হয়, তেমনি হিন্দু কবিরাজ বা সাধুর পড়া পানি গ্রহন করে মুসলমানরাও ধন্য হয়। এমন মধুর সম্পর্ক বজায় রেখেই হিন্দু-মুসলমান আজীবন এখানে বসবাস করছে। ধর্ম তাদের কারও মাঝেই কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। ব্রিটিশ আমলে চরম সাম্প্রদায়িক দাংগা কালেও এই সম্প্রীতি যেমন বজায় ছিল, তেমনি পাকিস্তান আমলেও ছিল এবং অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর জনগনের মনে আশার সঞ্চার হলেও বাস্তবে পাকিস্তান তাদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনেনি। কেবলমাত্র মানচিত্র, পতাকা আর শাসকেরই পরিবর্তন ঘটেছে। শোষন, নির্যাতন আর বঞ্চনা ব্রিটিশ আমলের মতই অব্যাহত থাকে। তাছাড়া পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সাথে সাথেই ভাষা সংক্রান্ত যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তা এখানকার জনগনের মাঝেও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এখানে খবর ছড়ায় যে, বাংলা ভাষায় আর কথা বলা যাবে না। সরকার সহসাই আইন জারি করে বাংলায় কথা বলা নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে। এখবর জনগনকে এতই ক্ষুব্ধ করেছিল যে, পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর মনের আনন্দে মহান নেতার শ্রদ্ধা ভরে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর যে ছবি তারা ঘরে ঘরে সাজিয়ে রেখেছিল, তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দেয়। এরপর ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হওয়ার খবরে এখানকার জনগনও সারা দেশের মানুষের ন্যায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এখানকার বেশীর ভাগ লোক মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষার উপর হামলাকে তারা বরদাশত করতে পারেনি। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রেরা বিক্ষোভ মিছিল করে নানা স্লোগানে থানা ঘেরাও করলে সাধারন মানুষও তাদের দলে শরীক হয়। জানা যায়, এ ঘটনার পর উর্দুর প্রতি এখানকার জনগনের এতই ঘৃনাবোধ জন্মে যে, কেহ কোন কারনে সামান্যতম উর্দু উচ্চারন করলেও শ্রোতারা তার জন্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলত। এভাবে দিন দিন পাকিস্তানী শাসক বিরোধী মনোভাব এখানে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

১৯৫২ সালের ঘটনাবলীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে। এ নির্বাচনে এখানকার জনগন যুক্তফ্রন্টকে একচেটিয়া ভোট দেয়। মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ তার পক্ষে জনগনের সমর্থন ধরে রাখতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়, বরুড়া থানার কোন কোন এলাকায় ওহাবীরা জনগনকে ভোট দানে বাধা দিচ্ছিল। কারন, ওহাবীরা যুক্তফ্রন্ট **বিরোধী ছিল।** ভোট প্রদানে বাধা দানের খবর এখানকার লোকজনের মাঝে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং তারা দলে দলে বরুড়ার সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ছুটে গিয়ে ওহাবীদের বাধা অপসারন করে জনগনের ভোট প্রদানের সুযোগ করে দেয়। আর এভাবেই এখানকার জনগন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর প্রতি নিজেদের ঘৃনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অন্যদেরও দলে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। আরও জানা যায়, যুক্তফ্রন্টকে উপহাস করার জন্য কোন কোন মুসলিম লীগ সমর্থক শামুক, ঝিনুক, হাড়, পাতিল ভাঙা, কলসীর কানা, কাঠের টুকরা, খড়ম প্রভৃতি এক সাথে করে মালা তৈরী করে গলায় পরে হাট বাজারে যেত এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলত, " আমি যুক্তফ্রন্ট।"[৪৮]

এবার আসে বাংলাদেশের কথা। পাকিস্তানী শাসনামলে সারা পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায় এখানকার লোকজনও ভুক্তভোগী ছিল। শাসক গোষ্ঠীর আনুকূল্যে তখন এক শ্রেণীর লোক রাতারাতি বেশ অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে উঠে। আর ঐ শ্রেণী বা তাদের দোসরদের হাতেই ইউনিয়নের নেতৃত্ব সীমিত হয়ে গিয়েছিল। মৌলিক গনতন্ত্রের আমলে এখানকার জনগন তাদের স্বাধীন মতামত তেমন ব্যক্ত করতে পারেনি। মোট ৮ জন করে দু'টি ইউনিয়নে ১৬ জন মেম্বার এবং তাদের মধ্য থেকে তাদের নিজেদের ভোটে ২ জন চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়েছিল। প্রাপ্য ভোট দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে জনগন তাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট প্রদানে ব্যর্থ হয়। ১৯৬৫ সনের নির্বাচনেই জনগনকে বেশ একটা সচেতন দেখা যায়। এসময় তারা সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন জানায়। সে সময় এখানে কোন কলেজ না থাকলেও স্কুলের ছাত্ররা বেশ সচেতনতার সাথে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় সকল কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিল। এমনকি ভোট অনুষ্ঠানের আগে ছাত্র-জনতা ফাতেমা জিন্নাহর প্রতি সমর্থন দানের জন্য মৌলিক গনতন্ত্রীদের উপর প্রবল চাপও দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের কিছুদিন আগেই নাকি সুচতুর আইয়ুব প্রত্যেক মৌলিক গনতন্ত্রীকে এক শত টাকার একটা করে নোট বখশিশ দিয়েছিল। তথাপি ইউনিয়নদ্বয়ের বেশ কিছু সদস্যই মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ভোট দিয়ে আইয়ুবী শাসনের প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। একজন মৌলিক গনতন্ত্রী জানিয়েছেন যে, তার নিকট আইয়ুবের দেওয়া বখশিশের একশত টাকার নোট খানা অনেকদিন যাবত সংরক্ষিত ছিল। তিনি জানান, তার মতো [illegible] আরও অনেকেই

Dhaka University Institutional Repository

এমনটি করেছে। অবশ্য একথা তখনই জানাজানি হয়েছিল যে, আইয়ুবের দেওয়া বখশিশ আসলে একটা জাল নোট এবং এটা ভাঙানোর একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। নির্বাচনের আগে যারা ভাঙিয়েছে তারাই লাভবান হয়েছে।

মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পরই এখানকার গণ-মনে আইয়ুব বিরোধী অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এর আগে কোন কোন কাজের জন্য আইয়ুবের প্রতি তাদের দুর্বলতাও ছিল। আইয়ুব ক্ষমতায় এসেই এমন কিছু কাজ করেছিলেন যা এখানকার জনগনের কাছে বেশ প্রশংসনীয় ছিল। এমন কিছু লোককে সে সময় ইউনিয়নের কর্তৃত্ব থেকে সরানো হয়েছে, যারা পুরুষানুক্রমে কর্তৃত্ব করে আসছিল এবং মানুষের কল্যানের বদলে নিজেদের স্বার্থই হাসিল করছিল। এদের কোন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস বা সামর্থ্য জনগনের ছিল না। তাছাড়া, দীর্ঘ এক যুগ ধরে সে সব উচ্চবিত্তের হাতে ইউনিয়নের নেতৃত্ব সীমিত থাকায় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত থেকে নেতৃত্ব গ্রহনের কোন পথ ছিল না। সামরিক শাসনের শুরুতেই আইয়ুব খান এদের কক্ষা করে জনগনের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। আর নেতৃত্ব থেকে এদের অপসারনের সুযোগে তরুনরা নেতৃত্বে আসতে যেমন উৎসাহী হয়, তেমনি নিম্নবিত্তেরও কিছু কিছু নেতৃত্ব কায়েম হতে শুরু হয়।

১৯৬৬ সনের দিকে ছয়দফা ভিত্তিক রাজনীতি শুরু হলে ইহার প্রতি এখানকার জনগন অকুন্ঠ সমর্থন জানায় এবং আইয়ুবের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠে। এখানকার হাট-বাজার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের হরতালসহ সব কর্মসূচীই যথারীতি পালিত হয়। ১৯৬৯ সনের গণ-অভ্যুত্থান কালে এখানকার জনগনও দেশের অন্যান্য অংশের জনগনের মত বিক্ষোভে অংশ নেয় এবং হাট-বাজার ও রাস্তা-ঘাটে মিছিল সমাবেশের আয়োজন করে। এখান থেকে সড়ক পথে চাঁদপুর শহর ৪৮ কিলোমিটার এবং কুমিল্লা শহর ৪৯ কিলোমিটার দূরে হলেও সড়ক যোগাযোগ সুবিধাজনক হওয়ায় শহর দু'টির সাথে এঅঞ্চলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। আর এই সুবাদে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের যে কোন কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজ ছিল এবং তা পালিত হত যথাযথভাবে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দেখা গেছে, মুসলিম লীগের গড় ঘাঁটি বলে পরিচিত এই ইউনিয়নসমূহের ছয়টি কেন্দ্রে সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে মুসলিম লীগের ভাগে ৬০/৭০ টি ভোটের বেশী

Dhaka University Institutional Repository

পড়েনি। এব্যাপারে একজন বৃদ্ধলোকের মন্তব্য হলো-"মুসলমান হিসাবে আমরা সবাই মুসলিম লীগ। তবে ভোট কাকে দিব, এটা আমাদের ব্যাপার।"

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। যুবকরা মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য দলে দলে ভারতে চলে যায়। থানা মুক্তিযো-দ্ধা কমান্ডার এই এলাকার অর্থাৎ উত্তর পৌরাটী ইউনিয়নের অধিবাসী ছিলেন। প্রত্যেক গ্রাম-র যুবকরাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তবে রহিমানগর বাজারের আশে পাশের কোন কোন গ্রামের কিছু কিছু লোক রাজাকার বাহিনীতেও যোগ দিয়েছিল। এসময়ে জনগন বেশ কষ্ট সহ্য করেছে।কেননা, একদিকে হানাদার বাহিনীর নিপীড়ন এবং অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগি-তা করা - এই উভয়বিধ সংকটের মধ্য দিয়ে তাদের দীর্ঘ নয় মাস অতিবাহিত করতে হয়েছে। ভারত থেকে এপথে আসা মুক্তিযোদ্ধারা অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের কোন কোন গ্রামে আশ্রয় নিত। বেশ ঝুঁকি নিয়েই সে সব গ্রামের লোকজন মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য দিয়ে সাহায্য করত। স্কুলগামী ছেলেরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রাতের বেলা বাড়ি বাড়ি ঘুরে নগদ টাকা, চাউল প্রভৃতি আদায় করত। অপরদিকে, হিন্দুদের সহায়-সম্পত্তি যাতে লুটপাট না হয় সেজন্য প্রত্যেক গ্রামের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বাড়ি-ঘর পাহারা দিয়ে রাখে। রহিমানগর বাজারের আশে পাশের কিছু কিছু হিন্দু পরিবার তাদের আশ্রয় নেয়। দেশে অব-স্থানকারী হিন্দুরা এসময় মুখে দাঁড়ি রেখে টুপি মাথায় দিয়ে হাট-বাজারে যাওয়া আসা করত। তারা মুসলমানদের কলেমাও শিখে নিয়েছিল এবং খান সেনাদের হাতে ধরা পড়লে কলেমা বলতে পেরে রেহাই পেত। রাজাকারদের সহযোগিতায় হানাদার বাহিনীর হামলায় আশ-ংকা দেখা দিলে তারা মুসলমানদের বাড়িতে আশ্রয় নিত। স্থানীয়ভাবে লুটপাট না হলেও রাজা-কারদের সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি গ্রামে হানাদার বাহিনী লুটপাট চালায় এবং কোন কোন স্থানে অগ্নি সংযোগও করে। এসব হামলা ও অগ্নি সংযোগের সময় অনেককে গুলী করে হত্যা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাতের বেলা সাধারন মানুষও রেডিও-এর কাছে বসে থাকত এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত খবরা-খবর শুনত। তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরম পত্র' অনুষ্ঠানটি। মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের খবর শুনলেই তারা উল্লাস প্রকাশ করত। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পৌরাটী ইউনিয়নের কয়েকজন

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ সমর্থককে হানাদার বাহিনীর শান্তি কমিটির সদস্য করা সত্ত্বেও এই এলাকার শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার মত কোন কাজ তারা করেনি, বা মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কিত কোন তথ্যও হানাদার বাহিনীকে সরবরাহ করেনি। ফলে তাদের দ্বারা এলাকার কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয়নি। কেবলমাত্র রাজাকারদের দ্বারাই এলাকার যেটুকু ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া, মুসলিম লীগের সংগে সংশ্লিষ্ট অনেকেরই ছেলে বা আত্মীয়-স্বজনদের কেহ কেহ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলার পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পন করলে এবং এখবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে জনগন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে। অনেকে মিষ্টি বিতরনের মধ্য দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে এবং কেউ কেউ মসজিদে গিয়ে শোকরানা নামাজ আদায় করে।

জাতীয় দৃশ্যপটে গৌহাটী ইউনিয়ন

বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এখানে কোন প্রদেশ নেই। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা - এই ৪ টি বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত। প্রতিটি বিভাগকে কয়েকটি জেলায়, জেলাকে মহকুমায়,[৪৯] মহকুমাকে থানায়[৫০] এবং থানাকে কয়েকটি ইউনিয়নে ভাগ করা হয়েছে। গৌহাটী ইউনিয়ন কুমিল্লা জেলায় (বর্তমানে চাঁদপুর) অবস্থিত। আর কুমিল্লা জেলা চট্টগ্রাম বিভাগের অংশ। কুমিল্লা সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া - এই ৪টি মহকুমা নিয়ে কুমিল্লা জেলা গঠিত।[৫১] গৌহাটী ইউনিয়ন চাঁদপুর মহকুমার কচুয়া থানার অন্তর্গত। চাঁদপুর মহকুমা ৭টি থানার সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো- কচুয়া, মতলব, হাজিগঞ্জ, শাহরাস্তি, চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর। কচুয়া থানার আওতায় রয়েছে ১২ টি ইউনিয়ন। এগুলো হলো - সাচার, পথের, বিতাড়া, মহদেবপুর পূর্ব, মহ-দেবপুর পশ্চিম, কচুয়া উত্তর, কচুয়া দক্ষিণ, কাদলা, কচুইয়া, গৌহাটী উত্তর, গৌহাটী দক্ষিণ ও আশরাফপুর। কচুয়া থানার আয়তন ২০৬.৭০ বর্গ কিলোমিটার এবং গ্রামের সংখ্যা ২৪১।[৫২] গৌহাটী উত্তর ও গৌহাটী দক্ষিণ ইউনিয়ন দু'টি থানার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। উল্লেখিত ইউনিয়ন দু'টিকে প্রশাসনিক স্তর ভিত্তিক ২.১ নং পারনীতে দেখানো হলো ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সারনী নং - ২.১ ঃ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে গৌহাটী ইউনিয়ন[৫৩]

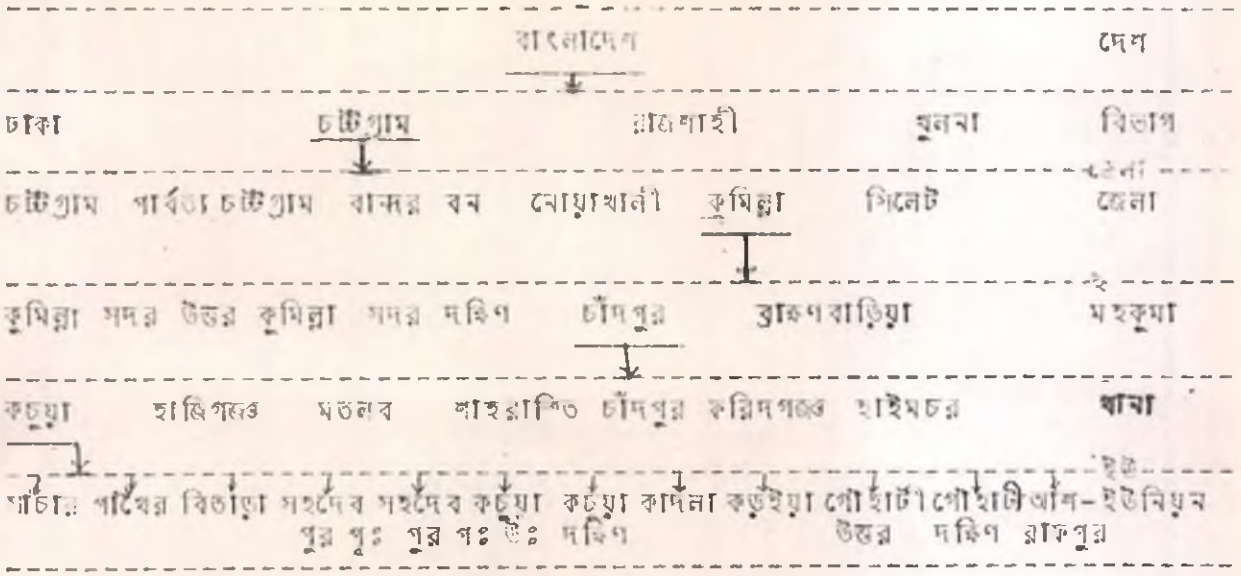

উল্লেখিত সারনীতে প্রদর্শিত প্রশাসনিক ইউনিট বেশ পুরাতন। প্রশাসনিক ও রাজ-নৈতিক স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে যে সব ইউনিট সৃষ্টি করেছিল এই ইউনিট তারই পরিবর্তিত রূপ। বিশেষ করে থানা ও ইউনিয়নের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যাতায়াতের সুবিধা ও জন স্বার্থ বিবেচনা করে ১৯৩৭ সালের পর থেকে থানা ও ইউনিয়নের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ানো হয়। গৌহাটী ইউনিয়ন ১৯৫৯ সনে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এর আগে গৌহাটী নামে একটি মাত্র ইউনিয়নই ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের শীর্ষ বিন্দু হিসেবে বিভাগের সৃষ্টি করা হয়েছে ব্রিটিশশাসনে। অপরদিকে, জেলা প্রশাসন সৃষ্টি করা হয়েছে মোগল আমলে। পুলিশ প্রশাসনের সর্বনিম্ন ইউনিট হিসেবে ১৭৯৩ সনে থানার সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু মহকুমা প্রশাসনের সৃষ্টি হয় থানা এবং ইউনিয়ন কায়েমের পরে। অর্থাৎ ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৭০ সালে, কিন্তু মহকুমার সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৭৫ সালে।

কচুয়া থানার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে থানা সীমারেখার একেবারে শেষ প্রান্তের সন্নিকটে গৌহাটী ইউনিয়ন দু'টি অবস্থান করছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ইউনিয়ন দু'টি মোগল আমলের বিভক্তিকৃত পরগনা অনুযায়ী দু'টি পরগনার অধীন ছিল। গৌহাটী উত্তর ইউনিয়ন ছিল দোল্লাই মবারকপুর পরগনার অধীনে এবং গৌহাটী দক্ষিণ ইউনিয়ন ছিল মেহার পরগনার

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে। সোনাই নবাবপুর পরগণার অধীন উত্তর গৌহাটী ছিল ঢাকার নবাবদের নিয়ন্ত্রণে।[৫৫] এখানকার পুরানো দলিল-পত্রে ঢাকার নবাব হাবিবউল্লাহর নামও পাওয়া যায়। খাজনা আদায়ের অফিস স্থাপন করে নবাবরা এই সোনাই পরগণা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতেন। কচুয়া থানায় নবাবদের খাজনা আদায়ের দু'টি অফিস ছিল। এদের একটি ছিল কচুয়াতে এবং অপরটি ছিল সাহিদাপুর নামক গ্রামে। জানা যায়, সাহিদাপুর নামক গ্রামে অফিসের জন্য উপযুক্ত স্থান না পাওয়ায় নবাবদের খাজনা আদায়ের কাছারী তথা অফিসটি পালগিরি নামক গ্রামে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু উহার নামের কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। অপরদিকে, দক্ষিণ গৌহাটীর নিয়ন্ত্রণ ছিল লাকশাম পশ্চিম গাঁয়ের নবাবদের হাতে। উক্ত নবাবরা খাজনা আদায়ের জন্য একই ইউনিয়নের গোহাটী গ্রামের একটি পরিবারকে এই ইউনিয়ন এলাকাটি লীজ দেন। এটা ছিল শুধুমাত্র খাজনা আদায়ের লীজ। এলাকায় তারা 'মিয়া' নামে পরিচিত। অপরদিকে, উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নেও মিয়া পরিবার আছে এবং তারাও লীজের মাধ্যমে প্রাপ্ত এলাকার উপর আধিপত্য কায়েম করেছিল। জানা যায়, কুমিল্লার সরাইলের জমিদারদের কাছ থেকে তারা কিছু এলাকা লীজ নিয়েছিল। উভয় ইউনিয়নের এই সব জমিদার সম্পর্কে পরে আরও কিছুটা আলোকপাত করা হবে।

গৌহাটী ইউনিয়নের সীমানা

গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ের সীমানা উল্লেখের আগে কচুয়া থানার সীমানা উল্লেখ করা দরকার মনে করি। কেননা, এ ইউনিয়নদ্বয় কচুয়া থানারই অংশ। কচুয়া থানা চাঁদপুর মহকুমার উত্তর-পূর্ব কোনে শেষ সীমানায় অবস্থিত। ইহার উত্তরে দাউদকান্দি, উত্তর-পূর্বদিকে চান্দিনা, পূর্বে বরুড়া, দক্ষিণে শাহরাস্তি, দক্ষিণ-পূর্বে লাকশাম, দক্ষিণ-পশ্চিমে হাজীগঞ্জ এবং পশ্চিমে মতলব থানা অবস্থিত। কচুয়া থানার আয়তন ২৩৬.৭০ বর্গ কিলোমিটার। এ থানার মোট ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয় থানা থেকে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ের উত্তরে দক্ষিণ কচুয়া ইউনিয়ন এবং চান্দিনা থানা, পূর্বে বরুড়া থানা, দক্ষিণে কচুয়া থানার আশরাফপুর ইউনিয়ন ও শাহরাস্তি থানা, দক্ষিণ-পশ্চিমে হাজীগঞ্জ থানা এবং পশ্চিমে কচুয়া থানার কড়ইয়া ইউনিয়ন অবস্থিত। ইউনিয়নদ্বয়ের আয়তন ১৮.৬২ বর্গ কিলোমিটার। ইউনিয়নদ্বয় হতে চাঁদপুর মহকুমা ৪৮ কিলোমিটার

Dhaka University Institutional Repository

এবং কুমিল্লা জেলা ৪১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সড়ক পথে সরাসরি মহকুমা ও জেলার সাথে যোগাযোগ রয়েছে। চাঁদপুর থেকে পূর্বদিকে এবং কুমিল্লা থেকে পশ্চিম দিকে মোটামুটি এক মনোরম পরিবেশে এই ইউনিয়নদ্বয় অবস্থান করছে। এখানে কোন নদী নেই এবং নদীর সাথে সংযুক্ত গভীর কোন খালও নেই। তবে কচুয়া থানার উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চল নীচু এলাকা। ওসব এলাকায় নদীর সাথে সংযুক্ত গভীর খালও রয়েছে। কিন্তু এই ইউনিয়নদ্বয় অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকা। তবে ভূমি বেশ উর্বর। দেশের অপরাপর সমতল ভূমির ন্যায় এখানেও রয়েছে সবুজ শ্যামল নিকেতন।

জনগনের সামাজিক ও ধর্মীয় বিন্যাস এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, গৌহাটী ইউনিয়ন দু'টি ভাগে বিভক্ত।[৫৫] ইহার আয়তন মোট ২৮·৬২ বর্গ কিলোমিটার।[৫৬] ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ইহার মোট জনসংখ্যা ৩৫০৬১। তন্মধ্যে পুরুষ (শিশুসহ) ১৭৫২৩ এবং মহিলা (শিশুসহ) ১৭৫৪৬।[৫৭] এই জনসংখ্যা কচুয়া থানার মোট জনসংখ্যার এক সপ্তমাংশেরও বেশী। কচুয়া থানার মোট জনসংখ্যা ২,৪৯,৬২৪। তন্মধ্যে পুরুষ (শিশুসহ) ১২৭২৭০ এবং মহিলা (শিশুসহ) ১২২৩৫৪।[৫৮] অত্র গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ই কচুয়া থানার মধ্যে সর্বাধিক জনবহুল। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতি ১২৬০ জনেরও বেশী। অথচ থানার ২৩৬·৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতি গ্রায় ১০৫২ জন। এই ইউনিয়নদ্বয়ে জন্ম হার প্রতি হাজারে ৩৫ জন।[৫৯] এই হার জাতীয় হারের কাছাকাছি। জাতীয় জন্মহার প্রতি হাজারে ৩৪·৬ জন (১৯৮১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী)।[৬০] আর এখানকার মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১২ জন।[৬১] একইভাবে ইহাও জাতীয় মৃত্যুহারের কাছাকাছি। ১৯৮১ সনের আদমশুমারী মোতাবেক জাতীয় মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১১·০ জন।[৬২] গৌহাটী ইউনিয়ন মোট ৩৪ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৫।[৬৩] ইহা পুরুষ শিক্ষিতের হার। মেয়ে শিক্ষিতের হার শতকরা ১৫।[৬৪] জাতীয় হারের তুলনায় এখানে শিক্ষিতের হার একটু বেশই প্রতীয়মান হয়। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষিতের হার ২৩·৮%।[৬৫] একই সময়ে চাঁদপুরের শিক্ষিতের হার ছিল ২৯·১%।[৬৬] ইউনিয়ন দু'টি চাঁদপুরের আওতাধীন বিধায় চাঁদপুর মহকুমার বিষয়টি উল্লেখ করা হল। সাধারনতঃ কোন অঞ্চলের শিক্ষার হার নির্ভর করে সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার উপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যত বেশী হবে এবং সাধারন মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে শিক্ষিতের হারও তত বেশী হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শহরে সাধারণতঃ শিক্ষিতের হার বেশী। কারন, একদিকে গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা যেমন শহরে পাড়ি জমায়, অপরদিকে, তেমনি শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে অগনিত। এরফলে ছিন্নমূল বস্তি-বাসী ছেলে-মেয়েরাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ছুটে যায়। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দূরে অবস্থান করায় অনেক অবস্থাপন্ন লোকও তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী হয় না। বিশেষ করে নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত বিধায় মেয়েদের দূরবর্তী প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে শিক্ষা দিতে মা-বাবারা রাজী হয় না। গ্রামের মহিলা শিক্ষার হার কম হওয়ার ইহাই একমাত্র এবং প্রধান কারন। আজকাল প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার যে দাবী তোলা হচ্ছে, তা গ্রামীন মানুষের খুব বেশী একটা কাজে আসবে না। কারন, আইন করে মানুষের উপর বোঝা চাপানো গেলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব পূরন করা যাবেনা। প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দরকার তেমন একটা হবে না। শিক্ষা গ্রহন করতে মানুষ তখন আপনা আপনিই বাধ্য হবে। এই গবেষনার ইউনিয়ন দু'টিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোটামুটি পর্যাপ্ত সংখ্যকই আছে। ফলে আজ মেয়েদেরও শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এত কম এবং এত দূর-দূরান্তে ছিল যে, মেয়েদের পক্ষে এত দূর গিয়ে শিক্ষা লাভ করা বেশ কঠিন ছিল। দেখা গেছে, এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মেয়ে শিক্ষার হারও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, কচুয়া থানার পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও গোটা উত্তরাঞ্চল নীচু এলাকা। বর্ষার দিনে তাই নৌকা ছাড়া চলার উপায় থাকে না। উঁচু এলাকার লোক জনের কাছে এসব এলাকার লোক জন 'জেরুয়া' (নীচু এলাকার অধিবাসী) নামে পরিচিত। থানার অন্যান্য এলাকার তুলনায় এই ইউনিয়নদ্বয়ই মোটামুটি উঁচু এলাকা। আর তাই এখানকার জনবসতিও বেশ প্রাচীন বলে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক সমাগমের ফলে এই জনপদ গড়ে উঠলেও দীর্ঘ কাল এক সাথে বাস করে সকলে একই সামাজিক রীতি-নীতি ও একই সংস্কৃতির জীবন চালনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। জনবসতির মত এখানকার সংস্কৃতিও প্রাচীন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ব বংগের লোকেরা আর্য সমাজের কাছে যবন ও ম্লেচ্ছ হিসেবে পরিচিত ছিল। কেননা, আরব সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আরব সভ্যতার মূলে রয়েছে তাওহীদী (আল্লাহর একত্ব) প্রেরনা। আর হিন্দু সভ্যতার মূলে রয়েছে অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা। হিন্দুদের কাছে অধিক পূজনীয় হলো গরু। মুচ

Dhaka University Institutional Repository

অথচ আরব সভ্যতা ইসলামের আগমনের পূর্বেও মূর্তি পূজার বিরোধী ধ্যান-ধারনা ভিত্তিক ধর্মীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এজন্যই পূর্ব বংগে বসতি স্থাপনকারী আরবরা আর্যদের নিকট ম্লেচ্ছ ও যবন হিসাবে পরিচিত ছিল।

আরব সভ্যতা সমুদ্র পথে এদেশে প্রসারী হয়েছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী এখানে অবস্থান করার ফলে পূর্ব বংগ তাদের নিজের দেশের ন্যায় হয়ে উঠেছিল। একথা অনুমান করে বলা যায় যে, ইসলামের আগমনের পূর্বেও এখানকার আরবরা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ছিল এবং এজন্যই হিন্দু সংস্কৃতির সাথে তাদের বেমিল ছিল। তাছাড়া, আল্লাহর একত্বের সাথে তারা পরিচিত ছিল বলে ইসলামের আগমনের সাথে সাথে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহন করেছিল- ইসলামকে মোবারকবাদ জানিয়েছিল। অধিকন্তু, ইসলামের দ্রুত প্রসার এখানে এজন্য -ই সম্ভব হয়েছিল। হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথাও ইসলামের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেছিল। বর্ণ প্রথার-কারনে উচ্চ বর্ণের কাছে নিগৃহীত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। পৌরাটী ইউনিয়নদ্বয়ও এমনি প্রাচীন ইসলামপন্থী সংস্কৃতির অধিকারী। এখানকার সামাজিক আচার আচরনে এটাই প্রতীয়মান হয়।

জনশ্রুতির ভিত্তিতে এখানকার প্রাচীন ইতিহাস কিছুটা ইতিমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে এবং তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ইউনিয়নদ্বয়ে প্রাচীন কালের খননকৃত, বেশ কয়েক-টি দীঘি রয়েছে। এদের মধ্যে সাহার পাড় গ্রামের দীঘিটি বিশালাকৃতির। এই দীঘিসহ পূর্বোল্লেখিত অন্যান্য দীঘি নিয়ে নানা রকম আতংকজনক কাহিনী জনগনের মাঝে আজও বিরাজ করছে। সাধারন মানুষের ধারনা, আগে এদেশে দানবের বসতি ছিল। তারা এমন সব আজব দীঘি খনন করে দীঘির মাঝেই নিজেরা অবস্থান করছে। আর তাতেই মানুষের নানাবিধ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। কারও কারও ধারনা, আগেকার দিনের মানুষ বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল এবং তাদের গায়ে বেশ জোর ছিল বলে তারা এমন সব দীঘি খনন করতে সক্ষম হয়েছে।

জমিদারী তথা ব্রিটিশ যুগের পৌরাটী ইউনিয়ন সম্পর্কেও আগে কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে। প্রথম দিকে ইউনিয়নদ্বয় হিন্দু জমিদারের অধীনে থাকলেও পরবর্তী কোন এক সময়ে এগুলো যথারীতি ঢাকার নবাবদের অধীনে চলে যায়, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার নবাবদের এতদাঞ্চলের খাজনা আদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল নবাবপুর (চান্দিনা থানায়)। নবাবপুরের পর নবাবদের খাজনা আদায়ের দ্বিতীয় অফিস ছিল পালগিরি গ্রামে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এতদাঞ্চলের জনগন জমিদারদের অনেকটা ধরা-ছোঁয়ামুক্ত ছিল। তবে জমিদারদের নাম করে জনগনের উপর যে নির্যাতন চালানো হত, তা কম ভয়াবহ ছিল না। একথা অবশ্য কেবল উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা, দক্ষিণ গৌহাটী ইউনিয়নে লাকসামের নবাবদের মনোনীত পরিবারসমূহ সরাসরি খাজনা আদায় করত। ফলে দুই ইউনিয়নের জনগন দুই ভিন্ন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল।

গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ে 'মিয়া' খেতাবধারী দু'টি পরিবারের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। উত্তর গৌহাটীর হাশিমপুর গ্রামে 'মিয়া' বংশ থাকলেও এই ইউনিয়নের কোন গ্রাম-ই তাদের নিয়ন্ত্রনে ছিল না। নবাব খেতাবে ভূষিত দোল্লাই নবাবপুরের নবাবরাই ঢাকার নবাব-দের নামে খাজনা আদায় করত। অপরদিকে, হাশিমপুর গ্রামের মিয়াগন সরাইলের জমিদারদে-র কাছ থেকে জমিদারীর কিছু অংশ লীজ নেয়। জানা যায়, এই পরিবার বরুড়া থানার বড়ার চর নামক এলাকা লীজ নিয়েছিল। এছাড়া, কচুয়া থানার নয়ুয়া নামক গ্রামেরও লীজ তারা নিয়েছিল। ফলে স্থানীয় জনগনের উপর তাদের আইনগত কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ ইউনিয়নের মিয়াগনের সেরূপ কর্তৃত্ব ছিল। জানা যায়, ঢাকার নবাবদের কোনরূপ অনুমতি না নিয়েই উত্তর গৌহাটীর মিয়ারা 'কোরপা সূত্রে'[৬৭] কিছু কিছু রায়ত বসিয়েছিল। আর এই সুবাদে তারা স্থানীয় জনগনের উপর অবৈধ কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস পায় এবং জুলুম নির্যাতন চালিয়ে অবৈধভাবে জনগনের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে থাকে। কোরপা নবাবদের জন্য কোনরূপ হুমকির কারন ছিলনা বলে নবাবরা এর বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা নেয়নি। এর ফলে স্থানীয় জনগনের উপর তাদের কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ের দুই মিয়া পরিবারই ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের। ফলে শোষিত হলেও এখানকার জনগন এই আমলে অন্যান্য দিক দিয়ে বেশ একটা নিরাপদ ছিল। অবশ্য ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকায় এখানকার জনগন স্থানীয় উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রভাবমুক্ত ছিল না। ইংরেজ-হিন্দু সম্প্রীতির কারনে এখানকার উল্লেখিত নিম-জমিদার তথা মিয়াগনের উপরও উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা প্রভাব খাটাতে পারত। এসব বর্ণ হিন্দুর জন্মস্থান এখানে হলেও

Dhaka University Institutional Repository

কলিকাতাই ছিল তাদের তীর্থ ভূমি। তাদের আয়-উন্নতির সমূদয় অর্থ তারা কলিকাতায় পাচার করত। এছাড়াও আরও অনেক প্রভাবশালী হিন্দু ছিল। তারা ছিল মহাজন। চড়া সুদে ঋণ দানের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের শোষণ করত। গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ের জনগন এই মহাজন শ্রেণীর দ্বারাই সর্বাধিক শোষিত হয়েছে বলে জানা যায়।

দুই মিয়া বংশ ছাড়াও এখানে প্রাচীন বংশধারী কিছু পরিবার আছে, যারা দীর্ঘ দিনের শোষনে এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। এখন তাদের শ্রেণীর তাগই কেবল বংশ কোনভাবে টিকে আছে। এরা হলো - কাজী, ভূঞা, মীর, প্রধানিয়া, মিয়াজী, পাটোয়ারী, মুন্সী, সরাই, শাহজী, মজুমদার প্রভৃতি। জমিদারীর প্রভাব খাটিয়ে হিন্দু-জমিদাররা স্থানীয় জনগনের উপর নির্যাতন ও শোষন চালালেও জনগন আইনগত কোন সাহায্য পেত না। অপরদিকে, স্থানীয় হিন্দু-জমিদাররা মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়েও স্বজাতিকে শোষন করতে তারা দ্বিধা করেনি। ব্রিটি-শের আশীর্বাদপুষ্ট হিন্দুদের সম্পত্তির প্রতি নজর দেওয়ার সাহস তারা পায়নি। তাই কেবল গরীব মুসলমানদেরই তারা শোষন করেছে। মানুষের মনে যখন স্বার্থের রাজত্ব কায়েম হয়, তখন দেশ, জাতি, ধর্ম এবং এমনকি আত্মীয়-স্বজনের পরিচয়টিও মনে রাখার অবকাশ সে পায় না। সমষ্টির স্বার্থ চিন্তা মন থেকে তিরোহিত হয়ে যখন ব্যক্তি স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়, মানুষ তখন মানবতার আসন থেকে দূরে সরে পড়ে। স্বার্থের তাড়না মানুষকে অসৎ, মিথ্যাবাদী, হীন, ছল-চাতুরী প্রবন করে তোলে। এরূপ ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম অতি তুচ্ছ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েমের পর পরই পাকিস্তানে হিজরতকারী মুসলমানদের কেউই গৌহাটী ইউনিয়নে বসতি স্থাপন করেনি। কিন্তু ১৯৬৫ সনে ভারত-পাকি-স্তান যুদ্ধোত্তর কালে সাম্প্রদায়িক দাংগার শিকার হয়ে ভারতের ত্রিপুরা, আগরতলা, আসা-ম, মেঘালয় প্রভৃতি স্থান থেকে প্রায় একশত মুসলিম পরিবার এখানে এসে সরকারী খাস জমি-তে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিত্তবান হিন্দুদের জায়গায় বসতি গড়ে তোলে। সরকার কর্তৃক এরা কোনভাবেই বাধা প্রাপ্ত হয়নি। তাছাড়া, সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমেও প্রায় গোটা বিশেক মুসলিম পরিবার এখানকার বাসিন্দা হয়। আগত এসব মুসলমান এখানে সাধারনভাবে 'রিফুজি' নামে পরিচিত ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা ভাষাগত জটিলতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধায় পড়েছিল। কেননা, ভারতীয় বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশী

Dhaka University Institutional Repository

থাকায় এখানকার বাংলা ভাষার সাথে ভারত থেকে আগতদের ভাষার বেশ বেমিল ছিল। বিশেষতঃ অনুন্নত ভেদে ভাষার মাঝে যে পার্থক্য লক্ষণীয় তা-ই তাদের অসুবিধায় ফেলেছিল। অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের আঞ্চলিক ভাষা ও নোয়াখালী জেলার উত্তরাঞ্চলের ভাষার মধ্যে বেশী একটা তফাৎ নেই। কচুয়া থানার গোটা পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, হাজিগঞ্জ, মতলবের কিছু অংশ, শাহরাস্তি, চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, নাঙ্গলকোট, বরুড়া, কুমিল্লার দক্ষিণাঞ্চল প্রভৃতি এলাকা এবং নোয়াখালী জেলার উত্তরাঞ্চলের ভাষা একই রকম। ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য হেতু ভারত থেকে আগত মুসলমানেরা প্রথম দিকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করলেও মুসলমান হিসেবে এখানকার সংস্কৃতি অনেকটা তাদের নিজেদের সংস্কৃতিই ছিল। আর এজন্য অল্প সময়ের মধ্যেই তারা স্থানীয় জনগনের সাথে মিশে যেতে সক্ষম হয়। এমনকি অল্প দিনের মধ্যে স্থানীয় জনগনের সাথে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনেও সক্ষম হয়। অন্যদিকে, স্থানীয় সকল প্রতিষ্ঠানেও তারা সমানভাবে অধিকার প্রাপ্ত হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের পাশাপাশি এখানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ও রয়েছে। এছাড়া অপর কোন জাতির লোকের বাস এখানে নেই। হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্প্রীতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। উভয় সম্প্রদায়েরই বেশীর ভাগ লোক কৃষিজীবী বা দীনমজুর। বেশীর ভাগই গরীব বা নিজের সামর্থে কোন রকমে চলতে পারে। তাই তারা অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে জানেনা। যারা তা করে তারা অতীতে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। তাদের স্থান ধর্ম ও জাতির উর্দ্ধে এবং তারা স্বার্থান্বেষী।

মুসলমানরা অত্র ইউনিয়নদ্বয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদ দীর্ঘ দিনের। ব্রিটিশ আমলে এসব মতভেদকে কেন্দ্র করে মামলা মোকাদ্দমা হয়েছিল বলে জানা যায়। মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী,[৬৮] ওহাবী,[৬৯] শিয়া,[৭০] খারিজী,[৭১] বাহাইপন্থী[৭২] প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভাগ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিয়া ও সুন্নী – এই দু' ভাগেই মুসলমানরা বিভক্ত। অত্র ইউনিয়নদ্বয়ে কেবলমাত্র সুন্নী এবং ওহাবী মুসলমান রয়েছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার মতভেদই মূলতঃ এখানে ধর্মীয় সংঘাতের মূল কারণ। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হযরত মুহম্মদ (সঃ), কোরান এবং হাদীস সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। এসব ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস অবিচল হলেও ওহাবী ও

Dhaka University Institutional Repository

সুন্নী - উভয় সম্প্রদায়ই একে অপরকে অবিশ্বাস করে। হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে ১৮২০ সনে যখন এদেশে ফারায়েজী আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল, তখন তা সত্যিকার অর্থেই সংস্কার আন্দোলন ছিল। কারন, তখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ইসলামী লেবাছ পরে পীর[৭৩] ফকিরের বেশ নিয়ে মাজার পূজা করে মুসলমানদের শিরকের পথে টেনে নিচ্ছিল। ইসলামের বিধান মতে মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সিজদা করতে পারেনা বা কারও কাছে তেমন তংশিমায় মাথাও নত করতে পারেনা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মাজার সিজদা করার পাশাপাশি পীরকে সিজদা করা মুসলমানদের কিছু অংশের মধ্যে প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানদের এহেন অবস্থা থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই হাজী শরিয়তুল্লাহ এদেশে ফারায়েজী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু ওহাবী আন্দোলন ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। " আরব দেশের অন্তর্গত নেজদের অধিবাসী মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (১৭০৩ - ৯২) এক সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতি দূর করিয়া পবিত্র কোরান ও হাদীসের নির্দেশিত সরল আদর্শে মুসলিম সমাজকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাহার সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। তাহার মৃত্যুর পর নেজদের শেখ মুহম্মদ ইবনে সউদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহন করেন ও আরবের বিভিন্ন স্থানে ইহা প্রসারের ব্যবস্থা করেন। মক্কা ও মদীনায় প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং হজ্জের সময় মুসলমানদের নিকট সংস্কারের বানী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।[৭৪]

বাংলাদেশে ফারায়েজী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলা মুসলমানদের রাজনীতি সচেতন করে তোলা, তাদের জেহাদী সুপ্ত শক্তিকে সঞ্জীবিত করা এবং এর ফলে গড়ে উঠা ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। কিন্তু এ আন্দোলনের সূচনা থেকেই ব্রিটিশ সরকার বেশ সচেতন হয়ে উঠে এবং এই আন্দোলন ও ইসলাম বিরোধী নানা প্রচারনা চালাতে শুরু করে। রাজশক্তির পাশাপাশি ইংরেজ মুলুকের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে ইসলাম বিরোধী প্রচারনার কাজে ব্যবহার করা শুরু হয়। এসব শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইসলামকে একটা পুর্নাংগ ধর্মের বদলে সামান্য একটা মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রান প্রয়াস চালায়। সহযোগী শক্তি হিসেবে তারা হিন্দু সমাজকেও কাজে লাগায়। অপরদিকে, তারা ইসলামে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য এক গোষ্ঠী দালাল সৃষ্টি করে, যারা ইসলামকে বিকৃত করে মুসলমানদের সামনে তুলে ধরার কাজে নিয়োজিত হয়। এদের মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মে অনৈসলামিক কাজের অনুপ্রবেশ ঘটনো হয়। ফারায়েজী

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন এমনি অবস্থার হাত থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করার এবং দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যই পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু ইংরেজরা বেশ চাতুর্যের সাথেই এই আন্দোলনকে ওহা-বী আন্দোলন বলে প্রচার চালায়। এরূপ চাতুর্যের কারন ছিল, এই আন্দোলনের প্রতি মুসল-মানদের ঘৃণার উদ্রেক করা। কেননা, আরবের ওহাবী আন্দোলনের প্রতি এদেশের মুসলমানদে-র কোন আস্থা ছিল না। তারা জানত যে, ইসলামকে বিকৃত করার জন্য খৃষ্টান ও ইহুদী-দের সহযোগিতায় ওহাবী আন্দোলন নামে ইসলামের মধ্যে এক ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে। তাছাড়া, এদেশের মুসলমানরা হজ্জ করতে গিয়ে জানতে পারত যে, ইসলামী ঐতিহ্যের বিরোধী হিসাবে ওহাবী ও খারিজীরা পবিত্র মক্কা-মদীনায় পরিচিত। আর তাই এসব পবিত্র জায়গায় তারা কোন স্থান পায় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই ওহাবী ও খারিজীদের প্রতি এদেশের মুসলমানরা বিরূপ ভাবাপন্ন ছিল। মুসলমানদের এই বিরূপ অনুভূতি কাজে লাগাবার জন্যই ইংরেজরা ফারায়জী আন্দোলনকে ওহাবী নাম দিয়ে ইহাতে অংশ গ্রহন থেকে মুসলমা-নদের বিরত রাখার প্রয়াস চালিয়েছিল। ফারায়জী আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে যে জেহাদী চেতনা ও সম্ভাব্য মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠছিল তা সমূলে বিনাশ করার জন্যই মুসল-মানদের মাঝে ওহাবী আন্দোলন হিসেবে ইহাকে পরিচিত করে তোলে। কেননা, হাজী শরী-য়তুল্লাহ এই আন্দোলনে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য এদেশকে 'দারুল হরব' ঘোষনা করেন। এসব কারনে ভীত-সন্ত্রস্ত ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী এই আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলনে পরিচিত করার সর রকমের প্রয়াস চালায়। " অথচ আরবের ওহাবীদের সংগে মুজাহিদীনের কারও কোন সম্পর্কের খবর আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি।[৭৫] ব্রিটিশ সরকার তখন আংশিকভাবে সফল হলেও পরবর্তীতে ধর্মীয় আব-রনেই এদেশে ওহাবী মতবাদের প্রসার ঘটে। ওহাবীরা রাজনীতির সাথে কোনভাবে জড়িত ছিল বলে জানা যায় না। তবে পাকিস্তান সৃষ্টির পথে তারা বাধার সৃষ্টি করেছিল। এমনকি পরব-র্তীতে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ভোট দানেও তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। ওহাবী মতবাদকে ওই সম্প্রদায় ধর্মীয় মতাদর্শ হিসেবেই গ্রহন করেছে। তাদের এদেশীয় নেতা ছিলেন কচুয়া থানার উজানী গ্রামের মরহুম ক্বারী ইবরাহীম। তিনি নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন এবং কচুয়ায় হিজরত করেন। ওহাবীরা মনে করে খাঁটি মুসলমান হতে হলে আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারী হওয়া আবশ্যক। তাদের মতে, তিনিই হলেন মুসলমানদের একমাত্র ত্রান-কর্তা। কিন্তু সুন্নী মুসলমানদের মতে, আবদুল ওহাব ইসলাম থেকে বহিস্কৃত খারিজী সম্প্র-

Dhaka University Institutional Repository

দায়ের একজন ভ্রান্ত মুসলমান। তিনি নাকি নিজেকে নবী বলেও দাবী করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের বিভ্রান্তির পথে টেনে নিতে চেয়েছেন। অবশ্য ওহাবীগন সুন্নীগনের এসব অভিযোগ অস্বীকার করলেও সুন্নীগন বেশ দৃঢ়তার সাথেই এগুলো বিশ্বাস করে থাকে। সুন্নী মুসলমানদের মতে, আবদুল ওহাবের প্রদত্ত যাবতীয় ফতুয়া কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী। তিনি ইসলামে ভ্রান্ত নীতির আমদানী করেছেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর নবুয়ত নিয়েও তিনি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকর মতবাদ প্রচার করেছেন। ইসলামে কোন ব্যক্তি বিশেষের মতবাদ নহে, কোরান ও সুন্নাহই হলো ইসলামের একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু তিনি কোরান ও সুন্নাহকে পাশ কাটিয়ে ইহাদের পাশাপাশি নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়েও তিনি বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে ওহাবীদের উচিত হবে, তওবা করে নতুনভাবে মুসলমান হওয়া। এভাবে উভয়ের মতভেদ যেমন আছে, তেমনি সামঞ্জস্যও আছে। উভয় সম্প্রদায়ই নামাজ পড়ে এবং নামাজে কোরান তেলাওয়াত করে। সকলে একই ধরনের ইসলামী লেবাছ পরিধান করে। এসব ব্যাপারে কেউ কাউকে কোন দোষ দেয় না। কিন্তু সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমানগন যখন মিলাদ পড়ে, তখন ওহাবীরা বলে যে, এটা বেদাত কাজ। সুন্নীগন কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে এরূপ বক্তব্য খন্ডন করে। তাদের মতে, কোরান শরীফে উল্লেখ আছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগন নবী পাকের উপর দরূদ পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পৌঁছাও।' কাজেই আল্লাহর প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে সালাম পাঠ করতে দাঁড়িয়েই করতে হবে। কেননা, কাউকে সালাম দিতে হলে দাঁড়িয়ে দিতে হয়। বসে সালাম দেওয়া একান্তই বেয়াদবীর লক্ষন। সুন্নীগনের দৃষ্টিতে ওহাবীদের আরও অনেক দোষ - তারা আজান দিয়ে বা নামাজ পড়ে মুনাজাত করে না। ওহাবীগনের মতে, মুনাজাত করা ফরজ নহে-করলে সওয়াব আছে। এভাবে সামান্য বিষয় নিয়ে যেমন মতভেদ আছে, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও চরম মতভেদ আছে। এমনকি সুদূর ব্রিটিশ আমল থেকে এসব ব্যাপারে কয়েক দফা মামলাও হয়েছে। তাছাড়া, সুন্নী সম্প্রদায়ের আলেমগন প্রায়ই বাহাছের আয়োজন করে ওহাবী সম্প্রদায়ের আলেমগনকে আহবান করেন তাদের মতামতের সত্যতা জনসম্মুখে প্রমান করার জন্য। কিন্তু তারা তাতে সাড়া দেয় না বলে সুন্নীগনের অভিযোগ রয়েছে। তাদের অভিযোগ, ওহাবীরা ইসলাম নিয়ে চরম গোঁড়ামী করে থাকে। তারা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। স্কুল কলেজে মেয়েদের লেখা-পড়া শিখারও তারা ঘোর বিরোধী। তারা সুন্নীদের মসজিদে এবং সুন্নীদের পিছনে নামাজ পড়ে না। অপরদিকে, সুন্নীরা তা করে না। ওহাবীদের এসব আচরনকে সুন্নীরা গোঁড়ামী হিসেবে বিবেচনা করে। যে সব বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

এতটা মতভেদ সেসব বিষয়ে সাধারন মানুষের চেয়ে আলেমগনই ভাল জানে। তবে বাহ্যিক আচরনে সাধারন মানুষের কাছে সামান্য পার্থক্যই ধরা পড়ে। অত্র গোহাটী ইউনিয়নদ্বয়ে ওহাবীদের সংখ্যা বেশী নহে। এদের মোট সংখ্যা দুইশতের বেশী হবে না। ফলে এখানকার সংঘাত ততটা মারাত্মক নহে। কিন্তু অন্য যে কোন স্থানে এসব ব্যাপারে বাহাছ বা জলসা অনুষ্ঠিত হলে উভয় সম্প্রদায়ই স্ব স্ব দলভুক্ত হয়ে তাতে হাজির হয়। এখানে তারা সংখ্যায় কম হওয়ায় তেমন জমজমাট জমায়েতের আয়োজন করতে পারে না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহ্যিক এসব দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আজান দিয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করে, রোজা রাখে, ঈদের নামাজ পড়ে, কোরবানী করে, ছেলেদের খাতনা করে, আকিকা দেয়, ইসলামী রীতিতে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন করে এবং ইসলামী পোশাক পরিধান করে। এরপরও তাদের মধ্যকার মতভেদের সমাধান কেন হয় না, বুঝা মুশকিল। গোহাটী ইউনিয়নে আরও এক সম্প্রদায়ের মুসলমান রয়েছে, যারা মাইজভান্ডারী[৭৬] নামে পরিচিত। তারা জিকিরের সময় বাদ্যবাজনা করে, মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং তালের পাঁশের তৈরী টুপি পরে। সুন্নীগনের সাথে তাদের কোন মত পার্থক্য নেই। সুন্নী মুসলমানগন সাধারনতঃ 'কাদেরিয়া তরিকা'র[৭৭] অনুসারী। আর মাইজভান্ডারীরা চিশতিয়া তরিকার অনুসারী। তারা একই সাথে একই মসজিদে নামাজ পড়ে এবং একে অপরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপনেও আপত্তি করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওহাবী এবং সুন্নীর মাঝেও আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে।

সুন্নী মুসলমানগন এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তারা সকলে একই পীরের অনুসারী নয়। স্থানীয়ভাবে এখানে কোন পীর নেই। তবে আলেম আছে। পীর হওয়ার জন্য যেসব যোগ্যতা থাকা দরকার তা তাদের মধ্যে নেই বলে স্থানীয় আলেমদের কেহই নিজেদের পীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না। এখানকার বেশীর ভাগ মুসলমান কুমিল্লার বিবির বাজার সংলগ্ন শাহপুর গ্রামের মরহুম পীর গাজী আবদুস সোবহান আল কাদেরী সাহেবের মুরীদ। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুরীদ হলো লাকসাম থানার কালিয়া পুরের মরহুম পীর কাজিমউদ্দিন সাহেবের মুরীদ। তাছাড়া, বরিশালের ছারছীনা, ভারতের ফুরফুরা ও জৌনপুর, চট্টগ্রামের মীরের সরাই, ফেনীর সেনুয়া, ফরিদপুরের আটরশি, চট্টগ্রামের মাইজভান্ডার প্রভৃতি স্থানের পীর সাহেবদের মুরীদ রয়েছে। এসব পীর সাহেবদের মুরীদগনের মধ্যে কোন মত পার্থক্য নেই। সকল পীরকে সকল অনুসারীই আল্লাহর অলি মনে করে এবং সমানভাবে সম্মান করে। এসব পীরদের কারও কারও খানকাও অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের কোন কোন গ্রামে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে, ওহাবীরা উজানী গ্রামের মরহুম পীর ইবরাহীম সাহেব এবং বরিশালের চরমোনা -ইর পীর সাহেবের মুরীদ।

হিন্দুরা এখানে সংখ্যায় বেশ নগন্য। তারা বেশীর ভাগই গরীব এবং নিম্ন বর্ণের। আগে তাদের মধ্যে বর্ণ বিভেদ থাকলেও ইদানিং তাদের মধ্যে কিছুটা বর্ণ মিশ্রন লক্ষ্য করা যায়। পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপনের মধ্য দিয়ে তারা এই মিশ্রন সাধন করেছে। হিন্দুদের এখানে কোন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নেই। পূজা-পার্বন, বিয়ে-শাদী প্রভৃতিতে তাই অন্য এলাকা থেকে ব্রাহ্মণ আনতে হয়। এখানকার হিন্দুরা তাদের ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞ। কেননা, ধর্ম বিষয়ে তারা কোন শিক্ষা লাভ করতে পারে না। এবিষয়ে নাকি কেবল ব্রাহ্মণদেরই অধিকার আছে। তাছাড়া, ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা লাভ করলেও ব্রাহ্মণ ছাড়া কোন ধর্মীয় কাজই তাদের পক্ষে করা সম্ভব নহে। হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু হলেও কেবল স্বাধীনভাবেই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমানদের সহযোগিতা নিয়েই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে থাকে। বিশেষ করে পৌষের বা বৈশাখের মেলায় মুসলমানরা হাজির না হলে তাদের মেলা জমার সম্ভাবনা নেই।

জনসাধারনের পেশা

উক্ত গৌহার্টী ইউনিয়নদ্বয়ের জনসাধারনের অবস্থা গড়পড়তা হিসেবে স্বচ্ছল নয়। এখানে বিত্তশালী যেমন আছে, তেমনি ভূমিহীনও আছে। তবে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের সংখ্যাই বেশী। তাই এখানকার বেশীর ভাগ লোকই শ্রমজীবী। এখানকার অর্থনীতি কৃষি নির্ভরশীল বিধায় কৃষি ক্ষেত্রেই তাদের শ্রম বেশীর ভাগ সীমাবদ্ধ। তবে ইদানিং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এসব শ্রমজীবী পাড়ি জমাচ্ছে। এদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নিম্নবিত্তের লোকদের মাঝে কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দিতে শুরু করেছে।

দু'টি ইউনিয়নের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় সাধারন মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করা বেশ কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে পরিবারের সংখ্যা মোট ৬১১৮ টি [৭৮]। পরিবার প্রতি গড়ে সদস্য সংখ্যা ৬ জনের কাছাকাছি। অথচ আধুনিক কালে জীবন যাপনের জন্য ছোট পরিবারের বিকল্প নেই। জনসংখ্যার আধিক্য হেতু জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ যে যুক্তপরিবার, তা এখনি বৃহৎ পরিবার থেকেই উদ্ভূত।

কৃষি শ্রমিক ছাড়াও এখানে অন্যান্য পেশার লোকও রয়েছে। আগেকার দিনে জমিদারের জমি চাষ করে যে এখানকার ভূমিহীন পরিবারের কিছু লোক পাওয়া যায়। তবু উচ্চ শিক্ষিত বা তথাকথিত নিম্নবিত্ত ও ভূমিহীনদের মধ্যে কোন কোন পরিবারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষিত দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ চাকুরীর প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এখানে চাকুরীজীবী, ব্যবসাজীবী, আইনজীবী এবং অন্যান্য পেশার লোকও রয়েছে। চাকুরীজীবী-দের মধ্যে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাও রয়েছে। এছাড়া, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক চাকুরী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতেও বেশ কিছু লোক নিয়োজিত রয়েছে। অন্যান্য পেশার লোকের মধ্যে রয়েছে গ্রাম্য চিকিৎসক, দলিল লিখক, [illegible] মালিক, জমির বিরোধ নিয়ে সমস্যার সমাধান বা গোল মিমাংসাকারী, পশু চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার লোক। উল্লেখ্য, সরকারী চাকুরীজীবীর সংখ্যা ৫%, ব্যবসাজীবীর সংখ্যা ৪%, শিক্ষাজীবীর সংখ্যা ৬%, বেসরকারী চাকুরীজীবীর সংখ্যা ৭% এবং অন্যান্য পেশাজীবীর সংখ্যা ৮%।[৭৯] অবশিষ্ট ৭০ ভাগ লোক শ্রমজীবী শ্রেণীর। এদের মধ্যে রয়েছে কামার, জেলে, মুচি, মেথর, নাপিত, ছুতার, কসাই, রিক্সা চালক, যানবাহন শ্রমিক, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, টেইলার ও যারা ঘরের চাল ছাইয়ে দেয় প্রভৃতি। দৈহিকভাবে অক্ষম কিছু ভিক্ষাজীবীও আছে।

সরকারী অফিস ও প্রতিষ্ঠানাদি

চৌহাটা ইউনিয়নপুরে রয়েছে ১টি তহশিল অফিস, ১টি কৃষি উন্নয়ন অফিস, ডাকঘর, সোনালী, ইসলামী [illegible] প্রভৃতি ব্যাংকের ১টি করে শাখা, দু'টি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, ১টি পশুপালন অফিস, ২টি পোস্ট অফিস, ৫টি হাট ও বাজার এবং ১টি আঞ্চলিক পরিবার পরিকল্পনা অফিস। এখানে রয়েছে ১টি কলেজ, ৯টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি সিনিয়র মাদ্রাসা ও ৩টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৫০টি কোরআনিয়া মাদ্রাসা, ৫৫টি মসজিদ-মন্দির, ৩টি পুরাকীর্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, ৩৩টি সমবায় সমিতি এবং ৬টি পৌরাফ।[৮০] এছাড়া, [illegible] ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিস রয়েছে। তদুপরি, [illegible] রয়েছে [illegible] প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। [illegible] রয়েছে ১৩টি ক্লাব-সেবামূলক [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী অনুমোদন নেয়নি।

যোগাযোগ, পরিবহন ও বাজারের সুযোগ সুবিধা

যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্র ইউনিয়নদ্বয় মোটামুটিভাবে উন্নত। জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাথে কুমিল্লায় গিয়ে মিলিত হয়েছে এবং এই জেলা বোর্ডেরই নির্মিত কচুয়া থানা থেকে পাকা সড়কটি গিয়ে জেলার প্রধান সড়কটির সাথে মিলিত হয়েছে কালিয়া পাড়া নামক স্থানে। ফলে রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা ও চাঁদপুরের সাথে অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। এসব স্থানে যাতায়াতের জন্য আলাদা আলাদা বাস রয়েছে, যা কচুয়া থেকে ছাড়লেও বাসের অর্ধেক টিকেট রহিমানগরের যাত্রীদের জন্য রিজার্ভ থাকে। এই ইউনিয়নদ্বয়, এমনকি কচুয়া থানাতেও রেলপথ নেই। এখান থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে শাহরাস্তি থানা এলাকায় মেহার নামক স্থানে রেলপথ রয়েছে। বাস যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এই রেলপথই ছিল এখানকার জনগনের দূর-দূরান্তরে ভ্রমনের একমাত্র উপায়।

জেলা বোর্ডের রাস্তা ছাড়া ইউনিয়নদ্বয়ে আর কোন পাকা রাস্তা নেই। অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৬ কিলোমিটার পাকা রাস্তা। তাছাড়া, ছোট বড় মিলিয়ে এখানে মোট ১২৫ কিলোমিটার[৮১] কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বেশীর ভাগ কাঁচা রাস্তায় রিকশা, স্কুটার, প্রাইভেট কার প্রভৃতি হালকা যান-বাহন চলাচল করতে পারে। তবে রিকশার চলাচল -ই সর্বাধিক লক্ষণীয়। বর্ষাকালেও (বন্যার সময় ছাড়া) রাস্তাগুলোতে রিকশা চলাচল করতে পারে।

টেলি যোগাযোগ এখানে বেশ অনুন্নত। সরাসরি কোন ডায়ালিংয়ের ব্যবস্থা এখানে নেই। তাছাড়া, কেবলমাত্র অল্প কয়টা অফিসেই টেলিফোন সংযোগ আছে। গোটা কচুয়া থানার টেলি যোগাযোগের অবস্থা এই একই ধরনের। দূরবর্তী স্থানে আলাপের জন্য ট্রাংকল বুক করতে হয়। ট্রাংকল বুকিং অফিস এখান থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী হাজিগঞ্জে অবস্থিত।

এখানে অতি প্রাচীন কালের ঐতিহ্য হলো পালকি। আগেকার দিনে বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতে বা বিয়ে শাদীতে মহিলাদের পালকি চড়া প্রচলিত রীতি ছিল। বর্তমানে এই

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্য অনেকটা তিরোহিত হয়ে চলেছে। এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রিকশা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রিকশার প্রচলন যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে পালকির প্রচলন ততই তিরোহিত হচ্ছে।

গৌহাটী ইউনিয়নে ১ টি বাজার ও ৩ টি হাট রয়েছে। যোগাযোগের সুবিধা থাকায় এ হাট-বাজারগুলো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হওয়ায় বাজারটিতে টিন, রড, সিমেন্ট প্রভৃতির ব্যবসাও বেশ সচল। এসবের জন্য লোকজনকে শহরে ছুটে যেতে হয় না। তাছাড়া, হাটগুলো প্রত্যন্ত গ্রামে হলেও জনসাধারনের চাহিদা মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহে সক্ষম হয়। হাট-গুলোতে প্রতিদিন সকাল বিকাল 'আড়ং' বসে এবং মাছ, দুধ প্রভৃতিসহ অন্যান্য নিত্য সামগ্রী বিক্রী হয়। আজকাল এসব হাট-বাজারকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

আবাসিক অবস্থা

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ে গ্রামের সংখ্যা ৩৪। সমষ্টিগতভাবে জনসাধারনের আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল নয়- একথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও ভূমিহীন—এই পাঁচ শ্রেণীর লোকের বাস। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত লোকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তাই তাদের বাড়ি-ঘরের নমুনাতে -ই গোটা ইউনিয়নদ্বয়ের আবাসিক চেহারা ফুটে উঠবে। এসব লোক জনের বাড়ি-ঘর অত্যন্ত সাধারন মানের। প্রত্যেক পরিবারের রয়েছে একটা করে বসত ঘর, একটা করে পাকঘর এবং একটা করে গোয়াল ঘর। এসব বেশীর ভাগই ছনের ছানি এবং বাতা'র[৮২] বেড়া। প্রতিটি বাড়ীতে কমপক্ষে ৭/৮ টি পরিবার বাস করে। প্রত্যেক পরিবারের ঘরের সামনে উঠান হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটু খালি জায়গা থাকে। রবি শস্য, আউশ, আমন প্রভৃতি ফসল এই উঠানে -ই তোলা হয়ে থাকে। নিম্নবিত্তের এসব বাড়িতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌথ উদ্যোগে তৈরী কাচা-রী ঘর থাকে। আর ভূমিহীনদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটাই মাত্র ঘর থাকে। ওদের রান্না -বান্না এবং থাকা-খাওয়া এই একটা মাত্র ঘরেই চলে। আজকাল ছনের অভাবে তারা ধানের নাড়া, তালের পাতা, গমের শুকনো গাছ প্রভৃতি দিয়ে ঘরের ছানি দিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ি-ঘরের চেহারা অন্যরকম। এদের প্রত্যেক পরিবারের আলাদা আলাদা ঘর থাকে। পাকের ঘর, কাছারী ঘর, গোয়াল ঘর, গোলা ঘর প্রভৃতি ঘরগুলো ছাড়াও তাদের অনেকেরই একাধিক বসত ঘর দেখা যায়। এদের বেশীর ভাগ ঘরই টিনের: তৈরী এবং টিনের বেড়া। উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো আজকাল টিনের বদলে পাকা দালান কোঠা তৈরী করতে শুরু করেছে। তবে এদের সংখ্যা বেশী নয়।

ভূমি ও কৃষি

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভরশীল দেশ। প্রবাদ আছে যে, বাংলাদেশের কৃষি মৌসুমী বায়ুর জুয়া খেলার উপর নির্ভর করে - বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় এ এলাকার বেলায়ও একথা সত্য। এখানকার ভূমি মোটামুটি উর্বর। অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকা বলে মাঠগুলোতে পানি আটকা পড়ে না। অবশ্য বন্যার পানিতে গোটা এলাকার জমিগুলো প্লাবিত হয়। ফলে জমিগুলোর উর্বরতা প্রতি বছর বৃদ্ধি পায়। এখানে কোন জলাভূমি নেই। জমিগুলো বেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। কারন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একই পিতার এক খন্ড জমি কয়েক সন্তানের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এখানে মোট ভূমির পরিমান ৪৪৬০ একর।[৮৩] অনাবাদী কোন জমিও এখানে নেই। ফসলের উৎপাদনের হার এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কৃষির উন্নতির প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবই মূলতঃ উৎপাদন ব্যাহত করছে। ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক কোন শুমারী গৃহীত না হওয়ায় হুবহু একর প্রতি উৎপাদিত ফসলের পরিমান উল্লেখ করা সম্ভব নহে। তবে থানা ভিত্তিক শুমারীর আলোকে অনুমান করে খানিকটা আভাস দেওয়া যায় মাত্র। কালুয়া থানার মোট আবাদী ৪৭২০০ একর জমির উৎপাদন ক্ষমতা ২১৩৫৫ টন।[৮৪] আর সে মতে বলা যায়, এখানে একর প্রতি শস্যের উৎপাদন অর্ধ টনের কিছু বেশী।

এখানকার লোকজন কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষির প্রতি তারা বেশ যত্নবান। জমিগুলোতে সাধারনতঃ তিনটি ফসল উৎপাদন করা হয়। আউশ ও আমন প্রধান দু'টি ফসল। তাছাড়া, অপরাপর ফসলের মধ্যে রয়েছে ইরি, বোরো, গম, আলু প্রভৃতি। এগুলো সাধারনতঃ তৃতীয় ফসল হিসেবে আবাদ করা হয়। অপরদিকে, স্থান ভেদে চীনা, কাউন, মুগ, কালাই, মসুরী, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্যেরও চাষ করা হয়ে থাকে। আউশ ও আমন ফসলের মধ্যবর্তী ফসল হিসেবে এসবের চাষ করা হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। আগে সেচ ব্যবস্থা না থাকায় ইরি, বোরো প্রভৃতির চাষ করা সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। কেননা, অত্র ইউনিয়নদ্বয়ে প্রায় এক হাজার পুকুর থাকলেও শুকনা মওসুমে এদের বেশীর ভাগই শুকিয়ে যায়। এখানে ৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ৭টি খাল রয়েছে।[৮৫] বর্ষা মওসুম শেষে দুই মাসের মধ্যেই এসব খাল শুকিয়ে যায়। পানি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাও এখানে নেই। যে সব বড় বড় দীঘি পড়ে আছে, বা ভরাট করে জমি তৈরী করা হচ্ছে, সেসব দীঘিতে বর্ষা-কালে পানি সংরক্ষন করলে রবি শস্য, ইরি, বোরো প্রভৃতি চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। পূর্বোল্লেখিত সাহার পাড় এবং পালপিরির দুলাল রাজার দীঘিসহ যে বিশাল দীঘিদ্বয় এখানে রয়েছে সেগুলোতে পানি সংরক্ষন করলে অন্তুতঃ ৫০০ একরের মত (আনুমানিক) জমিতে শুকনা মওসুমে পানি সেচ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, এসব দীঘিতে মাছের চাষও করা যায়। কিন্তু উদ্যোগের অভাবে তা হয় না।

আগেই বলা হয়েছে যে, এখানকার জমিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। বৈজ্ঞা-নিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ এখনও ততটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। এব্যাপারে সরকারী কোন উদ্যোগ নেই। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু কিছু ট্রাক্টরের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ সাধারনতঃ ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্যই গৃহীত হয়ে থাকে। এর ফলে ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ করা বেশ ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। তাই এব্যাপারে জনগনের আগ্রহ কম দেখা যায়। এখনও কাঠের লাংগলই কৃষকদের কৃষি কাজের একমাত্র সম্বল। তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি তাদের আগ্রহ আছে এবং এজন্য তারা সরকারী সাহায্য চায়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মধ্যে এখানে ধান মাড়াই কলের ব্যবহার সর্বত্র লক্ষনীয়। আগে ধান মাড়াইয়ের কাজে বলদ ব্যবহার করা হলেও এখন মাড়াই কলের দ্বারাই মাড়াই কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই মাড়াই কল স্থানীয়ভাবে তৈরী হয়ে থাকে। অর্থাৎ জেলা শহর কুমিল্লাতে এসব মাড়াই কল তৈরী হয়। সম্ভবতঃ চলতি শতকের সত্তর দশকের শুরুতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান সর্ব প্রথম কুমিল্লা অঞ্চলে ইরি চাষের সূত্রপাত ঘটান এবং এই ধান মাড়াইয়ের জন্য স্থানীয়ভাবে মাড়াই কল তৈরীতেও তিনি বিশেষভাবে উৎসাহ যোগান। অত্র গৌহাটা ইউনিয়নের প্রায় প্রতি বাড়িতেই মাড়াই কল পাওয়া যায়। তাছাড়া, ইরি ধানের জমি নিড়ানোর কাজে আজকাল ব্যাপকভাবে উইডার ব্যবহার করা হচ্ছে। জমির মাটি উলট পালট করে দেওয়ার এবং আগাছা উপড়ানোর কাজে এই যন্ত্র এখানকার কৃষকদের কাছে বেশ সমাদৃত।

কৃষি কাজে জনসাধারনকে সহায়তা করার জন্য এখানে প্রত্যেক গ্রামে একটা

Dhaka University Institutional Repository

করে সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট ৩৪টি গ্রামে ৩৬টি সমিতি থাকা সত্ত্বেও কৃষকদের সমস্যার সমাধান হয় না। তারা প্রয়োজনীয় সার, বীজ ও ঔষধ পায় না। দেনার ভয়ে অনেকেই ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ নিতে সাহস পায় না। ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ তারা নানা কারনে সময় মত পরিশোধ করতে পারে না। আইনগতভাবে তাদের অনেক অসুবিধার মোকাবেলা করতে হয়। সমিতিগুলোর প্রতিও জনগনের তেমন একটা আস্থা নেই। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে সমিতির মাধ্যমে তারা বেশ হয়রান হয়েছে। ফলে ব্যাংক ঋণের প্রতি তাদের আস্থা থাকলেও সময় মত পরিশোধ করার ভয়ে তারা ঋণ নিতে চায় না। " The small , marginal and landless farmers are always in the sea of poverty.The main cause of their poverty is that they are solely dependent on agricultural production and hardly they have other skill or opportunity to undertake other income-generating activities. They are in the vicious circle of poverty, want, loan, non-payment of loan, loss of land and absolute poverty." [৮৬] কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকের উন্নতি করা আবশ্যক। জাতির মেরুদন্ড বলে যে কৃষক পরিচিত , সেই কৃষকের মেরুদন্ড শক্ত না হলে জাতিরও উন্নতি হতে পারে না। কেননা, মানুষের বাঁচার জন্য সর্বাগ্রে অন্নের দরকার। তাই অন্নের যোগানদার কৃষকের মানে অবস্থা ভেদে বিনা সুদে কৃষি ঋণ বিতরন, বিনামূল্যে সার ও ঔষধ প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহন করলে কেবল অত্র ইউনিয়নেই নয়, গোটা দেশের কৃষিতেও আমুল পরিবর্তনের আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন : দলাদলির রাজনীতি

গ্রামীন রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দলাদলি। তবে এই দলাদলির নির্দিষ্ট কোন কারন থাকেনা। যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করেই দলাদলির সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ দলাদলির সাথে ব্যক্তি স্বার্থ, সামাজিক মর্যাদা এবং আধিপত্যের প্রশ্ন জড়িত থাকে। সমাজে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা সাধারন মানুষের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে। দু'পক্ষের অভ্যন্তরীন কোন্দলকে কেন্দ্র করে স্বার্থবাদীরা ও দু'দলে বিভক্ত হয়। আর এভাবেই গ্রামে দলাদলির সৃষ্টি হয়। এই দলাদলি ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত গড়ায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই থানা আদালতের আশ্রয় নিতে হয়। কখনও সমাজের প্রভাবশালী মহল নিজেদের মর্যাদা ও আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য সাধারন মানুষের মধ্যে সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন্দল লাগিয়ে রাখে। আর তখন বিবদমান উভয় পক্ষই তাদের শরনাপন্ন হতে বাধ্য হয়। এভাবে সম্পত্তি সংক্রান্ত গ্রামীন কোন্দল যুগ যুগ ধরে চলছে।

ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিও অনেক সময় গ্রামে দলাদলির সৃষ্টি করে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থও কখনও কখনও দলাদলির সৃষ্টি করে থাকে। অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের বেলায় এদু'টোর কোনটাই প্রযোজ্য নয়। ধর্মীয় দলাদলি সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ ধর্মীয় দলাদলি এখানকার রাজনীতিকে প্রভাবিত করেনা। কারন, একদিকে ওহাবী সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে সংখ্যায় কম, অপরদিকে, ওহাবী বা সুন্নী কোন সম্প্রদায়ের আলেমই এরূপ দলাদলিতে নেতৃত্ব দেয়না। তাছাড়া, সাম্প্রদায়িক স্বার্থগত বৈষম্য নেই বলে এখানে সম্প্রদায়িক স্বার্থগত দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। তবে আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নটি এখানকার নির্বাচনকে মাঝে মধ্যে বেশ প্রভাবিত করে থাকে।

১৯৭৩, ১৯৭৭ এবং ১৯৮৪ সনের তিনটি নির্বাচনেই অত্র দুই ইউনিয়নে দলাদলি লক্ষ্য করা গেছে। তবে এই দলাদলি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। এরূপ ভিন্নধর্মী দলাদলি কেবল উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নেই সীমিত ছিল। এরূপ দলাদলির বিষয়টি উল্লেখের জন্য একটু পিছনের কথা আলোচনা করতে হয়। একথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ইউনিয়ন এলাকায় জমিদার না থাকলেও জনগন জুলুমমুক্ত ছিল না। এই এলাকায় জমিদার বাদীয় পরিবার ছিল। একথা আগেও উল্লেখ করেছি যে, তাদের জমিদারী অন্যত্র ছিল। তথাপি স্থানীয় জনগন তাদের জুলুম থেকে রেহাই পায়নি। জনগনের উপর জুলুম করার সুযোগ ছিল বলে এসুযোগ তারা কাজে লাগিয়ে জমিদারী এলাকা বহির্ভূতভাবেই জনগনকে শোষন করত। নিরীহ জনগন নীরবে তাদের জুলুম সহ্য করত। পাকিস্তানের দ্বিতীয় দশকে মৌলিক গনতন্ত্রের আমল শুরু হলে জনগনের আগে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু তার আগে পাকিস্তান পেয়েও তারা জমিদারদের শোষন থেকে রেহাই পায়নি। ফলে এসব জমিদারের প্রতি জনগন সর্বদাই অসন্তুষ্ট ছিল। মৌলিক গনতন্ত্রের আমলে ভোটাধিকারের সুযোগ পেয়ে তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে মাথা ছাড়া দিয়ে উঠে কিছুটা সুযোগ লাভ করে। আর এই সুযোগে এমন কিছু লোককে তারা ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

কাউন্সিলের মেম্বার নির্বাচিত করেছিল যারা প্রকাশ্য বা গোপনে জমিদারদের বিরোধিতা করত। এমনকি তাদের কারও কারও ভাগ্যে মিথ্যা মামলার ফলস্বরূপ জেল-জুলুমও ঘটেছিল।

মৌলিক গণতন্ত্রের সূচনালগ্নে গৌহাটী ইউনিয়নকে দু'টি ইউনিয়নে ভাগ করা হয়। আর তখন পর্যন্ত ইউনিয়নদ্বয়ের দুই জমিদার পরিবারের মধ্যেই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ সীমিত ছিল। তাছাড়া, নির্বাচিত মেম্বারগন হয় তাদের আত্মীয় নয়তো খয়ের খাঁ ছিল। সে সময় ভোটার বা প্রার্থী তারাই ছিল, যারা কমপক্ষে আট আনা খাজনা বা কর প্রদান করত। সুতরাং তখন ইউনিয়নের কর্তৃত্ব উচ্চ মহলের মধ্যেই বেশীর ভাগ সীমিত ছিল। ১৯৫৯ সনের নির্বাচনেও দুই ইউনিয়নের দুই পরিবারের মধ্যে ইউনিয়ন-দ্বয়ের চেয়ারম্যান পদ দু'টি ভাগাভাগি হয়। কারন, প্রকাশ্য ভোট দিতে গিয়ে জনগন জমিদার-দের কোপানলে পড়ার ঝুঁকি সরাসরি নিতে চায়নি। কিন্তু জমিদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে এনির্বাচনে তারা জমিদারদের আতংক হিসেবে কিছু নতুন মুখ ইউনিয়ন কাউন্সিলে আমদানী করে, যারা জমিদার শ্রেণীর নিকট এতকাল ধরে নির্যাতিত হচ্ছিল। বিশেষ করে উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের বেলায়ই এসব ঘটেছিল। দক্ষিন গৌহাটীতে তখনও সংঘবদ্ধ কোন রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি, বা জনগনের মাঝে তেমন সাড়া তখনও জাগেনি। সেখানকার জমিদারদের সাথে জনগনের কোন রকম বিবাদের তথ্যও পাওয়া যায় না। উক্ত ইউনিয়নে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও এসব ঘটনার সাথে ব্যক্তি বিশেষই জড়িত ছিল। অবশ্য এসব ব্যক্তি বিশেষ সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকই ছিল। তাই উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের বিষয়টিই এখানে উল্লেখ করা গেল। ১৯৫৯ সনের নির্বাচনে জমিদার বিরোধী গোষ্ঠীর মেম্বার নির্বাচিত হওয়ায় জমিদারদের মধ্যে বেশ একটা আতংকের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে তারা বেড়ে উঠা বিরোধী শিবিরকে নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট হয় এবং জমিদার কুলের চেয়ারম্যান ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচিত মেম্বার বা তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে নানা রকম নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে। ফলে জমিদার শ্রেণীর প্রতি এলাকার জনগনের ক্রোধ আরও বেড়ে যায়।

প্রকাশ্য ঘোষনার মাধ্যমে অর্থাৎ প্রার্থী বা তাদের নিয়োজিত এজেন্টদের উপস্থি-তিতে সরকার মনোনীত ভোট গ্রহনকারী কর্মকর্তার সামনে ভোটারকে বলতে হত কাকে ভোট দেবে এবং ওই প্রার্থীর বাক্সেই ভোট ফেলা হত। এঅবস্থায় জমিদারদের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জমিদারদের বিপক্ষে খুব কম ভোটই তারা দিতে পারত। প্রকাশ্য ভোট দানের

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ম যতদিন পর্যন্ত চালু ছিল, ততদিন পর্যন্ত গ্রামীন মানুষের পক্ষে জমিদার বা তাদের তাবেদারদের ভোট দান থেকে বিরত থাকা বেশ কঠিন কাজ ছিল। ১৯৫৯ সনের নির্বাচনে জয় লাভের পর উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিরোধীদের স্তব্ধ করার গোপন কৌশল অবলম্বন করলে তাতে উক্ত চেয়ারম্যানের নিজ গ্রাম থেকেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। এই বিদ্রোহী গ্রুপের সব রকম সাহায্য-সহায়তা ও বিদ্রোহের উস্কানীতে গোপন তৎপরতা চলছিল ১৯৬৪ সনের নির্বাচনে জমিদার বংশের প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীর নেতৃত্বে। এতে জমিদার বংশের প্রার্থীর বিরোধীরা বেশ সাহসী হয়ে উঠে এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষনা করার পথ বেছে নেয়। বিরোধী গ্রুপের জনৈক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তারা একদিন জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসে এবং গ্রামের মধ্যেই নিজেদের এলাকায় মসজিদ ও মক্তব গড়ে তোলে। মূলতঃ প্রকাশ্য সংঘাত এখান থেকেই শুরু হয়। সেই ভাগাভাগি অদ্যাবধি বিদ্যমান। বিভিন্ন সময় নির্বাচন সামনে রেখে গ্রামের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া এই বিষয়টির সুরাহা জমিদাররা করতে চাইলেও বিরোধী শিবির তাতে কর্ণপাত করেনি। এই ঘটনা ১৯৬৪ সনের নির্বাচনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফলে নিজ গ্রামে জমিদার বংশীয় প্রার্থীকে কম ভোট পেতে হয়েছিল। অবশ্য অন্য গ্রামের ভোটে মৌলিক গনতন্ত্রী নির্বাচিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এই ইউনিয়নের ১৫ টি গ্রামের মধ্যে একটিমাত্র গ্রামে জমিদার বাড়ী থাকলেও ১৫ টি গ্রামেই তার শাখা-প্রশাখা রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রামেই তাদের পুরানো দিনের তাবেদার রয়ে গেছে। আর এর ফলে প্রতি গ্রামেই তাদের পক্ষ-বিপক্ষ সব ধরনের লোকই রয়েছে। বিশেষ করে তাদের সমর্থকরা আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটা সবল। আর একারনেই জমিদার বিরোধী শিবির সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও সকল ক্ষেত্রে তাদের মোকাবেলা করতে পারে না।

মৌলিক গনতন্ত্রের আমলে মৌলিক গনতন্ত্রীরা তাদের মধ্য থেকে নিজেদের ভোটে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করত। ১৯৬৪ সনে মেম্বার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর চেয়ারম্যান নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি চলতে থাকে। কিন্তু নির্বাচনের সপ্তাহ খানিক আগে অত্র উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নে এক আজব ঘটনা ঘটে যায়। এঘটনাকে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণীর উত্থান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মোট আটজন মৌলিক গনতন্ত্রীর মধ্যে জমিদার বংশের একজন (যার সম্পর্কে এতজন আলোচনা করা হয়েছে- যিনি ১৯৫৯ সনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন) এবং নিম্ন শ্রেণীর একজন (যার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে-যিনি বিদ্রোহীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন) সহ মোট দুইজন চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী ছিলেন। মাত্র দুইজন প্রার্থী - ছয়জন ভোটার (প্রার্থীদ্বয়সহ আটজন)। কাজেই

Dhaka University Institutional Repository

ভোটারদের বশে আনা খুব কঠিন কাজ নয়। অর্থের জোরে অপর ছয় জনকে কেনা হবে- এমনটি টের করতে পেরেই জমিদার বংশীয় প্রার্থীর বিরোধী শিবির বেশ আকস্মিকভাবেই চারজন মৌলিক গণতন্ত্রীকে বিরোধী পক্ষীয় চেয়ারম্যানের বাড়ীতে নিয়ে আটক করে রাখে এবং থানা কেন্দ্রে ভোট গ্রহনের পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।[১] এই নিয়ে উভয় পক্ষের সংঘাত বাঁধে এবং মূলতঃ এই সংঘাতকে কেন্দ্র করেই উত্তর গৌহাটী ইউনিয়ন দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর এভাবে মৌলিক গণতন্ত্রীদের আটকপূর্বক ভোট আদায় করে জমিদার বিরোধী শিবির নিজেদের অবস্থান মজবুতের বিশেষ সুযোগ পেয়ে যায়। নবীন ও নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আগত প্রার্থীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে সাধারন মানুষের যে সাহস ও প্রেরনা জেগেছিল ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সনের গণ-অভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা সংগ্রামেও তা তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই প্রার্থীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে এখানকার গণজাগরন এতই ত্বরান্বিত হয়েছিল যে, ব্রিটিশ বিরোধী দুইশত বছরের আন্দোলনেও এমনটি দেখা যায়নি।মোটকথা, এখানে রাতারাতি এমন একটা পরিবর্তন এসেছে যে, এতদিন ধরে জমিদারী হারানোর পরও জমিদাররা তাদের যে আধিপত্য বজায় রেখেছিল তা চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু তথাপিও প্রতিটি গ্রাম দু'টো শিবিরে বিভক্ত থেকে যায়। এই আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করব- ১৯৭৩, ১৯৭৭ এবং ১৯৮৪ সনের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে এই দুই বিরোধী গোষ্ঠী কিভাবে প্রভাবিত করেছে।আর এই সব নির্বাচনে সমাজের কোন গোষ্ঠী কার পক্ষ নিয়েছে।এই নির্বাচনত্রয়ে উভয় শিবিরকেই সক্রিয় দেখা গেছে। সুতরাং ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে তাদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার আগে তাদের উদ্ভব সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করছি।[২]

আলোচনার সুবিধার্থে আমি এলিটগনের বা নির্বাচনে অংশ গ্রহনকারী পক্ষ-গনের নাম উল্লেখ না করে সাংকেতিক নাম ব্যবহার করছি। এগুলো হলো- মৌমাছি ও জোনাকি। প্রথম সংকেতটি হবে উচ্চবিত্ত তথা পূর্বে বর্ণিত ১৯৬৪ সনের নির্বাচনে পরাজিত চেয়ারম্যান পক্ষের পরিচয়বাহী। আর দ্বিতীয় সংকেতটি হবে ১৯৬৪ সনের নির্বাচনে নির্বাচিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর চেয়ারম্যান পক্ষের পরিচয়বাহী। ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে মৌমাছি ও জোনাকি পক্ষ ছাড়াও আরও প্রার্থী ছিল। তবে তারা এই সব নির্বাচনে কেবলমাত্র প্রার্থীই ছিল। উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা তারা রাখতে পারেনি। তাছাড়া, নির্বাচন কেন্দ্রে তারা নিজেদের ফলাফল সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে স্ব স্ব সুবিধা মত পূর্বে বর্ণিত প্রতিদ্বন্দ্বি দু'টি দলকে

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন জানায়। আর তাই এখানে দু'টি দলেরই আলোচনা করা হবে।

১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে উভয় দলই নিজ নিজ প্রার্থী যেমন মনোনীত করেছে, তেমনি তাদের নির্বাচিত করার জন্যও জোর তৎপরতা চালিয়েছে। গবেষনায় দেখা গেছে, মৌমাছি দলের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষ সমর্থনকারী মেম্বারের সংখ্যা ছিল ১৯৭৩ সনে ৬ জন, ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে ৭ জন এবং ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে ৫ জন। অপরদিকে, জোনাকি দলের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষ সমর্থনকারী মেম্বারের সংখ্যা ছিল ১৯৭৩ সনে ১২ জন, ১৯৭৭ সনে ১১ জন এবং ১৯৮৪ সনে ১০ জন। সব ক'টি নির্বাচনে নিরপেক্ষ প্রার্থীও অবশ্যই ছিল। মাত্র তিনটি ওয়ার্ডেই উভয় পক্ষের উল্লেখিত সংখ্যক প্রার্থী ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সন থেকেই উল্লেখিত দুই দলের মনোনীত দু'জন নির্দিষ্ট ব্যক্তিই নির্বাচন করে আসছে। ১৯৮৪ সনের নির্বাচন পর্যন্ত এই দুই ব্যক্তির মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল। দু'টি দলই প্রায় সমান সমান শক্তি নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং একে অপরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনী তৎপরতায় দেখা গেছে, এক দল অর্থের জোরে নির্বাচ -ন করছে, আর এক দল জনবল নিয়ে নির্বাচন করছে। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করে তাকে নির্বাচিত করার তৎপরতা চালানো যে কোন দলের অবশ্য কর্তব্য এবং দলীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে এটা অপরিহার্যও বটে। প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচন সময়ে প্রদর্শিত প্রভাব আর শক্তিই গ্রাম্য নেতৃত্ব লাভের পথ সুগম করে দেয়। মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তারা বিজয়ী প্রার্থীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগই শুধু লাভ করেনা, ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে আসারও সুযোগ পায়। আর তাই দেখা গেছে, উল্লেখিত তিনটি নির্বাচনে অনেকে প্রার্থীর চেয়েও বেশী আগ্রহ নিয়ে নির্বাচনী তৎপরতা চালিয়েছে।

১৯৭৩ সনের নির্বাচন কালেই উত্তর ইউনিয়নের নির্বাচনে ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটেছিল একথা আগেই উল্লেখ করেছি এবং এই একই কারনে উক্ত ইউনিয়নের বিষয়টি আলাদাভাবে পেশ করছি। বলা চলে, জাতীয় রাজনীতির ন্যায় এখানেও দলীয় ভিত্তিতে নির্বা-চন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন সম্পর্কে জনগনের মতামত বেশ সুস্পষ্ট। তারা বরাবরই নির্বাচনের ব্যাপারে অতি উৎসাহী। এপ্রসংগে ডক্টর শামছুল হুদা হারুনের একটি মন্তব্য তুলে ধরা যায়। নির্বাচনের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষের উৎসাহ সম্পর্কে তিনি লিখেন,

Dhaka University Institutional Repository

" Bengalis tend to be emotional as the elections warming up to fray, and nothing excites them more than elections which enable them to air their views on issues both explicit and smouldering."[৩]

বস্তুতঃ ভোটের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষকে যতটা আগ্রহী দেখা যায়, আর কোন ব্যাপারে তাদের এতটা আগ্রহী হতে দেখা যায় না। কারন, ভোট দানকে তারা সরকার নির্বাচনে নিজেদের অংশ গ্রহন হিসেবে বিবেচনা করে। তবে ভোটাধিকার প্রয়োগে তারা বেশ আবেগ তাড়িত হয়ে থাকে। গ্রামীন মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব হেতু তারা সেই প্রার্থীকেই সমর্থন দিয়ে থাকে যে প্রার্থী মানুষের বাস্তব সমস্যা তুলে ধরে উহার প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে উত্তর গৌহাটী ইউনিয়ন পূর্বোক্ত দু'টি বৃহৎ দলে বিভক্ত হয়। উচ্চবিত্ত, ব্যবসায়ী, মহাজন ,কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ সমাজের উচ্চ মহল মৌমাছি দলের পতাকাতলে সমবেত হয়। চেয়ারম্যান প্রার্থীর বাড়ীতে এসব শ্রেণীর লোক জড়ো হয়ে নির্বাচনে জয়লাভের কৌশল ... নিয়ে আলোচনা করে। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বাহ্যিক কার্যকলাপ ছাড়াও কিছু কিছু গোপন তৎপরতাও এই দল বেছে নেয়। অত্র ইউনিয়ন এলাকার মধ্যে উল্লেখিত শ্রেণীসমূহের আত্মীয় -স্বজনদের সাথে যোগাযোগ ও মত বিনিময় করে স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ের তৎপরতা চালানো হয়। নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে এভাবে তারা নিজেদের অবস্থান মজবুত করার প্রয়াস পায়। সেই কোন আমলে আত্মীয়তা ছিল, পূর্ব পুরুষের সেই আত্মীয়তা নির্বাচনের কারনে আবার সজীব হয়ে উঠে। তিনিটি নির্বাচনেই গোটা ইউনিয়ন এলাকায় এমনটি লক্ষ্য করা গেছে। মৌমাছি দলের প্রার্থী বা কর্মীরা প্রার্থীগনের প্রতীক নিয়ে ইউনিয়ন ব্যাপী সভা-সমাবেশের আয়োজন করার পাশা-পাশি শ্রেণী ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার জন্য ইউনিয়নের সর্বত্র স্ব স্ব শ্রেণীর লোকদের মাঝে বুঝা-পড়া অব্যাহত রাখে।অপরদিকে, সমাজের সাধারন মানুষ তথা নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বিত্ত-হীনরা জোনাকি দলের পতাকা তলে সমবেত হয়। তারাও অনুরূপ বুঝা পড়া এবং সভা -সমাবেশ আয়োজন করে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালায়। মৌমাছি দল অনেক ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর উপর নানাভাবে প্রভাব খাটাতে পারে। কেননা, তারা বিত্তবান । আর এদিক থেকে নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীনরা তাদের কাছে জিম্মি । নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোকই অহরহ তাদের দ্বারে ধরনা দিয়ে ফিরে হয় শ্রম বিক্রির জন্য, নয়তো কোনভাবে সাহায্য পাওয়ার জন্য। তাদের এই দুর্বলতার কারনে তারা সাধারনতঃ নির্বাচনে উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে সমর্থন না দিয়ে পারে না। স্বশ্রেণীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করার ইচ্ছা থাকলেও নিম্ন শ্রেণীর এসব লোক তাদের সমর্থন উচ্চবিত্তের প্রতিই ব্যক্ত করে থাকে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

382780

Dhaka University Institutional Repository

দু'টি দলের প্রত্যেক প্রার্থীই প্রত্যেক গ্রাম থেকে বিশ্বস্ত যুবকদের কর্মী হিসাবে বেছে নেয়। মেম্বার নির্বাচনের বেলায় গোপন একটা কৌশল অবলম্বন করা হয়। আর তা হলো- ওয়ার্ড প্রতি তিনজন প্রার্থীর মধ্যে গোপনভাবে মৌখিক অংগীকার হয় এই বলে যে, একে অপরকে তার বিশ্বস্ত ভোটগুলো অবশ্যই দিবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এরূপ গোপন অংগীকারের ফলাফল বিপরীত ঘটে থাকে। বিশেষ করে চেয়ারম্যান নির্বাচনকে অনুকূলে রাখার জন্যই এরূপ গোপন চুক্তি হয়ে থাকে। দেখা গেছে, বিপক্ষ দলের মেম্বারের সাথেই সাধারনতঃ এরূপ চুক্তি হয়ে থাকে এবং এটা বুঝতে অক্ষম হলেই বিপক্ষ দলের কাছে হার মানা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। মৌমাছি দলের তরফ থেকে জোনাকি দলের প্রার্থীর সাথে এরূপ গোপন চুক্তি তিনটি নির্বাচনেই হয়েছিল এবং জোনাকি দলের প্রার্থীরা এব্যাপারে বেশ সজাগ ছিল বলে মৌমাছি দল তাদের কাবু করতে পারেনি। আর তাই প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জোনাকি দল তার প্রার্থীদের বিজয়ী করতে সক্ষম হয়েছিল।

ভোটারদের কাছে সরাসরি ভোট চেয়ে উভয় দলের কর্মীরাই রাতদিন তাদের বাড়ী বাড়ী ধরনা দেয়। অপরদিকে, প্রার্থীগন নিজেরাও রাতের বেলা ভোটারের বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্ব স্ব সুনিশ্চিত বিজয়ের কথা ভোটারদের কানে দিয়ে আসে— ভোটার যাতে বুঝতে পারে যে, প্রার্থী বেশ একটা উল্লেখযোগ্য অবস্থানে আছে। ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচন-সমূহে এমন সব কৌশল অবলম্বন করে উভয় দলই স্ব স্ব প্রার্থীদের বিজয় সুনিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু ভোটারদের অবস্থান থেকে কেউই তাদের বিচ্যুত করতে পারেনি। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্ব স্ব শ্রেণীকে তারা সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে প্রত্যেক শ্রেণীর মাঝেই এমনি শ্রেণী চেতনা দেখা গেছে। তবে পরবর্তী কোন কোন নির্বাচনে শ্রেণী চেতনায় কিছুটা হেরফের লক্ষ্য করা যায়।

মৌমাছি দলের প্রার্থীরা ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদ নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিল। তারা চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে জনমত আকৃষ্ট করার জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটা করে সমাবেশের আয়োজন করে। এই পদটি দখলের জন্য মৌমাছি দল চেয়ারম্যান পদ প্রার্থীর গুন-গ্রাহী জনদের জড়ো করার পাশাপাশি তাদের আত্মীয়-স্বজনদের অকুন্ঠ সমর্থন লাভের জন্য গুনগ্রাহীদের নিয়োগ করা হয়। দেখা গেছে, মৌমাছি দলের প্রার্থীর সরাসরি আত্মীয়তা অত্র ইউনিয়নের মাত্র ৪টি গ্রামে আছে। অথচ নির্বাচনকে সামনে রেখে সব ক'টি গ্রামেই আত্মীয় খুঁজে ফেরা হয়েছে। ভাইস-চেয়ারম্যান পদের বেলায়ও মৌমাছি দল একই পন্থা অবলম্বন করে। উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের তিনটি ওয়ার্ডে আয়োজিত তিনটি সমাবেশের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডের

Dhaka University Institutional Repository

বুরগী হাই স্কুল ময়দানে আয়োজিত মৌমাছি দলের সমাবেশটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, মৌমাছি দলের চেয়ারম্যান পদ প্রার্থীর নিজস্ব এলাকায় আয়োজিত এই সমাবেশ ছিল বেশ গুরুত্ব-পূর্ণ। বিশেষ উদ্দেশ্যে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। এলাকায় যারা বিরোধী ছিল তাদের দেখিয়ে দেওয়া যে, এলাকার পুটি কতক লোকই কেবল জোনাকি দলের সমর্থক। অপরদিকে, জোনাকি দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীকে হেয় প্রতিপন্ন করাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। নির্বাচনের মাত্র তিন চার দিন আগে আয়োজিত এই সমাবেশে মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ীসহ সমাজের অপেক্ষাকৃত বিত্তবানরা হাজির হয়। সমাবেশে মৌমাছি দলের প্রার্থীর অতীতের কৃতিত্বপূর্ন কার্যকলাপের কিরিস্তি তুলে ধরার পাশা-পাশি জোনাকি দলের প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে নানাবিধ কুৎসা রটানো হয়। স্থানীয় সর্বশ্রেণীর লোক সমাবেশে হাজির হলেও জোনাকি দলীয় প্রার্থীর নিজস্ব গ্রাম ও এলাকার কতিপয় ব্যক্তিই অংশ নিয়েছিল। তারা উপস্থিত জনতাকে এমন সব কথা শুনিয়েছিল, যা শুনে জোনাকি দলীয় প্রার্থীর প্রতি উপস্থিত জনতার ঘৃণা জন্মাত। কিন্তু সমাবেশেই বিপরীত ফল ফলে যায়। এমন কুৎসার বিরুদ্ধে সমাবেশেই প্রতিবাদ উঠে। পরে জানা গেছে, কুৎসা রটনাকারীরা সত্যিকার অর্থেই জোনাকি দলের চেয়ারম্যান প্রার্থী কর্তৃক তার চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে নির্যাতিত হয়েছে। এমনকি তাদের কয়েকবার থানা পুলিশেও যেতে হয়েছে। তবে এরূপ হওয়ার কারন ছিল- তারা ছিল এলাকার সুপরিচিত চোর এবং চুরির শাস্তি হিসেবেই তাদের ভাগ্যে এসব জুটেছিল। এসমাবেশে আনুষ্ঠানিকতার বিষয়টি বেশ জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। উল্লেখ্য, দুই প্রতিদ্বন্দ্বির আবাস-স্থলের দুরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার।

মৌমাছি দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থী স্বীয় সমর্থকের পাল্লা ভারী করার জন্য এমন সমাবেশের আয়োজন করলেও গোটা কর্মসূচীর ফলটাই তার বিপক্ষে চলে যায়। বিরোধীরাও এই সুযোগটা বিশেষভাবে কাজে লাগায়। গ্রামীন নির্বাচনে সামান্য দোষ-ত্রুটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক বড় করতে অল্প সময় লাগে। এই সমাবেশের পর মৌমাছি দলের চেয়ারম্যানের নামে এমন সব কথা- বার্তা ও গুজব ছড়ায় যার বিন্দু মাত্রও সমাবেশে আলোচনা হয়নি। গুজব ছড়ায় যে, মৌমাছি দলের প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হলে তার বিরোধীদের এদেশ থেকে সমূলে উচ্ছেদ করা হবে। আরও গুজব ছড়ায় যে, মৌমাছি দলের প্রার্থী চোরদের নিয়ে দল পাকিয়েছে এবং তাদের ভোটই নাকি তার বিজয়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। নির্বাচন সময়ে অনেক ধরনের গুজব নির্বাচনকে বিশেষ-

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বিরোধী পক্ষ এই সমাবেশটাকে বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাবার সুযোগ পায়।

অপরদিকে, জোনাকি দলের পক্ষ থেকেও অনুরূপ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। দলীয় চেয়ারম্যানের পক্ষে জনমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক সমাবেশের আয়োজন করে। এসব সমাবেশে তারা চেয়ারম্যান প্রার্থীর বিগত অধ্যায়ের সাফল্য তুলে ধরে এবং বিরোধী পক্ষকে কাবু করার জন্য জমিদার আমলের অনেক শোষণ ও নির্যাতনের ইতিহাসও তুলে ধরে। তাছাড়া, মৌমাছি দলের চেয়ারম্যানের আমলের প্রসংগ টেনে বলা হয় যে, তার আমলে ইউ-নিয়নের কোন উন্নয়নই হয়নি। নানান মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সাধারন মানুষ আর বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। অতি পরিচিত কয়েকটি ঘটনায় শিকার ব্যক্তিদের নামও প্রতিটি সমাবেশে উল্লেখ করা হয়। এমনকি জনগনকে সতর্কও করে দেওয়া হয়, এবার ভুল করলে প্রত্যেককেই একবার না একবার জেলে যেতে হবে।

১৯৭৩ সনের নির্বাচনে জোনাকি দলেরই মেম্বার প্রার্থী ছিল সর্বাধিক। তিনটি ওয়ার্ডে মোট ১২ জন মেম্বার প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। এরূপ মনোনয়নের পিছনে বেশ একটা কূটচাল রয়েছে। প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন প্রার্থী মনোনীত করার পর স্থান ভেদে অতিরিক্ত প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। যেখানে মৌমাছি দলীয় প্রার্থীর অবস্থান বেশ মজবুত ছিল, অর্থাৎ তার বিজয় সুনিশ্চিত, সেখানে জোনাকি দল একাধিক প্রার্থী মনোনীত করে মৌমাছি দলীয় প্রার্থীর বিজয় প্রতিহত করার পথ বেছে নিয়েছে। দেখা গেছে, প্রত্যেক গ্রাম থেকে এমন সব ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যারা জনগনের সাথে বেশ সুপরিচিত এবং তাদের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি স্ব স্ব শ্রেণীর উপর তাদের মোটামুটি প্রভাবও রয়েছে। মৌমাছি দলের পক্ষ থেকেও এমন সব প্রার্থী মনোনীত করা হয় যারা স্ব স্ব শ্রেণী ছাড়াও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর উপরও ক্ষেত্র বিশেষে প্রভাব খাটাতে পারে। মধ্যবিত্ত এনির্বাচনে উচ্চবি-ত্তকে সমর্থন দেওয়ায় উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের মেম্বার প্রার্থীদের পক্ষে সমর্থন জানায়।

নির্বাচনের পূর্বদিন পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে যে, জোনাকি দলের জয় সুনিশ্চিত। কেননা, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। তারা তাদের সমর্থন অনেকটা প্রকাশ্যভাবেই জোনাকি দলের প্রতি ব্যক্ত করেছে। ফলে মৌমাছি দল বেশ আতংকিত হয়ে পড়ে। কেননা,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৪ সনের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর এই নির্বাচন ছিল আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সমাজের দন্তমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিম্ন শ্রেণীর লোকের কাছে উক্ত নির্বাচনে হেরে যাওয়াকে তারা মেনে নিতে পারেনি। তাই যে কোন মূল্যে ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে জয় লাভ করতে তারা বদ্ধপরিকর ছিল। দীনমজুর গোচের লোকেরা নেতৃত্বে আসবে, তাদের সামনে মুরব্বিয়ানা করবে- এমনটি তাদের কাছে সহ্য করার মত ছিল না। আর তাই এই নির্বাচনকে তারা আপন অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহন করে। অপরদিকে, নিম্নবিত্ত শ্রেণী এই নির্বাচনকে বিরাট একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহন করে। কেননা, এতকাল তারা স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথমবারের মত স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ তারা পায়। ফলে গ্রামে দলাদলির মাত্রা আগের তুলনায় আরও বেড়ে যায়। জমিদারী হারিয়েও যারা এতদিন ধরে প্রবল প্রতাপে সমাজকে ওলট-পালট করছিল, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে তাদের সেই প্রভাবে ভাটা পড়ে যায়। কারন, স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তারা পাকিস্তানের সমর্থক এবং শান্তি কমিটির সদস্য ছিল। অপরদিকে, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। ফলে সমাজে তারা একটা বিশেষ আসন লাভ করে। একথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানকার উচ্চবিত্ত শ্রেণী পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেও এবং শান্তি কমিটির সাথে জড়িত থাকলেও তাদের দ্বারা অত্র এলাকার কোন রকম ক্ষতি সাধিত হয়নি। তবে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থনের কারনে তাদের প্রবল প্রতাপ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধ কেবল দেশের স্বাধীনতাই আনেনি, সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এর ফলেই নিম্নবিত্ত শ্রেণীগুলো সামাজিক মর্যাদা লাভ করে। এমনকি শীর্ষ শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হওয়ারও অভূতপূর্ব সুযোগ তারা পায়।

১৯৭৩ সনের নির্বাচনে উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নে সংঘটিত ঘটনাবলী স্বাধীন দেশের প্রথম নির্বাচন ইতিহাসকে কলংকিত করেছে, বলা চলে। কেননা, নির্বাচনের দিন জনগন ভোট দানের জন্য সানন্দে ভোট কেন্দ্রে সমবেত হয়। সকাল থেকে এগারটা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট চলছিল। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তেই শুরু হয় অপ্রীতিকর ঘটনা। মৌমাছি দলের লোকেরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রথমে ভোট আদায়ের চেষ্টা চালায়। উপস্থিত ভোটাররা তাতে প্রতিবাদমুখী হয়ে উঠে। ফলে নিরাশ হয়ে তারা নতুন পন্থা বেছে নেয়। অল ইউনিয়নের সব ক'টি কেন্দ্রেই তারা প্রশাসনকে হাত করে নেয়। এরপর শুরু হয় ইচ্ছা মাফিক ভোট গ্রহন। মৌমাছি দলের কথা মত ভোট গ্রহনে নিয়োজিত কর্মকর্তারা ভোট গ্রহন করতে শুরু করে। ভোট কেন্দ্র থেকে জোনাকি দলের এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়। মৌমাছি

Dhaka University Institutional Repository

দলের লোকেরা ভোট কেন্দ্র দখল করে নিয়ে ভোটারদের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়ে মৌমাছি দলের প্রার্থীর পক্ষে একতরফাভাবে ভোট দিতে শুরু করে। জোনাকি দলের ক্ষুব্ধ সমর্থকগন এপরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানালেও প্রশাসন তার নিরপেক্ষ ভূমিকায় ফিরে আসেনি। ফলে জোনাকি দলের সমর্থকরা সংঘবদ্ধ হয়ে নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করে এবং মৌমা -ছি দলের সমর্থকদের হটানোর চেষ্টায় চালায়। এমনি পরিস্থিতিতে নির্বাচনী কর্মকর্তা বেলা আড়াইটার দিকে নির্বাচন স্থগিত ঘোষনা করে। মৌমাছি দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীর নিজস্ব কেন্দ্রে এভাবে নির্বাচন স্থগিত হওয়ার খবর মুহূর্তের মধ্যেই অন্যান্য কেন্দ্রে পৌছে যায় এবং একইভাবে সেসব কেন্দ্রের নির্বাচনও স্থগিত হয়ে যায়।প্রশাসন তার নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন করে মৌমাছি দলকে সক্রিয় সহযোগিতা করায় উক্ত দল অত্র ইউনিয়নের তিনটি কেন্দ্রেই নির্বাচনে এহেন পরিবেশ সৃষ্টির সাহস পায়।

তিনটি কেন্দ্রেই নির্বাচন স্থগিত হওয়ার পর ব্যালট বাক্সগুলো সীল করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনদিন পর আকস্মিকভাবে অন্যান্য প্রার্থী বা তাদের এজেন্ট-দের না ডেকেই একমাত্র মৌমাছি দলের চেয়ারম্যান পদ প্রার্থীর উপস্থিতিতে ভোট গননা করে মৌমাছি দলের প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষনা করা হয়। নির্বাচনে এরূপ কারচুপি এবং প্রশাসনের পক্ষপাত ভূমিকার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আদালতে মামলাও রুজু হয়। প্রশাসনের ভূমিকা নিরপেক্ষ থাকলে নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ন বিপরীত হত বলে জোনাকি দলের চেয়ারম্যান প্রার্থী জানিয়েছেন।

১৯৭৩ সনের এই নির্বাচনে মোট ৮৬ ভাগ ভোট গ্রহনের হিসেব দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, ৩৬ ভাগ ভোট কারচুপির মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে। ভোট কারচুপির আগে ৪০ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছিল। এই ৪০ ভাগের ২০ ভাগ ভোট পড়েছিল জোনাকি দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে। বাকী ২০ ভাগ ভোট পড়েছিল অপর তিনজন প্রার্থীর পক্ষে। ৪০ ভাগ ভোট পর্যন্ত প্রতিটি ব্যালটেই একজন ভোটারের ৫ টি করে ভোট পাওয়া গেছে। কিন্তু পরবর্তী ব্যালটগুলোতে ২টি বা ৩টি ভোটের বেশী পাওয়া যায়নি। এমনকি অনেক ব্যালটে কেবলমাত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী তথা মৌমাছি দলের প্রার্থীকেই ভোট দিতে দেখা গেছে।[৪] উল্লেখ্য, এনির্বাচনে একজন ভোটারের ৫টি ভোট দানের অধিকার ছিল। প্রত্যেক ভোটার চেয়ারম্যানকে ১টি, ভাইস-চেয়ারম্যানকে ১টি এবং তিনজন মেম্বারকে ৩টি ভোট প্রদান করত। থানায় নেওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

পরও প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় ব্যাপক ভোট কারচুপি হয়েছে বলে জোনাকি দলের চেয়ারম্যান প্রার্থী জানিয়েছে।

১৯৭৩ সনের নির্বাচনে জোনাকি দলের চেয়ারম্যানকে কারচুপির মাধ্যমে পরাজিত করা হলেও তার দলীয় ৬ জন মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে। অপরদিকে, মৌমাছি দল বাকী ৩টি মেম্বার পদ লাভ করেছে।[৫] উল্লেখিত নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক প্রার্থী ছিল নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। ৩·১ সারনীতে উল্লেখিত নির্বাচনে দু'টি ইউনিয়নের মেম্বার প্রার্থীদের তালিকা প্রদর্শিত হয়েছে। তালিকায় প্রদর্শিত তথ্য মতে দেখা যায়, ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে ইউনিয়ন

সারনী নং-৩·১ : ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে মেম্বার প্রার্থীর তালিকা[৬]

ওয়ার্ড নং	ইউনিয়ন (পৌরাটী)	প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যা নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত	মোট	নির্বাচিত মেম্বার নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত
১ নং	উত্তর	৮	২	২	১২	২	১	X
২ নং	উত্তর	৬	৩	২	১১	১	২	X
৩ নং	উত্তর	৮	২	২	১২	৩	X	X
১ নং	দক্ষিণ	৭	৩	৩	১৩	৩	X	X
২ নং	দক্ষিণ	১	২	২	১৩	২	১	X
৩ নং	দক্ষিণ	৯	২	২	১৩	২	১	X
		৪৭	১৪	১৩	৭৪	১৩	৫	X

দুইটিতে ১৮টি মেম্বার পদের জন্য নিম্নবিত্ত প্রার্থীর সংখ্যা মোট ৪৭। এদের ১৩ জনই নির্বাচিত হয়েছে। এসময়ে মধ্যবিত্ত প্রার্থীর সংখ্যা ১৪ জন। তন্মধ্যে ৫ জন প্রার্থী জয় লাভ করেছে। আর এই নির্বাচনে উচ্চবিত্তের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৩। এদের কেহই নির্বাচিত হতে পারেনি। এই নির্বাচনে মোট ৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত থেকেই ১৮ জন নির্বাচিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এসময় চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী মনোনীত করলেও মেম্বার ও ভাইস-চেয়ারম্যান পদের বেলায় উচ্চবিত্তের সমর্থন আদায় করে এবং চেয়ারম্যান পদে উচ্চবিত্তকে সমর্থন দান করে।

সারনী নং-৩·২ : ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি ও নির্বাচিত মেম্বারদের তালিকা[৭]

ওয়ার্ড নং	ইউনিয়ন (পৌরাটী)	প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যা নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত	মোট	নির্বাচিত মেম্বার নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত
১ নং	উত্তর	৬	৩	৩	১২	১	১	১
২ নং	উত্তর	৭	২	৩	১২	২	১	X
৩ নং	উত্তর	৭	৩	২	১২	৩	X	X
১ নং	দক্ষিণ	৬	৩	৩	১২	৩	X	X
২ নং	দক্ষিণ	৮	৪	৩	১৫	২	১	X
৩ নং	দক্ষিণ	৭	৩	৩	১৩	২	X	১
		৪১	১৮	১৭	৭৬	১৩	৩	২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ সনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি ও নির্বাচিত মেম্বারদের তালিকা ৩.২ সারনীতে দেখানো হয়েছে। তথ্য মতে দেখা যায়, এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর মোট সংখ্যা ৭৬। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনের ন্যায় এনির্বাচনেও শ্রেণী প্রতিনিধিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর প্রতীয়-মান হয়েছে। সমাজের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ – প্রত্যেক শ্রেণীই গ্রামীন রাজনীতিতে স্ব স্ব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের গ্রামীন রাজনীতি গ্রামের জন -গনের দিন দিন রাজনৈতিক সচেতনতা দান করছে – ইউনিয়ন পরিষদের এই নির্বাচনগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের দলগত অবস্থান আলোচনায় আমরা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাব। পৃথক অধ্যায়ে এতদসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি ৭৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মোট ৪১ জন প্রার্থী নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে মনোনীত। একই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রার্থী হলো ১৮ জন। আর উচ্চবিত্তের প্রার্থী ছিল এসময়ে ১৭ জন। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের প্রার্থী সংখ্যা এনির্বাচনে গত নির্বাচনের তুলনা-য় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত নির্বাচনে তাদের প্রার্থী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪ ও ১৩ (৩.১ নং সারনী অনুযায়ী)। মধ্যবিত্ত শ্রেণী গত নির্বাচনের ন্যায় এনির্বাচনেও উচ্চবিত্তের পক্ষাবলম্বন করেছে। কিন্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণী গত নির্বাচনের তুলনায় এনির্বাচনে ৬ জন প্রার্থী কম মনোনীত করেছে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, নিম্নবিত্তের ১৩ জন, মধ্যবিত্তের ৩ জন এবং উচ্চবিত্ত -র ২ জন মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের এই ফলাফল নিজেদের মাঝে বুঝা-পড়ারই ফলশ্রুতি। এই নির্বাচনে কম প্রার্থী মনোনীত করেও নিম্নবিত্ত শ্রেণী তার পূর্বের অবস্থা -ন বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ গত নির্বাচনের ন্যায় এনির্বাচনেও তারা ১৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। বাকী ৫টি আসন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ নির্বাচনে উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে দু'টি মেম্বার পদ ছেড়ে দেয়।

৩.৩ নং সারনীতে ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি ও নির্বাচিত মেম্বারদের

সারনী নং – ৩.৩ : ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে মেম্বার প্রার্থীর তালিকা[৮]

ওয়ার্ড নং	ইউনিয়ন (গোষ্ঠী)	প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যা			মোট	নির্বাচিত মেম্বার		
		নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত		নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত
১ নং	উত্তর	৭	৩	৪	১৪	২	১	X
২ নং	উত্তর	৮	৩	২	১৩	২	১	X
৩ নং	উত্তর	৫	২	২	১১	৩	X	X
১ নং	দক্ষিণ	৯	৪	৩	১৬	২	১	X
২ নং	দক্ষিণ	৮	৪	৩	১৫	৩	X	X
৩ নং	দক্ষিণ	৭	৩	২	১২	২	১	X
		৪৬	১৯	১৬	৮১	১৪	৪	X

Dhaka University Institutional Repository

তালিকা দেখানো হয়েছে। দেখা যায়, এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যা ৮১ জন। তন্মধ্যে নিম্নবিত্তের ৪৬ জন, মধ্যবিত্তের ১৯ জন এবং উচ্চবিত্তের ১৬ জন প্রার্থী। এ নির্বাচনে উচ্চবিত্তে-র কোন প্রার্থীই মেম্বার নির্বাচিত হতে পারেনি। অবশ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৪টিতে জয়ী হতে সক্ষম হয়েছে। দেখা গেছে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখনই বেশ তীব্র হয় তখনই উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে সমর্থন বিনিময়ের একটা সেতু রচিত হয়। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে দু'টি ইউনিয়নেই চেয়ারম্যান পদ নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষিতেই উচ্চবিত্ত শ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মেম্বার পদ ছেড়ে দিয়ে চেয়ারম্যান পদ রক্ষার প্রয়াস পায়। অবশ্য এই প্রচেষ্টায় তারা আংশিকভাবে সফল হয়েছে, যা চেয়ারম্যান প্রতিদ্বন্দ্বি সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করা হবে। এই নির্বাচনে নিম্নবিত্ত শ্রেণী গত দু'টি নির্বাচনের চেয়ে ১টি মেম্বার পদ বেশী লাভ করেছে। অর্থাৎ এ নির্বাচনে তারা ১৪ জন মেম্বার নির্বাচিত করতে সক্ষম হয়েছে।

৩.৪ নং সারণীতে ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি ও নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যানদের তালিকা প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শিত উক্ত তালিকা মতে দেখা যায়, মোট

সারণী নং-৩.৪ : ভাইস-চেয়ারম্যান প্রার্থীর তালিকা[৯]

নির্বাচন বর্ষ	ইউনিয়ন (গৌহাটী)	প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যা নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত	মোট	নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত
১৯৭৩	উত্তর	১	২	১	৪	X	১	X
১৯৭৩	দক্ষিণ	২	২	১	৫	X	১	X
		৩	৪	২	৯	X	২	X

৯ জন প্রার্থী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনীত হয়। ভাইস-চেয়ারম্যান পদের জন্য নিম্নবিত্ত শ্রেণী তাদের ৩ জন প্রার্থী মনোনীত করতে সক্ষম হয়েছে। দু'টি ইউনিয়নে দু'জন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য তাদের এই সংখ্যক প্রার্থী মনোনীত করা মেম্বার প্রার্থীর তুলনায় অতি নগন্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ নির্বাচনে তাদের ৪ জন প্রার্থী মনোনীত করেছে। আর এই সংখ্যা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় কিছুটা বেশী। অপরদিকে, ভাইস-চেয়ারম্যানপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উচ্চবিত্ত শ্রেণী তাদের ২ জন প্রার্থী মনোনীত করেছে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, ভাইস-চেয়ারম্যান দু'টোতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী জয় লাভে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী উচ্চবিত্তের সমর্থন লাভ করার পাশাপাশি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনও কিছুটা পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। আর তাই দু'টি ইউনিয়নেই তারা জয় লাভ করেছে।

১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি ও নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ৩'৫ নং সারনীতে পেশ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সনে অনুষ্ঠিত উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এই নির্বাচনে অত্র ইউনিয়নে গোলযোগ হলেও দক্ষিণ গৌহাটী ইউনিয়নে শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সারনীতে প্রদর্শিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা

সারনী নং - ৩'৫ : চেয়ারম্যান প্রার্থীর তালিকা[১০]

নির্বাচন বর্ষ	ইউনিয়ন (গৌহাটী)	প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যা নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত	মোট	নির্বাচিত চেয়ারম্যান নিম্নবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চবিত্ত
১৯৭৩	উত্তর	১	১	২	৪	X	X	১
১৯৭৩	দক্ষিণ	১	২	১	৪	X	X	১
১৯৭৭	উত্তর	২	১	১	৪	১	X	X
১৯৭৭	দক্ষিণ	২	২	২	৬	X	X	১
১৯৮০	উত্তর	২	১	১	৪	১	X	X
১৯৮৪	দক্ষিণ	১	২	২	৫	X	X	১
		৯	৯	৯	২৭	২		৪

যায়, ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে ইউনিয়ন দু'টিতে মোট ৮ জন প্রার্থী রয়েছে। এদের মধ্যে নিম্নবি -ত্ত শ্রেণীর ২ জন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ৩ জন এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ৩ জন প্রার্থী রয়েছে। এ নির্বাচ -নে নিম্নবিত্ত শ্রেণী তাদের প্রার্থী মনোনয়নে অপারগ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, প্রতি পক্ষকে পরাস্ত করার যে কূট চাল তারা মেম্বার মনোনয়নের ব্যাপারে খেলেছিল , এক্ষেত্রে তারা তা করতে পারেনি। এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল অর্থনৈতিক ব্যাপার। একটা ওয়ার্ডে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য যে পরিমান অর্থের দরকার, তার অনেক গুন বেশী অর্থের দরকার পড়ে ইউনিয়ন ব্যাপী নির্বাচন করতে। এজন্যই নিম্নবিত্ত শ্রেণী জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহন থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে কোন ইউনিয়নের নিম্নবিত্ত শ্রেণী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেহই চেয়ারম্যান পদে জয়ী হতে পারেনি। দু'টি ইউনিয়নেই চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে উচ্চবিত্ত শ্রেণী অপর দুই শ্রেণীর উপর তাদের প্রভাব খাটাতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সনের নির্বা -চনে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। দেখা যায়, এই নির্বাচনে মোট ১০জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মনোনীত প্রার্থী ৪জন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মনোনীত প্রার্থী ৩জন করে। গত নির্বাচনের তুলনায় নিম্নবিত্ত শ্রেণী এই নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। অপর দুই শ্রেণীর প্রার্থী মনোনয়নে এ নির্বাচনে আগের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়নি। অর্থাৎ এ নির্বাচনে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী গত নির্বাচনের সমান সংখ্যক প্রার্থী মনোনীত করেছে। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, উত্তর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মনোনীত প্রার্থী জয়লাভ করে। কিন্তু দক্ষিনইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মনোনীত প্রার্থী তথা গত নির্বাচনে নির্বাচিত চেয়ারম্যানই পুনরায়

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হন।

অপরদিকে, ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে দু'টি ইউনিয়নে মোট চেয়ারম্যান প্রার্থী সংখ্যা ২৭। এদের মধ্যে নিম্নবিত্তের ৩, মধ্যবিত্তের ৩ এবং উচ্চবিত্তের ৩। এই নির্বাচনে উত্তর গৌহাটীতে ১৯৭৭সনে নির্বাচিত চেয়ারম্যানই পুনরায় নির্বাচিত হয়েছে। উত্তর গৌহাটীর চেয়ারম্যান পদটি তাই নিম্নবিত্তের দখলে থেকে যায়। কিন্তু দক্ষিণ গৌহাটীতে এই নির্বাচনে নতুন চেয়ারম্যান হলেও নির্বাচিত ব্যক্তি উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে নির্বাচিত হয়েছে। দু'টি ইউনিয়নের তিনটি নির্বাচনে ৬ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে কেবলমাত্র উত্তর গৌহাটীতেই নিম্নবিত্ত শ্রেণী চেয়ারম্যানরা দু'টি পদ দখল করতে সক্ষম হয়েছে। বাকী ৪টি পদ উচ্চবিত্তের হাতেই থেকে যায়।

১৯৭৩ সনে গৃহীত ভোটের চূড়ান্ত[১১] হিসাবে দেখা যায়, এ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের পক্ষে ৮৬ ভাগ, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রার্থীদের পক্ষে ৮০ ভাগ, এবং মেম্বার প্রার্থীদের পক্ষে ৮৫ ভাগ ভোট পড়েছে। চেয়ারম্যান প্রার্থীরা প্রাপ্ত ভোটের ৩৫ ভাগ নিম্নবিত্ত, ৬ ভাগ মধ্যবিত্ত এবং ৪৫ ভাগ উচ্চবিত্ত পেয়েছে। ভাইস-চেয়ারম্যান প্রার্থীদের ভাগে পড়েছে- নিম্নবিত্ত ৩৭ ভাগ, মধ্যবিত্ত ৩৯ ভাগ এবং উচ্চবিত্ত ৪ ভাগ। অপরদিকে, মেম্বার প্রার্থীরা পেয়েছে - নিম্নবিত্ত ৪৫ ভাগ, মধ্যবিত্ত ৩২ ভাগ এবং উচ্চবিত্ত ৮ ভাগ। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের চূড়ান্ত[১২] হিসেবে দেখা যায়, এ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের পক্ষে ৯৬ ভাগ, এবং মেম্বার প্রার্থীদের পক্ষে ৯৫ ভাগ ভোট গৃহীত হয়েছে। প্রাপ্ত ভোটের ৪২ ভাগ নিম্নবিত্ত, ১৪ ভাগ মধ্যবিত্ত এবং এবং ৪০ ভাগ উচ্চবিত্ত পেয়েছে। একইভাবে ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের পক্ষে ৯৭ ভাগ ভোট এবং মেম্বার প্রার্থীদের পক্ষে ৯৩ ভাগ ভোট গৃহীত হয়েছে। প্রাপ্ত ভোটের ৪৪ ভাগ নিম্নবিত্ত, ১০ ভাগ মধ্যবিত্ত এবং ৪৩ ভাগ উচ্চবিত্তের চেয়ারম্যান প্রার্থীরা পেয়েছে। অপরদিকে, প্রাপ্ত ভোটের ৫০ ভাগ নিম্নবিত্ত, ৩০ ভাগ মধ্যবিত্ত এবং ১৩ ভাগ উচ্চবিত্তের মেম্বার প্রার্থীরা পেয়েছে।[১৩]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ১২ জন এলিট ১৯৭৭ সালে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছে। এদের মধ্যে ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ২ জন ভাইস-চেয়ারম্যান রয়েছে। ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে ভাইস-চেয়ারম্যান পদ বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৭৭ সনে পুনরায়

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত এই ১২ জনের ৪ জন এবং ১৯৭৭ সনের নতুন নির্বাচিতদের ৪ জন ১৯৮৪ সনে পুনরায় নির্বাচিত হয়। জানা যায়, ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে অত্র গবেষণা পরিচালনার সময় পর্যন্ত উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান স্বীয় পদে বহাল আছে। একইভাবে ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে পরাজিত হলেও পরবর্তী নির্বাচনে দক্ষিণ গৌহাটী ইউনিয়নের ১৯৭৩ ও ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত চেয়ারম্যান পুনরায় নির্বাচিত হয় এবং গবেষণা চলাকালীন সময় পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল আছে।

১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে [১৪] শ্রেণী চেতনা, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, অন্ধ বিশ্বাস, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে কাজ করেছে। অতীতের জ্বলন্ত স্মৃতি নিয়ে ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে ভোটাররা অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেবল জমিদার শ্রেণীই নয়, গোটা উচ্চবিত্ত শ্রেণীই নানাভাবে শোষণ নির্যাতন চালাত। প্রতিবাদের ভাষা তখন তাদের ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পর পর কয়টি নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তাই তিনটি নির্বাচনেই উচ্চবিত্ত শ্রেণী মোটমুটি-ভাবে পরাজয়ের গ্লানি বহন করেছে। নির্বাচন তিনটিতে একথাই প্রমানিত হয়েছে যে, তাদের প্রতিপত্তি যাহাই থাকুক না কেন, আগের সেই প্রভাবের দিন আর নেই। সাধারন মানুষ স্ব স্ব শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ যতই অনুভব করছে, সমাজে উচ্চবিত্তের প্রভাব ততই হ্রাস পাচ্ছে। নতুন চেতনায় জেগে উঠা মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রতি তাদের প্রকাশ্য ক্ষোভ দেখিয়েছে, বলা চলে। সমাজের সংখ্যা লঘিষ্ঠ উচ্চবিত্ত শ্রেণীটি কম সংখ্যক প্রার্থী মনোনী-ত করে আগের প্রভাব খাটিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিল। অপরদিকে, আজকাল নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মাঝে নেতৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতা এতদূর গড়িয়েছে যে, ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের মোট ৬২ টি পদের জন্য ১৪৬ জন প্রার্থীকে তারা মনো-নয়ন দিয়েছিল। এদের মধ্যে ১৩৪ জনই ছিল মেম্বার প্রার্থী। বাকী ১২ জনের ৩ জন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ৯ জন চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী ছিল। এ সময়ে মধ্যবিত্তের প্রার্থী সংখ্যা ছিল মোট ৬৪ জন। তন্মধ্যে ৫১ জন মেম্বার, ৪ জন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ৯ জন চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী ছিল। আর উচ্চবিত্তের মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৫৭ জন। এদের ৪৬ জন মেম্বার, ২ জন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ৯ জন চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী ছিল।

ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দও অনেক সময় নির্বাচনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকে। সময়ে সময়ে অন্ধ বিশ্বাসও নির্বাচনের উপর প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই এই অন্ধ বিশ্বাসের প্রবনতা বেশী। একজন মেম্বার প্রার্থীকে পাশ করানোর মত ভোট ধরাক্ক থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রামের মেম্বার প্রার্থী জয় লাভ করতে পারেনি। কারণ, প্রার্থীকে গ্রামের জনগন পছন্দ করেনি। আর এজন্য নিজের গ্রামের প্রার্থীর বদলে নিজেদের পছন্দ -সই অন্য গ্রামের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিঘ্ন ঘটা এবং গ্রাম্য ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষ এরূপ ব্যক্তিগত অপছন্দের কারন। অপরদিকে, আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নটি চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রেই বেশীর ভাগ প্রযোগ করা হয়েছে। ইউনিয়নদ্বয়ের মোট ৩৪টি গ্রামের মধ্যে প্রতিটি নির্বাচনে মাত্র দুইজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতে গিয়ে ভোটাররা সাধারনত: প্রার্থীর অতীত কার্যকলাপকেই পর্যালোচনা করেছে বেশী। আর এই সুযোগে অর্থাৎ জনগনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতার মোড়ক তুলে অতীতকে ঢেকে দেওয়ার জন্য চেয়ারম্যান প্রার্থীরা সুযোগ মত আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্ন তুলে দিয়ে নিজ নিজ এলাকার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহবান জানায়। এলাকার চেয়ারম্যান এলাকারই গৌরব বহন করবে- এমন কথা-বার্তা বলেও ভোটারদের আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালানো হয়। এরূপ প্রচারনা তিনটি নির্বাচনকেই বেশ প্রভাবিত করেছিল। সাধারণতঃ বেশী ভোটার বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলোতেই এরূপ প্রশ্ন বেশ জোরে সোরে তোলা হয়। বিশেষ করে এরূপ কেন্দ্রে একজন মাত্র প্রার্থী থাকলেই এ প্রশ্নটি ভোটদের কাছে জোরালোভাবে তুলে ধরে ভোটারদের সমর্থন আদায়ের পথ বেছে নেওয়া হয়। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের ৩ টি কেন্দ্রেই এরূপপরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। কারন, প্রতি কেন্দ্রেই কেন্দ্র এলাকার একজন করে প্রার্থী ছিল। কেবল মাত্র একটি কেন্দ্রে ব্যতিক্রম ছিল।

অনেক সময় নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এমন ধারনার সৃষ্টি করা হয় যে, তাদের মধ্য থেকে কাউকে অন্ততঃ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত করা ঠিক হবে না। এমনকি মেম্বার নির্বাচিত হয়েও তারা ঠিক মত দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তাদের সেই যোগ্যতা নেই। জন্মগতভাবেই তারা নিম্ন শ্রেণীর হয়ে আসছে। সৃষ্টি কর্তা নিজে ইচ্ছা করেই তাদের তেমন উচ্চ চিন্তাশক্তির মস্ত ও মগজ দেননি। তাদের নির্বাচিত করলে দেশ ও জাতির চরম অমংগল হবে। রাজনীতি করার জন্য উচ্চ বংশের লোকেরা সৃষ্টা কর্তৃক মনোনীত হয়ে এসেছে। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে এসব প্রচারনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে দেখা যায়, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সব ক্ষেত্রে তাদের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচিত

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারেনি।

ভোটারদের কাছ থেকে ভোট আদায়ের জন্য অনেক প্রার্থী নানা রকম কলা-কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এসবের মধ্যে রয়েছে স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করা। বিশেষ করে কোন প্রার্থীর মিছিলে অংশ গ্রহনের মধ্য দিয়ে এরূপ পরিস্থিতির অবতারনা হয়ে থাকে। কোন প্রার্থীর বিশেষ অনুরোধে অপর এক প্রার্থীর সমর্থক মিছিলে অংশ নিলে তাতে প্রার্থী ও ভোটারের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। মিছিলে অংশ গ্রহনের আগে ভোটারকে প্রলোভন দেওয়া হয় যে, প্রার্থীকে ভোট না হয় না-ই দেওয়া হল- মিছিলে গেলে তো আর ভোট দানে অসুবিধা হবে না। ভোটার সরল বিশ্বাসে অংশ নেওয়ার পর উক্ত প্রার্থীর তরফ থেকেই বেশ কৌশলে প্রচার করা হয় যে, মিছিলে অংশ গ্রহন করার কারনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিপরীত পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, অথবা তাকে উক্ত দলে বিশ্বাস করা হচ্ছে না। এমনকি একানু ঘনিষ্ঠ জনদের দিয়ে মিছিলে অংশ গ্রহনকারীর স্বীয় শ্রেণীতে অবিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে কোন্দল সৃষ্টি করা হয়। ফলশ্রুতিতে মিছিলে অংশ গ্রহনকারীরা বাধ্য হয়ে উক্ত প্রার্থীর সমর্থক বনে যায়। তাছাড়া, এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শত্রুতারও সৃষ্টি হয়। নির্বাচিত হওয়ার কৌশল হিসেবে প্রার্থীরা এমন কিছু সমস্যা তুলে ধরে যা সাধারন মানুষের অতি পরিচিত এবং তারা জনগনের মাঝে এমন ধারনার সৃষ্টি করার প্রয়াস পায় যে, প্রার্থী এ নির্বাচনে জয়ী হলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। গ্রামের ভাঙ্গা চুরা মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, পুল, রাস্তা-ঘাট মেরামতের ও নির্মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমন সব প্রতিশ্রুতি তখন দেওয়া হয় যে, প্রার্থী নির্বাচনে পরাজিত হউক তাতে কিছু যায় আসে না, এ সব সমস্যা এবার সমাধান হবেই। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ সব মেরামত যোগ্য প্রতিষ্ঠানের সামনেই তারা সমাবেশের আয়োজন করে থাকে। আবার কিছুটা সামর্থবান প্রার্থী সাধারন মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়-চোপড় বিতরন করে থাকে। দেখা গেছে, উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের একজন মেম্বার প্রার্থীর নিজ গ্রামে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ৬০ জন ভোটার থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে এই প্রার্থীই সর্বাধিক ভোটে মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিল।

মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্ত শ্রেণীগুলোর মাঝে যতই আত্মদ্বন্দ্ব থাকুক না কেন, তিনটা নির্বাচনেই তারা একে অপরকে সহযোগিতা করেছে। প্রথম নির্বাচনে উচ্চবিত্ত শ্রেণী মধ্যবিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীকে ভাইস-চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে তারা মেম্বার পদগুলো ভাগাভাগি করে নেয় এবং ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে ১৯৭৯ সনের ন্যায় কেবল মধ্যবি -ত্ত শ্রেণীকেই মেম্বার পদগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়। স্ব স্ব শ্রেণীকে নির্বাচিত করার জন্য তারা একে অপরকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল বলেও জানা যায়। তবে দক্ষিণ গৌহাটী ইউনিয়নের তুলনায় উত্তর গৌহাটীতেই শ্রেণী চেতনার বিকাশ একটু বেশী লক্ষ্য করা গেছে। কারন,

এখানকার (দক্ষিণ গৌহাটীর) লোকজন এখনও উপযুক্ত নেতৃত্ব দানের লোক খুঁজে পায় না বলে তাদের মাঝে আজও তেমন চেতনার বিকাশ ঘটেনি। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা শহরমুখী হওয়ায় নিম্ন শ্রেণী এখনও অনেকটা আগের মত রয়ে গেছে। অবশ্য মেম্বার নির্বাচনে তারা নিজস্ব শ্রেণীর প্রার্থীকে সমর্থন দিলেও চেয়ারম্যান পদ আজও উচ্চবিত্তের হাতেই রয়ে গেছে। তবে উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের দেখাদেখি তারা দিন দিন শ্রেণী চেতনায় জেগে উঠতে শুরু করেছে। অন্ততঃ প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাদের এই চেতনা বিকাশের স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের সামাজিক পটভূমি

এই অধ্যায়ে গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের সামাজিক পটভূমি আলোচনার অবকাশ রয়েছে। সামাজিক পটভূমি আলোচনার গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, ইহা তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া, গ্রামীন রাজনীতিতে কি ধরনের ব্যক্তিরা প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং ইউনিয়ন পরিষদে জনগনের প্রতিনিধিত্ব করছে, তারা কি মনোভাব পোষন করছে, সমাজের অবশিষ্ট জনসমষ্টি থেকে কিভাবে কতটা স্বাতন্ত্র্য তারা বজায় রাখছে - এসব জানার জন্য তাদের সামাজিক পটভূমি জানা অপরিহার্য। এলিটদের লিংগ, বয়স শিক্ষা, পেশা, জমির মালিকানা, আয়, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় এই পটভূমি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গ্রামীন রাজনীতিতে তাদের আবির্ভাব ও প্রভাব সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত যেমন অপরিহার্য, তেমনি তাদের ভূমিকা সম্পর্কেও। কারন, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষুদ্র এই জনগোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিমূলে কোন বিষয়টি কাজ করছে তা খুঁজে বের করতে হবে। তারা সমাজের জনগনকে আজ্ঞাধীন রেখেছে, নাকি জনগন বাধ্য হয়েই তাদের আজ্ঞা পালন করছে, জনগনকে তারা কোন দৃষ্টিতে দেখছে- সমাজে তারা সেবার ভূমিকা পালন করছে জনগনের কল্যাণের মাধ্যমে, নাকি জনগনকে নিজেদের কল্যানে ব্যবহার করছে - এসব অবশ্যই দেখার বিষয়। এই আলোচনায় এসব বিষয়ের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

লিংগ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর গবেষনার স্থান গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ের লোক সংখ্যা ৩৫০৬৯। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা (শিশুসহ) ১৭৫২৩ এবং মহিলার সংখ্যা (শিশুসহ) ১৭৫৪৬। ১৯৭৭ সনের নির্বাচনের আগে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ১৯৭৬ সনে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ বলে সরকার প্রতিটি ইউনিয়নে দুইজন মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করেন। এই আদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য দু'টি আসন সংরক্ষনের মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা প্রতিনিধিত্বের সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দু'টি ইউনিয়নে ১৯৭৩ ও ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে কোন মহিলা প্রার্থী ছিল না। অবশ্য ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে উত্তর গৌহাটী

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডে ১জন মহিলা প্রার্থী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, গ্রামীন রাজনীতিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা নেই। বলা বাহুল্য, শহরাঞ্চলেও ইহার ব্যতিক্রম নয়। শহরাঞ্চলের মেয়ে-দেরও এলিটের ভূমিকায় খুব একটা দেখা যায় না। গ্রামীন রাজনীতির বেলায় বলা চলে, যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে গ্রামীন রাজনীতি পরিচালিত হয় সে পরিবেশ ও পরিস্থিতি মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয়। তাছাড়া, মহিলাদের সাংসারিক দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। ফলে সংসার সামাল দিয়ে বাইরের জগতে দৃষ্টি দেওয়ার সময় তারা যেমন পায় না, তেমনি তাদের মাঝে সে রকম মানসিকতাও গড়ে উঠেনি। ধরা যেতে পারে গ্রাম সালিশের কথা। গ্রামের বেশীর ভাগ সালিশই রাতের বেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এমনি অবস্থায় কোন মহিলার পক্ষে সালিশে হাজির হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। তাছাড়া, গ্রামীন মেয়েরা বেশ লাজুক ও ধর্মভীরু। পর পুরুষের মুখামুখি হওয়া ও দেখা-সাক্ষাত করার ব্যাপারে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের প্রতি তারা বেশ আস্থাশীল। অপরদিকে, গ্রামীন মানুষের কাছে এমনটি পছন্দনীয়ও নয়। গ্রামীন মহিলাদের রাজনীতিতে এরূপ পশ্চাদপদতা সম্পর্কে এক জন মত দিয়েছেন, "Women are directly or indirectly discouraged from appearing in the public and freely mixing with men or from entering occupation and profession that would keep away from homes for substantial period of time. Even today it is believed by many in the community that the ideal place for women is the home and they are not capable of holding the responsibilities associate with elitist positions. While some changes toward women occupying elite position are now visible, they are not significant enough to encourage women to come out their homes and occupy such position."[১]

বস্তুতঃ গ্রামীন রাজনীতিতে মহিলাদের অংশ গ্রহনে পুরুষের বিরোধী মনোভাব ও উদাসীনতাই মহিলাদের পশ্চাদপদ করে রেখেছে। দীর্ঘ দিনের সামাজিক রীতি-নীতি বিসর্জন দিয়ে বেরিয়ে আসার মত পরিবেশ আজও গড়ে উঠেনি। সর্বোপরি, গ্রামীন রাজনীতিতে যে সব মহিলা অংশ নিতে পারে বলে মনে করা হয়, তাদের পরিবারের কোন না কোন পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে জড়িত আছেই। ফলে গ্রামীন বিষয়ে জড়িত হওয়ার চিন্তা-ভাবনা তারা খুব কমই করে থাকে। অপরদিকে, নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো যেখানে উদরের দাবী নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত, সে সব পরিবারের মহিলাদের রাজনীতিতে আসার প্রশ্নই উঠে না। অন্নজ্বালা সর্বদাই তাদের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে বলে এ পথে তাদের আসার সম্ভাবনা নেই।

বয়স

গ্রামীন রাজনীতিতে বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বারদের বয়সের দিকটা গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, আধুনিক গতিশীল সমাজের চাহিদা মিটাতে তারা কতটা সক্ষম হবে। আধুনিক কালে প্রতিনিয়ত সমাজে নতুন নতুন চাহিদা দেখা দিচ্ছে বলে সমাজ নতুন নতুন সমস্যার মোকাবেলা করছে। ইউনিয়ন পরিষদের ন্যায় গ্রামীন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিতে বয়স্ক লোকদের নেতৃত্ব কায়েম হলে সনাতনপন্থীদের নেতৃত্বই কায়েম হয়। বয়স্ক লোকেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাচীনপন্থী হয়ে থাকে। কেননা, তাদের গোটা বয়সের অভিজ্ঞতা সনাতন পন্থায়ই অর্জিত হয়। আধুনিক গতিশীল সমাজের জন্য গ্রামীন বয়স্ক লোকের চিন্তা-চেতনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় আজ পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। আর তাই আধুনিকপন্থী ও সনাতনপন্থীদের মধ্যে এখানে সংঘাতও বিদ্যমান রয়েছে। প্রাচীনপন্থীরা আধুনিকতার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, একমাত্র তরুনরাই আধুনিকীকরন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। তবে কেবল তরুন হলেই চলবে না, এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বও অনস্বীকার্য। এলিটদের শিক্ষা সম্পর্কে এ অধ্যায়েই পরে আলোচনা করা হবে। তার আগে এই আলোচনায় গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের বয়সের তথ্য ৪.১ নং সারনীতে প্রদর্শিত হলো।[২]

৪.১ নং সারনীতে প্রদর্শিত তথ্য মতে দেখা যায়, নির্বাচনগুলোতে এলিটদের বয়সের কিছুটা তারতম্য ঘটেছে এবং গ্রামীন তারুন্যের প্রাধান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক এলিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, ৫০ বছরের উর্ধ্ব বয়স্ক এলিটের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। প্রদর্শিত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের বয়স ৩০ বছর থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে সীমিত। ১৯৭৭ সনের নির্বাচনেও চেয়ারম্যানদের বয়স ৪৫ বছরের মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু ১৯৮৪ সনের একজন চেয়ারম্যান ব্যতিক্রম এবং তার বয়স ৩০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে সীমিত। অপরদিকে, ভাইস-চেয়ারম্যানদের বয়স চেয়ারম্যানদের তুলনায় বেশী ছিল। তাদের বয়স ছিল ৫০ বছরের উর্ধ্বে। ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান[৪] দু'জনই প্রায় একই বয়সী এবং সব এলিটের মধ্যে তারাই

Dhaka University Institutional Repository

উর্ধ্ব বয়সী। মেম্বারদের তালিকায় দেখা যায়, ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে ৭জন মেম্বারের বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে সীমিত ছিল। মাত্র ১৩ জনের উপর প্রদর্শিত এই তথ্য এটাই

সারণী নং - ৪·১ ঃ বয়সের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ[৩]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	বছরের ভিত্তিতে বয়স			মোট
		২৫ - ৩০	৩০ - ৪৫	৪৫ থেকে তদুর্ধ্বে	
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	X	১	X	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ারম্যান	X	X	২	২
১৯৭৩	মেম্বার	৭	৩	৩	১৩
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	X	২	X	২
১৯৭৭	মেম্বার	২	১০	৩	১৫
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	X	১	১	২
১৯৮৪	মেম্বার	৪	৮	৬	১৮
	মোট	১৩	২৫	১৫	৫৩

প্রতীয়মান হয় যে, তরুন নেতৃত্বের প্রতি জনগনের আকর্ষন বাড়ছে। এসময়ে ৩০ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মধ্যে সীমিত এলিটের সংখ্যা হলো মাত্র ৩ জন। একইভাবে ৪৫ বছরের উর্ধ্ব বয়সের এলিটও এসময়ে ৩ জন রয়েছে। ১৯৭৩ সনে তরুন এলিট ওই সময়ের এলিটদের অর্ধেকের বেশী এবং ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এলিটের সংখ্যা তরুন এলিটদের তুলনায় কম। বলা চলে, এরূপ নেতৃত্ব মোটামুটিভাবে চিন্তা-চেতনায় এখনও বার্ধক্যের পথে যায়নি। তবে তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ গৌহাটী ইউনিয়নের চেয়ে উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নেই বেশীর ভাগ তরুন নেতৃত্বের আগমন ঘটেছে। এই ইউনিয়নে ১৯৭৩ সনের নির্বাচিত ৪ জন তরুন মেম্বারসহ মোট ৬ জন মেম্বার পুনঃ নির্বাচিত হয়। একই সময়ে দক্ষিণ গৌহাটীতে ৬ জন এলিট পুনরায় নির্বাচিত হলেও তাদের বেশীর ভাগই ৪০ ও ৪৫ বছর বয়সের উর্ধ্ব বয়সের ছিল। ১৯৭৭ সনে ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের ২ জন নবাগত এলিটের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে, এসময়ে ৩০ থেকে ৪৫ বছর বয়সের এলিটের সংখ্যা ১২ জন। ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে ইউনিয়নদ্বয়ের চেয়ারম্যানদের বয়স ৪০ ও ৪৫ বছর ছিল। দেখা যায়, উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নে এসময়ে ১৯৭৭ সনে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত চেয়ারম্যান পুনরায় নির্বাচিত হয়। আর এসময়ে তার বয়স ৪৫ বছরের সীমা অতিক্রম করে। অপরদিকে, মেম্বারদের বেলায় দেখা যায়, ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের ৪ জন, ৩০ থেকে ৪৫ বছর বয়সের ৯ জন এবং ৪৫ বছর থেকে তদুর্ধো বয়সের ৭ জন মেম্বা -র নির্বাচিত হয়েছে। তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিতদের মধ্যে মোট ৫৩ জনের উপর বয়সের এই তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। ৫৩ জনের মধ্যে ১৩ জনের বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, ২৫ জনের বয়স ৩০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে এবং ১৫ জনের বয়স ৪৫ বছরের উর্ধ্বে। মোটকথা, ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে নির্বাচিত মেম্বার এলিট ১৩ জনের মধ্যে ৭ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৩·৮৫ ভাগ। একই সময়ে ৩০ বছর থেকে ৪৫ বছর বয়সের এলিট ১৩ জনের মধ্যে ৩ জন অর্থাৎ উল্লেখিত সংখ্যার শতকরা ২৩·০৭ ভাগ। এবং ৪৫ থেকে তদুর্ধো বয়সের এলিট ১৩ জনে ৩ জন, অর্থাৎ উল্লেখিত সংখ্যার শতকরা ২৩·০৭ ভাগ।

১৯৭৭ সনের নির্বাচনে ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত অনেক তরুন এলিট সমর্থন পেলেও তাদের বয়স কিছুটা বেড়ে যায়। এসময়ে ২৫ বছর থেকে ৩০ বছরের মধ্যে সীমিত বয়সের তরুন এলিট ছিল ২ জন। অর্থাৎ এসময়ে ১৫ জন মেম্বারের মধ্যে ২ জন ছিল নবাগত। তারা ছিল উল্লেখিত সংখ্যার শতকরা ১৩·৩৩ ভাগ। অপরদিকে, ৩০ বছর থেকে ৪৫ বছর বয়সের এলিট ছিল শতকরা ৬৬·৬৬ ভাগ এবং ৪৫ থেকে তদুর্ধো বয়সের এলিট শতকরা ২০ ভাগ ছিল।

১৯৮৪ সনের নির্বাচনে ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের এলিট মোট নির্বা-চিত ২০ জনের মধ্যে ৪ জন, অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ। এসময়ে ৩০ থেকে ৪৫ বছর বয়সের এলিট ৮ জন, অর্থাৎ শতকরা ৪০ ভাগ এবং ৪৫ বছর বয়সের উর্ধ্ব বয়স্ক এলি-টের সংখ্যা ৬। অর্থাৎ এই বয়সের এলিটরা শতকরা ৩০ ভাগ।

দু'টি ইউনিয়নের মোট ৫৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের এলিট ছিল ১৩ জন। অর্থাৎ মোট সংখ্যার শতকরা প্রায় ২৪·৫৩ ভাগ ছিল এদের সংখ্যা। আর ৩০ বছর থেকে ৪৫ বছর বয়সের এলিটের সংখ্যা ছিল ২৫ জন। এরা ছিল মোট সংখ্যার শতকরা প্রায় ৪৭·১৭ ভাগ এবং ৪৫ বছরোর্ধ এলিটের সংখ্যা ছিল ১৫। এরা ছিল মোট সংখ্যার প্রায় শতকরা ২৮·২৩ ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যায়, গ্রামীন জনগন তরুন নেতৃত্বের প্রতি দিন দিন আস্থাশীল হয়ে উঠছে। একালে যেমন তেমন এলিটকে সমর্থন করতে মানুষ বাধ্য ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত সময় মানুষের চিন্তা ও চেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং মানুষ সমাজের পরিবর্তনশীলতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। একই সংগে এটাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে যে, তার নেতৃত্ব তাদের জন্য মংগল বয়ে আনবে। তারা আজ আর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তাবেদারী করতে রাজী নয়। আগে তাদের অনেক কিছুই করতে বাধ্য করা হত। কিন্তু আজ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মাঝে শিক্ষার প্রসার এবং সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় তাদের চিন্তা জগতে আজ নতুন চেতনার জেগেছে। আর তাই দেখা যায়, ১৯৭৩, ১৯৭৯ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনগুলোয় তরুন নেতৃত্বের প্রতিই তাদের সমর্থন মোটামুটিভাবে ব্যক্ত করেছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ৩·১, ৩·২ ও ৩·৩ সারনীতে এবিষয়ে তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শিত তথ্য থেকে দেখা যায়, নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকেই বেশীর ভাগ গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট নির্বাচিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, গ্রামের জনগন আজকাল অনেকটা শ্রেণী চেতনায় উজ্জীবিত হচ্ছে এবং নিজেদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত তরুনদের নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত মনে করে নির্বাচনে তাদের নির্বাচিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

শিক্ষা

সমাজে এলিটের মর্যাদা ও স্থান নিরূপনে শিক্ষার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এলিটরা কতটা শিক্ষিত এবং শিক্ষার প্রতি তারা কেমন আগ্রহী - এসব জানার জন্য গ্রামীন এলিটদের শিক্ষা সম্পর্কিত দিকটি জানা একান্ত অপরিহার্য। ৪·২ নং সারনীতে এলিটদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। মোট ৪২ জন এলিটের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যালোচনা করে মোট ৯টি শ্রেণীর (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী অনুযায়ী) শিক্ষিত এলিট পাওয়া গেছে। আর তাই সর্বনিম্ন তৃতীয় শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ ইন্টারমেডিয়েট পর্যন্ত আলাদাভাবে প্রত্যেক শ্রেণী উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে। সর্বমোট ৪ জন এলিট কেবলমাত্র নাম দস্তখত করতে পারে বলে তাদের কোন শ্রেণীভুক্ত দেখানো হয়নি।

১৯৭৩ সনের নির্বাচনে নির্বাচিত এলিটদের মধ্যে ১৫ জন সম্পর্কে সারনীতে তথ্য দেওয়া হয়েছে। এতে দেখা যায়, ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্যতা যথাক্রমে ৭ম শ্রেণী ও ম্যাট্রিক। তখন দু'টি ইউনিয়নের দু'জন ভাইস-চেয়ারম্যানের শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাক্রমে ১০ম শ্রেণী ও ম্যাট্রিক। একই সময়ে মেম্বারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিভিন্ন ধরনের। ২৩ন মেম্বার ৪র্থ শ্রেণী, ৩ জন ৫ম শ্রেণী, ২ জন ৬ষ্ঠ শ্রেণী এবং ৪ জন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া করেছে। ভাইস-চেয়ারম্যান দু'জনই বয়সে প্রবীন এবং শিক্ষার দিক দিয়েও তারা মোটামুটি অগ্রগামী। অপরদিকে, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছে ৪ জন মেম্বার। মোট ১৫ জন এলিটের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত ৫ জন এবং বাকী ১০ জনই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী। ১৯৭৭ সনে ১৯৭৩

সারণী নং - ৪'২ : শিক্ষা ভিত্তিক এলিটের শ্রেণী ভাগ[৫]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	শিক্ষার স্তর ও শ্রেণী ভিত্তিক									মোট
		৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	১০ম	ম্যাট্রিক	ইন্টারমে-ডিয়েট	
১৯৭৩	চেয়ারম্যান					১			১		২
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ার-ম্যান							১	১		২
১৯৭৩	মেম্বার		২	৩	২		৪				১১
১৯৭৭	চেয়ারম্যান					১				১	২
১৯৭৭	মেম্বার	১	১	২	২		৬	২	১		১৫
১৯৮৬	চেয়ারম্যান									২	২
১৯৮৪	মেম্বার	১	১	৩	২		৬	২	১		১৫
		২	৪	৮	৬	২	১৯	৫	৩	৩	৪৯

সনের নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় উক্ত জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা পূর্ব-রূপ বহাল থাকে। কিন্তু নবাগত চেয়ারম্যানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সকল এলিটের মধ্যেই শীর্ষে রয়েছে। অর্থাৎ তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্টারমেডিয়েট। সুতরাং ১৯৭৭ সনে চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল যথাক্রমে ৭ম শ্রেণী এবং ইন্টারমেডিয়েট। আর মেম্বারদের[৬] শিক্ষাগত যোগ্যতা এবারও বিচিত্র ধরনের। অর্থাৎ ১ জন ৩য় শ্রেণী, ১ জন ৪র্থ শ্রেণী, ২ জন ৫ম শ্রেণী, ২ জন ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৬ জন ৮ম শ্রেণী, ২ জন ১০ম শ্রেণী[৭] এবং ১ জন ম্যাট্রিকুলেট[৮] ছিলেন। এই দু'টি নির্বাচনেই দু'জন করে ৪ জন মেম্বার কেবল নাম দস্তখত করতে সক্ষম এলিট সহ মোট ৩২ জন এলিটের মধ্যে ২৩ জন এলিটকেই মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত দেখা যায়। বাকী ৯ জনের ১জন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এবং ৮জন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় (নাম দস্তখত করতে জানে ৪ জনসহ) শিক্ষিত।

১৯৮৪ সনের নির্বাচনে দেখা যায়, ১৯৭৭ সনে উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যান পুনরায় নির্বাচিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ ইউনিয়নে নব নির্বাচিত চেয়ারম্যানের শিক্ষাগত যোগ্যতাও ইন্টারমেডিয়েট। এসময়ে মেম্বারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো- ১ জন তৃতীয়, ১ জন চতুর্থ, ৩ জন পঞ্চম, ২ জন ষষ্ঠ, ৬ জন অষ্টম এবং ২ জন দশম শ্রেণী। এ নির্বাচনে নির্বাচিতদের ১৫ জনের মধ্যে ৫ জন প্রাথমিক স্তরের, ১৫ জন মাধ্যমিক স্তরের এবং ২ জন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামের লোকজন শিক্ষিত লোকদের নেতৃত্বে দেখতে আগ্রহী। কিন্তু গ্রামে শিক্ষিত লোক খুব কমই পাওয়া যায়। কোন রকমে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলেই তারা শহরে পাড়ি জমায়। গ্রামে তাদের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা হয় না বলে শিক্ষিত লোকেরা গ্রামে থাকে না। একটা চাকুরী লাভের জন্য শহরে না এসে তারা পারেনা। কর্মসংস্থানের মূল কেন্দ্র শহর হওয়ায় গ্রামের অনেক শিক্ষিত সন্তানের পিতা নিম্নবিত্তের জীবন যাপন করছে। স্ব স্ব শ্রেণী থেকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের নেতৃত্বের আসনে দিতে চাইলেও শিক্ষিত লোক না পেয়ে তারা যাকে তাকে নির্বাচিত করতে বাধ্য হয়। যে সব শিক্ষিত লোক শহরে না গিয়ে গ্রামেই থাকে, গ্রামীন রাজনীতির প্রতি তাদের চরম ঘৃণা রয়েছে।[৯] সাধারণ মানুষ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করে (নির্বাচন ক্ষেত্রে ভোটাররা যাদের পেয়েছে) শিক্ষার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, তাতে এরা মূলতঃ শিক্ষিত লোকদের গ্রামীন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেওয়ারই আহবান জানিয়েছে। গ্রামীন রাজনীতি অত্যন্ত কুটীল সত্য, কিন্তু এই কুটীলতার পিছনে যেমন রয়েছে শিক্ষার অভাব, তেমনি রয়েছে এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থান্ধতা। উল্লেখিত তিনটি নির্বাচনের প্রাপ্ত তথ্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষিত লোকেরা গ্রামীন রাজনীতিতে যতই এগিয়ে আসছে মূর্খ ও স্বার্থান্ধরা ততই সরে পড়ছে।

এলিট পরিবার পরিজনদের শিক্ষা

সমাজের যে কোন শ্রেণী থেকেই আগমন ঘটুক না কেন, গ্রামীন রাজনীতিতে এলিটরা সমাজের বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত থাকে। অপরদিকে, গ্রামীন সমাজে শিক্ষিত লোকেরও একটা আলাদা আসন রয়েছে। তাই এলিট পরিবারের শিক্ষা সম্পর্কেও জানা দরকার। কেননা, শিক্ষিত পরিবারের লোকেরা সমাজে যতটা সমাদৃত, অন্য কোন পরিবার ততটা সমাদৃত নয়। গ্রামের জনগন অপরাপর জনগন থেকে এদের যেমন আলাদা করে দেখে, তেমনি মান্যও করে। গ্রামের ঘরে ঘরে এখন যেভাবে শিক্ষার আলো প্রবেশ করছে, অতীতে এমনটি ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার দরুন এতকাল গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে দারুন প্রতিবন্ধকতা

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থা বদলে গেছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। স্থানীয় ইতিহাসে অত্র দু'টো ইউনিয়নের স্তর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সকল স্তরের মিলিয়ে মোট ৮৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা শিক্ষাসহ) রয়েছে এবং প্রতি ৪২ জনের ভাগে একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়েছে। ফলে আজ-কাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা গ্রহন অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে।

অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের এলিট পরিবারের শিক্ষার উপর সংগৃহীত তথ্য মতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক এলিট পরিবারের সদস্যরাই কম বেশী শিক্ষিত। এলিটদের অনেকেরই মাতা-পিতা শিক্ষিত না থাকায় তাদের শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তাদের সন্তানাদি ও স্ত্রীদের শিক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] প্রথমে এলিটদের স্ত্রীদের শিক্ষার কথাই ধরা যেতে পারে। মোট ৫৩ জন এলিটের মধ্যে মাত্র ৫ জনের স্ত্রী শিক্ষক এবং ৭ জন মেম্বারের স্ত্রী কেবলমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে জানে। অপরদিকে, চেয়ারম্যানদের স্ত্রীগনও ৫ম ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহন করেছে। ভাইস-চেয়ারম্যান ২ জনের স্ত্রীরা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া শিখেছে। মেম্বারদের স্ত্রীগনের মধ্যেও ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সংখ্যাই বেশী। মোট ১৫ জনের স্ত্রী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত, ৩ জন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া করেছে। তাছাড়া, ১১জনের স্ত্রীগন ৪র্থ শ্রেণী এবং ৮ জনের স্ত্রীগন ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া করেছে।

উল্লেখিত তথ্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এলিটদের স্ত্রীগনও কম বেশী শিক্ষিতা। অবশ্য ৮ম শ্রেণীর উপর কারও শিক্ষা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, শিক্ষা জগতের সাথে তাদের সামান্য হলেও সম্পর্ক রয়েছে। এলিটদের সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় এটা পরিস্কার হয়ে উঠবে যে, শিক্ষা গ্রহনের ক্ষেত্রে তাদের কোন অনীহা ছিল না, বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবই তাদের এতটা পিছিয়ে রেখেছে। তাদের সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যাবে, এলিটদের স্ত্রীগনও শিক্ষার প্রতি বেশ যত্ন-বান এবং সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে তারা বেশ আগ্রহী।

তিনটি নির্বাচনে মোট ৫৩ জন এলিটের মধ্যে মোট ৪৬ জনের প্রত্যেকের কাছেই

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সন্তানাদির শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছে এবং তাঁরা জবাবও দিয়েছে। সংক্ষেপে তা আলোচনা করা গেল। দু'টি ইউনিয়নের তিনটি নির্বাচনে চেয়ারম্যানের সংখ্যা ৬ হলেও ব্যক্তি-র হিসাবে এই সংখ্যা ৪। দেখা যায়, এই ৪ জনের মধ্যে তিন জনের ছেলে-মেয়েরা এখনও তেমন উচ্চ শিক্ষা লাভ করেনি। তবে তারা শিক্ষার পথেই আছে। গবেষণা কালীন সময়ে দেখা গেছে, উত্তর গৌহাটির চেয়ারম্যানের ৫ ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মৃত্যু হওয়ায় তার শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা হলেও পারিবারিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়নি) ছেলে মেয়েদের মধ্যে ১ ছেলে এম বি বি এস, ১ ছেলে বি এ পরীক্ষার্থী এবং ২ জন কলেজ ও স্কুলগামী। অপরদিকে, দক্ষিণ গৌহাটির চেয়ারম্যান দু'জনের ছেলে-মেয়েরা কলেজ ও স্কুলগামী। চেয়ারম্যানদের তুলনায় ভাইস-চেয়ারম্যানগনের ছেলেদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রগামী দেখা যায়। এদের দু'জনের ৫ ছেলে গ্র্যাজুয়েশন (১ জনের ৩ ও ১ জনের ২ ছেলে) ডিগ্রী নিয়েছে ও ১ ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী নিয়েছে। তাদের মেয়েরা সকলেই এস এস সি পর্যন্ত পড়া-শোনা করেছে। মেম্বারদের ছেলেদের বেলায়ও দেখা গেছে, গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী থেকে নিম্নদিকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহন করতে দেখা যায়। বলা দরকার যে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে খুব কম মেম্বারের ছেলেরেই পড়াশুনা বন্ধ করতে দেখা গেছে। তবে সব এলিটেরই মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একই অবস্থা লক্ষণীয়। এস এস সি-এর পর কোন এলিটেরই মেয়েদের পড়াশুনা অব্যাহত রাখতে দেখা যায় না। কারন খুঁজে দেখা গেছে, উচ্চ শিক্ষা গ্রামের মেয়েদের জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্র শিক্ষা বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, গ্রামে উচ্চ শিক্ষিত লোকের অভাবহেতু মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে শহরে এনে বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য গ্রামের এসব লোকজনের নেই। উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের প্রধান কেন্দ্র বিন্দু শহর হওয়ায় উচ্চ শিক্ষার নামে শহরে গিয়ে শিক্ষা গ্রহন করে শিক্ষিত যুবকেরা শহুরে জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং শহরেই সংসার পেতে বসে। এর ফলে গ্রামের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দান করে অভিভাবকরা ঝুঁকি নিতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার সম্প্রসারন এবং শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরন তথা অনার্স ও পাশ কোর্সের বৈষম্য দূর না করা হলে উচ্চ শিক্ষা প্রত্যাশী ছেলেদের শহরমুখী প্রবনতা দূর করা যাবে না এবং গ্রামীন মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথও প্রশস্ত হবে না। গ্রামে শিক্ষিতা মেয়েদের কর্মসংস্থানের অভাবও উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। স্থানীয় ইতিহাসে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর দু'টি ইউনিয়নের জন্য একটা মাত্র কলেজ রয়েছে। আগে এটা ডিগ্রী কলেজ ছিল। কিন্তু অনার্স ও পাশ কোর্সের বৈষম্য হেতু কর্ম জীবনে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে শিক্ষিত যুবকরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা মোকাবেলার জন্য যুবকরা আজকাল অনার্স কোর্সে শিক্ষা গ্রহনের জন্য শহরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আর এই একই কারনেই এখানকার ডিগ্রী স্তরটি টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, শহরের কলেজ গুলোর

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় সুযোগ-সুবিধা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন ফলাফল করতেও সক্ষম হয়নি। এই একই অসুবিধার দরুন শিক্ষকের অপ্রতুলতাও কলেজের ডিগ্রী স্তর টিকিয়ে রাখার ব্যর্থতার জন্য দায়ী। শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, কলেজের পর্যাপ্ত ফান্ড-এসবের অভাবই মূলতঃ ছাত্র-শিক্ষক উভয়কেই গ্রামের এই ডিগ্রী কলেজটির প্রতি অনেকটা বিতৃষ্ণ করে তুলেছে। এখানে ডিগ্রী স্তরের কলেজ থাকলে ব্যাচেলার ডিগ্রীধারীর সংখ্যা এই ইউনিয়নদ্বয়ে আরও বৃদ্ধি পেত। কেননা, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরাও শিক্ষার সুযোগ পেত। ডিগ্রী স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে না থাকা সত্ত্বেও এলিটদের ছেলেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটি অগ্রগামী রয়েছে। আর এতে প্রমানিত হয় যে, এলিটগন নিজেরা শিক্ষা-দীক্ষায় যেমনই হউক, শিক্ষার প্রতি তাদের বেশ আগ্রহ রয়েছে। কেননা, তাদের কারও ছেলে-মেয়েকেই নিরক্ষর বা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত দেখা যায় না। অর্থাৎ তারা তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বেশ আগ্রহী।

পেশা

সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে পেশাগত দিকটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে। সমাজে বিভিন্ন রকমের পেশার মধ্যে সকল পেশা সমান মর্যাদা বহন করে না। তাই এলিটদের পেশাগত দিকটি বিশ্লেষন করে দেখা দরকার যে, সমাজে তারা কি ধরনের পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।

গ্রাম বাংলার মানুষের অন্যতম পেশা হলো কৃষি। আর তাই কৃষি জমির পরিমানের উপরই বেশীর ভাগ নির্ভর করে সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি। তবে গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের বেলায় একথা সর্বাংশে সত্য নয়। কারন, এলিটরা শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করেই চলে না। তারা অন্যান্য পেশায়ও নিয়োজিত আছে। ৪°৩ নং সারনীতে এতদসম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত তথ্য মতে দেখা যায়, ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের একমাত্র পেশা কৃষি। কিন্তু ভাইস-চেয়ারম্যান দু'জন কৃষি ছাড়াও ব্যবসায়ের সাথে জড়িত রয়েছে। তারা স্থানীয় বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। অপরদিকে, শুধুমাত্র ৩ জন মেম্বার কেবল কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং একজন মেম্বার কৃষি ছাড়াও অন্য পেশা অর্থাৎ কন্ট্রাকটরী করে থাকে। কিন্তু ৭ জন মেম্বার কৃষি এবং ব্যবসা - উভয় পেশার সাথেই জড়িত। দেখা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

এই নির্বাচনের ১৪ জন এলিটের ১১ জনই কৃষি ও ব্যবসা এবং কৃষি ও অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত। অর্থাৎ প্রায় ৭৮.৫৭% ভাগ এলিট কৃষি ছাড়াও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।

সারনী নং – ৪.৩: এলিটের পেশা ভিত্তিক শ্রেণী ভাগ[১১]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	পেশা: শুধুমাত্র কৃষি	কৃষি ও ব্যবসা	অন্যান্য ও কৃষি	শুধু গৃহস্থালী	মোট
১৯৫৩	চেয়ারম্যান	১	X	X	X	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ার-ম্যান	X	২	X	X	২
১৯৭৩	মেম্বার	৩	৭	১	X	১১
১৯৭৫	চেয়ারম্যান	১	১	X	X	২
১৯৭৭	মেম্বার	২	১০	১	X	১৩
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	১	১	X	X	২
১৯৮৪	মেম্বার	৩	১০	২	X	১৫
	মোট	১১	৩১	৪	X	৪৬

অপরদিকে, প্রায় ২৮.৫৭% ভাগ এলিটই কেবল কৃষির উপর নির্ভরশীল। একইভাবে ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত এলিটদের মধ্যে ১৫ জনের সকলেই কৃষির সাথে জড়িত। একমাত্র কৃষি পেশার সাথে জড়িত রয়েছে ১ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন মেম্বারসহ মোট ৩ জন। কিন্তু বাকী ১২জন এলিটের সকলকেই কৃষি ও ব্যবসা এবং কৃষি ও অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত দেখা যায়। অপরদিকে, ১৯৮৪ সনে নির্বাচিত এলিটগনের মধ্যে ১৭ জন এলিটের পেশা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১ জন চেয়ারম্যানসহ ৪ জন এলিট কেবলমাত্র কৃষি, ১ জন চেয়ারম্যানসহ ১১ জন এলিট কৃষি ও ব্যবসা এবং ২ জন কৃষি ও অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত রয়েছে। দেখা যায়, এই নির্বাচনে ১৭ জন এলিটের ১৩ জনই কৃষির সাথে সাথে ব্যবসা ও অন্যান্য পেশা গ্রহন করেছে। এই নির্বাচনের ৪ জনই কেবলমাত্র কৃষি নির্ভরশীল। কৃষির সাথে সাথে এলিটগন স্থানীয় বা নিজেদের সুবিধা মত যে কোন হাটে বা বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। তিনটি নির্বাচনে মোট ৪৬ জন এলিটের ১১ জন শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে, ৩১ জন এলিট কৃষি ছাড়াও ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে এবং ৪ জন কৃষি ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। মোটকথা, ৪৬ জন এলিটের ৩৫ জনই কৃষিসহ ব্যবসা এবং অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়, গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের প্রত্যেকেই কৃষির সাথে জড়িত। লক্ষনীয় বিষয় হলো, তাদের প্রত্যেকেরই কৃষি কাজের মাধ্যমে ফসল ফলানোর জন্য বিরাট কিছু না কিছু জমি আছে বলেই প্রত্যেকে কৃষির সাথে জড়িত। তাছাড়া, এদের প্রত্যেকেই কৃষক পরিবার থেকে আগত। মানুষের আদি পেশা যেহেতু কৃষি ছিল সেহেতু গ্রামে আজও কৃষির জমি এবং জমির উৎপাদনের উপর ভিত্তি করেই অনেক ক্ষেত্রে সমাজে মানুষের স্থান নির্ধারিত হয়ে থাকে। কেননা, ধনবানকে বাদ দিয়ে ধনীকে কখনই সমাজের উচ্চাসন দেওয়া হয় না। ঠিক একইভাবে সমাজের নেতৃত্বে যদিও আজকাল নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা প্রাধান্য বিস্তার করছে, তথাপি সমাজের সাধারন মানুষ থেকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে তারা অপেক্ষাকৃত সামর্থবান।

জমির মালিকানা

গ্রামের মানুষের আয়ের প্রধান উৎস হলো জমি। গ্রামীন রাজনীতিতে তাই জমির মালিকানাও বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। গ্রামের মানুষের কাছে জমির মালিকানাও এক ধরনের ক্ষমতা। অর্থাৎ অধিক পরিমান জমির মালিক গ্রামীন সমাজে বেশ প্রভাব খাটাতে সক্ষম হয়। সুতরাং ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে নির্বাচিত এলিটগন কি পরিমান জমির মালিক তা দেখা দরকার।

স্থানীয় ইতিহাস আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ের আয়তন ২৮'৬২ বর্গ কিলোমিটার এবং এখানকার কৃষি জমির পরিমান ৪৪৫৩ একর। উল্লেখিত সবটুকু জমি আবাদযোগ্য। এখানে মাথা পিছু জমির পরিমান প্রায় ০'১০ একর। সুতরাং এখানে বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক খুবই কম। দেখা গেছে, এখানকার কোন্দল আর সংঘাতই সম্পত্তি সংক্রান্ত। দিন দিন মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে সম্পত্তির পরিমান কমে আসছে ফলে সম্পত্তি লাভের প্রতিযোগিতায় সর্বদাই মানুষ তাড়িত হয় এবং নানান ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নেয়।

এখানকার জমির মালিকানা আজও বেশীর ভাগই সে সব শ্রেণীর হাতে সীমিত, যারা ব্রিটিশ শাসনামলে জমির মালিক হয়েছিল। আর সে সময় যারা ভূমিহীন ছিল বা ভূমিহীন হওয়ার অবস্থায় ছিল, নিজেদের প্রচেষ্টা আর শ্রমের মাধ্যমে তাদের অনেকেই আজ অবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে এবং কিছু কিছু সম্পত্তিরও মালিক হয়েছে। ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে নির্বাচিত এলিটদের সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, এলিটদের

Dhaka University Institutional Repository

সকলেই কম বেশী সম্পত্তির মালিক।[১২] ১৯৭৩ সনের ১৩ জন এলিটের সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য হলো - ৯ একর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানা তাদের রয়েছে। একজন চেয়ারম্যানের জমির পরিমান ১০ একর এবং ২ জন ভাইস-চেয়ারম্যানের জমির পরিমান যথাক্রমে ৫ একর করে। একই সময়ে মেম্বারদের সম্পত্তির পরিমান বিভিন্ন রকম লক্ষ করা যায়। ২ জন মেম্বার ৯ একর, ২ জন ৩একর, ৫ জন ৩½একর ,এবং ১ জন ১০ একর করে সম্পত্তির মালিক। তাদের এ সম্পত্তি তারা অনেকেই পৈতৃক সূত্রে পেয়েছে বলে জানায়। তবে কেউ কেউ কিছু সম্পত্তি ক্রয় করার কথা জানিয়েছে। অনুরূপভাবে ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত এলিটদের সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য হলো - ২ জন চেয়ারম্যান যথাক্রমে ৮ একর ও ৩ একর করে সম্পত্তির মালিক। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সনে ১ জন চেয়ারম্যানের সম্পত্তির পরিমান ১০ একর থাকলেও বিভিন্নলিখিত কারনে তার ২ একর সম্পত্তি কমে গেছে বলে জানা যায়। তাই ১৯৭৭ সনে তার সম্পত্তির পরিমান ৮ একর হয়েছে। এসময়ে মেম্বারদের সম্পত্তির হিসেব হলো- ১ জন ১ একর, ২ জন ২ একর, ৪ জন ২½একর, ২ জন ৩একর , ২ জন ৩½একর এবং ৩ জন ১০ একর করে সম্পত্তির মালিক। এসময়ে পুনঃ নির্বাচিত এলিটগন তাদের সম্পত্তির ১৯৭৩ সনের অনুরূপই দেখিয়েছে। অপরদিকে, ১৯৮৩ সনে নির্বাচিত এলিটদের সম্পত্তির হিসেব হলো- ১ জন চেয়ারম্যান ৩ একর, ১ জন চেয়ারম্যান ৭ একর, ৪ জন মেম্বার ২ একর, ৮ জন ৩ একর , ১ জন ৩½একর, এবং ৩ জন ৮ একর করে সম্পত্তির মালিক।[১৩]

এলিটদের জমির মালিকানা সংক্রান্ত উল্লেখিত তথ্য সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায়নি এজন্য যে, এব্যাপারে অপর কারও কাছ থেকে কোন তথ্যই উদ্ধার করা যায়নি। কারন, এক জনের তথ্য অপর জন কর্তৃক প্রদানকে গ্রামের মানুষ বিপদের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করে। তাছাড়া, একই বিষয়ে সাধারনতঃ দুই রকমের জবাব পাওয়া যায়। যারা হিতাকাংখী তারা যেমন সম্পত্তির পরিমান কম করে বলে, তেমনি যারা তার বিপরীত, তারা বাড়িয়ে বলে। ফলে সঠিক সিদ্ধান্তে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদানে জমির মালিকেরাও সব সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে। কারন, তাদের মাঝে একটা ভীতি রয়েছে যে, জমি সম্পর্কে জানার জন্য সরকারের লোকেরাই বিভিন্ন বাহানায় গ্রামে আসে। কাজেই জমির প্রকৃত হিসাব সরকারের কাছে গেলেই সরকার হয়তোবা তার জমির অংশ বিশেষ বাজেয়াপ্ত করে দিবে। কেননা, স্বাধীনতা উত্তর কালে সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য সরকারী উদ্যোগের ব্যাপারে জনগনের মাঝে জল্পনা-কল্পনা, এমনকি গুজব চলছিল যে, সরকার

Dhaka University Institutional Repository

কৃষকদের সব সম্পত্তি নিয়ে যাবে। গ্রামের মানুষের মন থেকে এখনও সেই ভয় তিরোহিত হয়নি। ফলে সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে সর্বদাই তারা সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। আর তাই এলিটদের নিজেদের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করেই উল্লেখিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

এলিটদের উল্লেখিত সম্পত্তি তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার কথাই অনেকে জানিয়েছে। তাদের পৈতৃক সম্পত্তি ও ভাই-বোনের হিসাব করলে দেখা যায়, সকলের সম্পত্তি তারা নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে অনেকেই দেখিয়েছে। এটা মূলতঃ সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার একটা কৌশল মাত্র। অপরদিকে, ক্রয় সূত্রে মালিক হওয়া সম্পত্তির বিষয়টি তারা গোপন করে গেছে। কেননা, জমি চাষাবাদ ছাড়াও যে সব এলিট ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে বাড়তি সম্পত্তির মালিক হওয়া তাদের জন্য স্বাভাবিক। তবে কারও কারও বেলায় দেখা গেছে, পৈতৃক সম্পত্তির বাইরে তাদের কোন সম্পত্তি অর্জিত হয়নি। এদের সংখ্যা খুবই কম। মোট এলিটগনের মধ্যে এরূপ ৪ জন পাওয়া গেছে। অন্যদের সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য তারা সঠিকভাবে দিয়েছে বলে মনে হয় না। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজনের সম্পত্তির সঠিক হিসেব আর একজন দেয় না, বা দিতে চায় না। এমনকি অনেকের দেওয়া তথ্য নির্ভরযোগ্যও হয় না। বিশেষ করে নানান ভয়-ভীতি কারনে বা সম্পত্তির মালিকের ক্ষতি হউক, এমন মনোভাব নিয়ে অনেকে তথ্য প্রদান করে থাকে। আর তাই এসব তথ্যের সাথে মূল মালিক প্রদত্ত তথ্যের বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। এমতাবস্থায়, সম্পত্তি সম্পর্কে এলিটগন প্রদত্ত তথ্যই গ্রহনপূর্বক এখানে পেশ করা হয়েছে। তবে একথা সত্য যে, এতদসম্পর্কিত শতকরা ৫০ ভাগ তথ্যে তেমন গড়মিল আছে বলে মনে হয় না। কারন, অতি পরিচিত হিসাবে এই সংখ্যক এলিট তাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য আমার কাছে গোপন করেনি।

বাৎসরিক আয়

জমির মালিকানার আলোকে বলা যায় যে, এলিটরা যেমন খুব অবস্থাপন্ন নয়, তেমনি একেবারেই অবস্থাহীনও নয়। জমির মালিকানার পাশাপাশি তাদের অধিকাংশের ব্যবসা বানিজ্য থাকায় গ্রামের অপরাপর অধিবাসী তথা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের চাইতে তাদের অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল। ৪.৩ নং সারনীতে দেখানো হয়েছে যে, মোট ৪৬ জন এলিটের মধ্যে মাত্র ১১ জন ছাড়া প্রত্যেকেই চাষাবাদ ছাড়াও অন্য পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখিত ১১ জন শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে।

Dhaka University Institutional Repository

জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যের ন্যায় বার্ষিক আয়ের ব্যাপারেও সঠিক তথ্য প্রদানে এলিটদের মাঝে কিছুটা সতর্ক ভাব লক্ষ্য করা গেছে। প্রকৃত আয়ের তথ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান না করলে কারও কাছ থেকে জোর করে আদায় করা যায় না, বা অন্যের দেওয়া তথ্যকে নির্ভরযোগ্য তথ্য হিসেবে গ্রহন করা যায় না। গ্রামের জীবন নিয়ে আসলে আমরা যত সুখের কাহিনীই রচনা করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে গ্রামের জীবন আজকাল সে পর্যায়ে নেই। এটা অবশ্য ঠিক যে, গ্রামের মানুষ সহজ সরল। কিন্তু এমনটি হতে তারা বাধ্য হয়েছে। কেননা, দুঃখ-দৈন্য যাদের নিত্য সাথী তারা সহজ সরল না হয়ে পারে না। আর এদের সংখ্যাই গ্রামে বেশী। আর কাল এদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তারা দিন দিন নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে আসছে। বস্তুতঃ এরা নেতৃত্বে এলেও অন্যদের অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটছে না। কারন, গ্রামীন সমাজে যে সব চালবাজী রয়েছে সে সবের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার সাধ্য সাধারন মানুষের নেই। আর তাই যুগের পর যুগ তারা নীরবে সহজ সরল জীবন যাপন করে আসছে। সাধারন মানুষদের পক্ষ থেকে আজকাল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে চললেও যে নেতৃত্বে আসছে সে-ও একই পথ অনুসরন করছে। অর্থাৎ সাধারন মানুষের উন্নতির জন্যে আজও তারা তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। সাধারন মানুষের উপর খবরদারী আজও অব্যাহত রয়েছে। আর এজন্যই গ্রামের মানুষের কাছ থেকে সঠিক তথ্য উদঘাটন করা সহজ নহে। জানা সত্ত্বেও কোন বিষয়ে তারা মুখ খুলতে রাজি নয়। কারন, তারা জানে, তাদের মুখ থেকে এলিটদের সম্পর্কে কোন তথ্য বের হলে তার পরিনতি অবশ্যই তাদের ভোগ করতে হবে। অপরদিকে, এলিটদের সাথে আলাপ করে বুঝার উপায় নেই যে, এত সহজ সরল আর অমায়িক ভদ্রলোকেরা নেতৃত্বে থাকতে গ্রামে আসলেই অশান্তি হয় কি করে। গ্রামের মানুষের জন্য দরদ নেই-সকল এলিটই এমন প্রকৃতির, একথা বলা সঠিক হবে না। কিন্তু জনদরদী -দের সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া, তাদের ক্ষমতা ও সম্পদ সীমিত। একদিকে সাধারন মানুষের পক্ষে তাদের জয় হলে অন্যদিকে তাদের চরম মূল্য দিতে হবে। আর তাই এই সীমিত সংখ্যক এলিটরা নিজেদের নিরপেক্ষ রাখার প্রয়াস পায়। গ্রামীন এলিটদের সংগে আলোচনা করে আমি দেখতে পেয়েছি যে, তারা অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র এবং সহজ সরল। তাদের কথা শুনে মনে হয় না যে, তারা কোন কূটিলতা পোষন করে। কিন্তু তাদের নিজেদের সম্পর্কে কিছু জানতে গেলে বেশীর ভাগ এতই সতর্কতা অবলম্বন করে যে, নিক্তিতে ওজন করে তবে কথা মুখের বের করে থাকে। তাদের বার্ষিক আয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেউ কেউ জানিয়েছে যে, ব্যবসাটা আসলে একটা 'শো' মাত্র -আয় বলতে কিছুই নেই, দৈনন্দিনের বাজার খরচ চলে মাত্র। এরূপ মন্তব্যের পরও তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং জমির আয়ের উপর ভিত্তি করে একটা বিবরন পেশ করা গেল।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা গেছে, শুধুমাত্র কৃষি নির্ভরশীল এলিটদের বার্ষিক আয় ১০ হাজার টাকার কম নহে। আর এদের সংখ্যা ১৮ জন। অপরদিকে, বাকী ২৮ জন এলিটের আয়ের সঠিক হিসাব তারা না দিলেও তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং জমি-জমার আয়ের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তাদের বার্ষিক আয় ২০ হাজার টাকার কম নহে। চেয়ারম্যান তিনজনের আয়ের কিছুটা তারতম্য রয়েছে। দু'জনের আয়ের উৎস কেবলমাত্র কৃষি। আর সেই হিসেবে তাদের বার্ষিক আয় ২০ হাজার টাকার উর্ধ্বে হবে না। অপর জনের বার্ষিক আয় জমি ও ব্যবসা মিলিয়ে ৩০ হাজা-র টাকা হবে। অপরদিকে, ভাইস-চেয়ারম্যান দু'জনের বার্ষিক আয়ের পরিমান জমি ও ব্যবসা মিলিয়ে ৩০ হাজার টাকার কম হবে না। কেননা, জমি ছাড়াও তাদের একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর মেম্বারদের মধ্যে ২জন মেম্বারের আয় সর্বাধিক। তাদের ১০ একর করে কৃষি জমি ছাড়াও একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই হিসেবে উক্ত ২জনের বার্ষিক আয় প্রায় ৪০ হাজার টাকা হবে। এই হিসাব সম্পূর্ণরূপে অনুমান ভিত্তিক দেখানো হয়েছে।[১৪]

উল্লেখিত তথ্য মতে দেখা যায়, এলিটগনের বার্ষিক আয় ১০ হাজার টাকা থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত। আয়ের দিক থেকে তারা নিম্নবিত্ত মানুষের চেয়ে শীর্ষ স্থানীয়, সন্দেহ নেই। ৩০ হাজার ও ৪০ হাজার টাকা আয়ের এলিটরা ছাড়া অন্যেরা সকলেই এক হিসেবে নিম্ন আয়ের লোক। দেখা গেছে, দীনমজুরের বার্ষিক আয় ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকার মত হয়ে থাকে। সমাজে উল্লেখিত উর্দ্ধ আয়ের এলিটগন ছাড়াও আরও অনেক অবস্থাপন্ন লোক রয়েছে। তাদের কেউ জনপ্রিয়তার অভাবে নির্বাচিত হতে পারে না, বা কেউ নির্বাচনে অংশ নেয় না। মোটকথা, এসব এলিটই ইউনিয়নদ্বয়ে অনেকটা অবস্থাপন্ন হিসেবে বিবেচিত। কেননা, সমাজের অপেক্ষাকৃত বিত্তবানদের সাথে তাদের খুব কম সংখ্যকেরই তুলনা করা চলে। তাই ধরে নেওয়া যায় যে, তারা মধ্যবর্তী অবস্থার লোক। তাদের চাল চলন ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের বেশীর ভাগ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সচ্ছল অবস্থায় বিবেচিত হলেও তারা নিজেদের মধ্যবিত্ত হিসেবেই দাবী করেছে। অত্র গবেষনার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.১ নং সারণী হতে ৩.৪ নং সারনী পর্যন্ত দেখানো হয়েছে যে, সামাজিক স্তর বিন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মোট ১২ জন এলিট নির্বা-চিত হয়েছে।

উল্লেখিত এলিটদের মধ্যে যাদের আয় ২০ হাজার টাকার উর্দ্ধে, তাদের কেউ সারের ডিলার, কেউ কাপড়ের ব্যবসায়ী, কেউ কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় দ্রব্যের ডিলার, বা কেউ ঔষধের ব্যবসায়ী। তাছাড়া, অন্য এলিটদের ১৬ জনেরই স্থানীয় বাজারে স্থায়ী ব্যবসা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর অন্যেরা ভ্রাম্যমান ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে । এসব ব্যবসায়ের মধ্যে রয়েছে ধান, চাউল, পাট, বিভিন্ন মওসুমী ফল ও অন্যান্য কাঁচা মালের ব্যবসা।

এলিটদের বার্ষিক আয়ের উপর ভিত্তি করে একথা বলা চলে যে, সাধারনভাবে তাদের আয় সম্পর্কে যেরূপ ধারনা করা হয়ে থাকে, আদৌ তেমনটি নয়। অপেক্ষাকৃত কম আয়ের এলিটরা যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নয়, তেমনি একেবারে নিম্নবিত্ত শ্রেণীরও নয় । নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবেই এদের বিবেচনা করা যেতে পারে।[১৫]

<u>এলিট পরিবারের আয়তন ও প্রকৃতি</u>

এলিট পরিবারের আয়তন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, পরিবারের আয়তন ও প্রকৃতির সাথে এলিটগনের সামাজিক মর্যাদা বেশীর ভাগ নির্ভর করে থাকে। তাছাড়া, এসব বিষয় আলোচনা ব্যতিরেকে জমি ও আয় সম্পর্কিত আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারন, জমি এবং আয়ের সংগেও পরিবারের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অত্র ইউনিয়নদ্বয়ে পরিবার প্রতি গড়ে সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬ জন। কিন্তু ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে নির্বাচিত এলিট পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ৭ জনেরও বেশী। আর তাদের সন্তান সংখ্যা গড়ে ৫ জনেরও বেশী। মোট ৪৬ জন এলিটের সন্তান সংখ্যা হলো ২৩৭। তন্মধ্যে ১৪৬ জন ছেলে এবং ৯১ জন মেয়ে। ৩ জন চেয়ারম্যানের সন্তান সংখ্যা হলো - ১ জনের ২ ছেলে ও ২ মেয়ে, ১ জনের ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে এবং অপর জনের ৬ ছেলে ও ৪ মেয়ে। দু'জন ভাইস-চেয়ারম্যানের সন্তান সংখ্যা হলো - ১ জনের ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে এবং অপর জনের ৬ ছেলে ও ২ মেয়ে। মেম্বারদের সন্তানদের মধ্যে ছেলের সংখ্যা হলো - ২ জনের প্রত্যেকের ১ টি করে, ১০ জনের প্রত্যেকের ২ টি করে, ১১ জনের প্রত্যেকের ৩ টি করে, ৮ জনের প্রত্যেকের ৪ টি করে এবং ১ জনের ৬ টি ছেলে রয়েছে। অপরদিকে, মেয়ের সংখ্যা হলো - ১১ জনের প্রত্যেকের ১ টি করে, ২৩ জনের প্রত্যেকের ২ টি করে, ৬ জনের প্রত্যেকের ৩ টি করে এবং ১ জনের ৪ টি মেয়ে রয়েছে। সর্বাধিক সংখ্যক ছেলে রয়েছে ১ জন মেম্বারের। তার ছেলের সংখ্যা হলো ৮। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ১জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ১ জন মেম্বার। তাদের প্রত্যেকের ছেলের সংখ্যা হলো ৬। এলিটগনের মেয়েদের সর্বাধিক সংখ্যা হলো ৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের তথ্য থেকে দেখা যায়, এলিটদের মাঝে ছোট পরিবার যেমন আছে, তেমনি বড় পরিবারও আছে। তবে ছোট পরিবারের সংখ্যা নিতান্তই কম। এসব এলিটের প্রত্যেকের পরিবারই একক পরিবার। গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ের কোন এলিট পরিবারকেই যৌথ পরিবারের অনুর্ভুক্ত দেখা যায়নি। ২ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন মেম্বার ছাড়া সকলেই একক পরিবারের পক্ষে জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছে। তারা মনে করে, পারিবারিক শান্তি-শৃংখলার জন্য একক পরিবারই শ্রেয়। এতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম থাকে। ফলে পরিবারে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা সহজ বলে তারা মনে করে। এমনকি বাস্তব অভিজ্ঞতায়ও তারা এরূপ ফলাফল পেয়েছে বলে জানায়। একক পরিবার সমর্থনকারীদের মতে যৌথ পরিবারও তেমন খারাপ নয়। যৌথ পরিবার টিকিয়ে রাখার জন্য পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি, সমবেদনশীলতা, হৃদ্যতা প্রভৃতি অপরিহার্য হলেও বর্তমান যুগে এসবের একান্তই অভাব বলে তারা মনে করে একই পিতার একাধিক সন্তান নিজেদের পরিজন নিয়ে একত্রে বসবাস করার আদি প্রথা আজ অনেকটা বিলুপ্তির পথে। একের প্রতি অপরের অবিশ্বাস, সংকীর্ণ মন-মানসিকতা, মত পার্থক্য এবং আত্মকলহ সংসারে যে অশান্তির সৃষ্টি করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহন করেই আজ তারা একক পরিবারকে শান্তির নীড় হিসেবে মনে করে। অপরদিকে, যৌথ পরিবার সমর্থকারী চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের মতে, যৌথ পরিবার আয়-উন্নতির জন্য বিশেষ উপযোগী। যৌথ পরিবারে সদস্য বেশী থাকে বলে আয় রোজগার বেশী হয়। এরূপ পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী হওয়ায় পরিবারের যে কেহ গ্রামীন রাজনীতিতে, এমনকি জাতীয় রাজনীতিতেও অতি সহজেই অংশ নিতে পারে। তাছাড়া, যৌথ পরিবার গ্রামে সর্বাধিক নিরাপদ থাকে। পরিবারের সদস্য সংখ্যার দিক বিবেচনা করে এরূপ পরিবারের উপর কোনরূপ হামলা করার বা কোন অমংগল সাধনের চিন্তা করার সাহস অপর কেউ পায় না। কিন্তু দেখা গেছে, যৌথ পরিবার সমর্থন করা সত্ত্বেও তারা অর্থাৎ ২ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন মেম্বার সকলেই একক পরিবারভুক্ত। জানা যায়, অল্প কিছুদিন আগে যৌথ পরিবার ভেঙে তারা একক পরিবার গড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সমর্থনের কারণ হিসেবে দেখা গেছে, যৌথ পরিবারভুক্ত থাকা অবস্থায় তারা যতটা শক্তি, সামর্থ্য ও প্রভাবের অধিকারী ছিল , বর্তমানে তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, একনিষ্ঠভাবে তারা এখন আর শুধুমাত্র গ্রামীন রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারে না। এখন সব ধরনের পারিবারিক ঝামেলার মোকাবেলা করে তবেই রাজনীতি করতে হয়। দেখা গেছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে যৌথ পরিবার প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। বিশেষ করে সমাজে প্রভাব বিস্তারের জন্যই তারা যৌথ পরিবার বজায় রাখার প্রয়াস পায়।

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিত এলিটদের মধ্যে ৬ জনের একাধিক স্ত্রী রয়েছে। ২ জন চেয়ারম্যানের প্রত্যেকেরই ২ জন করে স্ত্রী রয়েছে। দেখা যায়, ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যানের ২ জন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার সন্তান সংখ্যা হলো- ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। অপরদিকে, ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যানের ২ জন স্ত্রী থাকলেও নতুন স্ত্রীর ঘরে এখনও কোন সন্তানাদি জন্মেনি। আগের স্ত্রীর ঘরেই ৬ জন ছেলে ও ৪ জন মেয়ে জন্ম নিয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহের কারন হিসেবে ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত চেয়ারম্যান জানিয়েছেন যে, প্রথম স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান জন্ম না নেওয়ায় তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছেন। ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত চেয়ারম্যান জানান যে, প্রথম স্ত্রীর মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটায় সন্তানদের আদর যত্নের জন্য তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছেন। অপরদিকে, একাধিক স্ত্রী গ্রহনকারী অপর ৪ জন এলিটের সকলেই মেম্বার। একাধিক বিয়ের কারন তারা ব্যক্ত করেনি। তবে একজন মেম্বার তার সম্পত্তি সংরক্ষন তথা প্রদানকালে জানিয়েছিল যে, তার ৩ একর সম্পত্তির সবটুকুই শ্বশুর বাড়ী থেকে প্রাপ্ত। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, সম্পত্তি লাভই তার দ্বিতীয় বিবাহের কারন। অপর ৩ জনের একাধিক বিয়ের কোন কারন জানা যায়নি।

এখনকার গ্রামীন সমাজে একাধিক বিবাহ বেশ নিন্দনীয়। সমাজ এটাকে সহজে মেনে নেয় না। যারা কোন কারন বশতঃ দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হয়, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা আবেগ তাড়িত হয়ে একাধিক বিয়ে করে তারা প্রতি পদে পদে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। মানুষ একানু দায়ে না পড়লে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় না। সামাজিক মর্যাদাও তাদের তেমন থাকে না। দেখা গেছে, সন্তান না হলে বা প্রথম স্ত্রীর অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোন কারনে দ্বিতীয় বিবাহের প্রচলন এখানে খুবই কম। বিশেষ করে সামাজিকভাবে ধিকৃত হয় বলে একাধিক বিয়েতে খুব কম লোকই উৎসাহ বোধ করে।

পূর্ব অভিজ্ঞতা

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের পূর্ব অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কেননা অভিজ্ঞতা ছাড়া নির্বাচিত এলিটদের কার্য পরিচালনায় বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। অবশ্য নির্বাচিত হওয়া ছাড়াও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। পিতা বা পিতৃ-পুরুষদের কেহ বা কোন নিকট

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয় অতীতে গ্রামীন রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকলে তাদের সান্নিধ্যে থেকে পুরাপুরি না হলেও বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। তাদের কাছ থেকে গ্রামীন সমস্যাদি যেমন জানা যায়, তেমনি সে সব সমস্যা সমাধানে তারা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন তাও জানা যায়। তাই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ ৪'৪ নং সারনীতে দেখানো হলো। উল্লেখিত সারনীতে প্রদর্শিত তথ্য মতে দেখা যায়, ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান ব্যাগত, ভাইস-চেয়ারম্যান ২ জনেরই

সারনী নং - ৪'৪ : অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ[১৬]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	অনভিজ্ঞ এলিট	অভিজ্ঞ এলিট			মোট
			ইউ. বি.	ইউ. সি.	ইউ. পি.	
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	১	X	X	X	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ারম্যান	X	X	২	X	২
১৯৭৩	মেম্বার	১০	X	৩	X	১৩
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	X	X	১	১	২
১৯৭৭	মেম্বার	৩	X	X	১০	১৩
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	১	X	X	১	২
১৯৮৪	মেম্বার	৬	X	X	৭	১৩
	মোট	২১		৬	১৯	৪৬

পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। মেম্বারদের মধ্যে দেখা যায়, ১০ জন নবাগত এবং ৩ জন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। অনুরূপভাবে, ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের ২ জনই অভিজ্ঞ। এসময়ে মেম্বারদের ৩ জন অনভিজ্ঞ এবং ১০ জনই অভিজ্ঞ। ১৯৮৪ সনের এলিটগনের মধ্যে দেখা যায়, ১ জন চেয়ারম্যান ব্যাগত হিসেবে অনভিজ্ঞ। কিন্তু অপরজন পুনরায় নির্বাচিত। একই সময়ে মেম্বারগণের মধ্যে দেখা যায়, অনভিজ্ঞ মেম্বার ৬ জন এবং অভিজ্ঞ মেম্বার ৭ জন।

১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান ব্যাগত হলেও অনভিজ্ঞ নয়। কেননা, উক্ত চেয়ারম্যানের পূর্ব পুরুষদের কয়েকজনই ইউনিয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন কাউন্সিলে মেম্বার এবং চেয়ারম্যান ছিলেন। উক্ত চেয়ারম্যানের দাদা ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং তাহার আপন বড় ভাই ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাছাড়া, তার

Dhaka University Institutional Repository

আপন চাচাও ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। সুতরাং তাকে অনভিজ্ঞ না বলে বরং নবাগত বলাই সমীচীন হবে। অপরদিকে, ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান ২ জনেরই পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের ১ জন ১৯৪৯ সন থেকে এবং অপর জন ১৯৫৯ সন থেকে ইউনিয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। আর এই হিসেবে ২ জনেরই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মেম্বারদের বেলায় দেখা যায়, অনভিজ্ঞ রূপে চিহ্নিত ১০ জনের মধ্যে ৫ জন মেম্বার একেবারেই অনভিজ্ঞ। তাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্য থেকে কেউ কোন-দিন নির্বাচিত হয়নি। অপর ৫ জনের বেলায় দেখা যায়, তাদের পরোক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের ১ জনের নানা ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট , ১ জনের মামাতো ভাই, ২ জনের চাচা ও ১ জনের মামা ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। মোটকথা, ১৯৭৩ সনের ১৬ জন এলিটের মধ্যে কেবল ৫ জনই সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ এবং অপর ১১ জনের সকলেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অধিকারী।

১৯৭৭ সনে নির্বাচিত এলিটগনের মধ্যে ১৫ জনের অভিজ্ঞতা যাচা-ইয়ে দেখা যায়, ১২ জনেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে ১ জন ১৯৭৩ সনে এবং অপর জন ১৯৬৫ সনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এনির্বাচনে ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ ছিল না। মেম্বারদের বেলায় দেখা যায়, ১০ জনই অভিজ্ঞ। এনির্বাচনে কেবলমাত্র ৩ জন মেম্বার অনভিজ্ঞ। অভিজ্ঞ ১০ জনের কেউ কেউ ১৯৬৫ সনে নির্বাচিত মৌলিক গনতন্ত্রী ছিলেন। দেখা যায়, এরূপ ২ জন রয়েছেন। অন্যেরা ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অপরদিকে, অনভিজ্ঞ ৩ জনের মধ্যে ১ জন একেবারেই অনভিজ্ঞ। তার পূর্ব-পুরুষদের কেহই ইউনিয়নে প্রতিনিধিত্ব করেনি। কিন্তু অপর ২ জন মেম্বারের মধ্যে ১ জনের মামা ও অপর জনের চাচা ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রতিনিধি ছিলেন।

১৯৮৪ সনের এলিটগনের মধ্যে ৭ জনকে অনভিজ্ঞ দেখা যায়। অপর ৮ জন এলিট অভিজ্ঞ। এসময়ে ১ জন চেয়ারম্যান নবাগত এবং পুরাপুরি অনভিজ্ঞ। তার পূর্ব পুরুষদের কেহই কোনদিন নির্বাচিত হয়নি। অনভিজ্ঞ ৩ জন মেম্বারের অবস্থাও একইরূপ। বাকী ৩ জনের পরোক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের নিকট আত্মীয়গনের মধ্য থেকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। অপরদিকে, অভিজ্ঞ ৮ জনের সকলেই ১৯৭৭ সনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ সনের নির্বাচনে সর্বাধিক এলিটের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অর্থাৎ ৩টি নির্বাচনের মধ্যে একমাত্র ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক ১২ জন এলিট পুনরায় নির্বাচিত হয়েছে। গ্রামীন সমস্যা নিয়ে যারা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে এবং গ্রামের মানুষের মাঝে নিজেদের ঘনিষ্ঠ করে রেখে মানুষের প্রয়োজনে সাড়া দেয় বা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে, এমন ধরনের লোকেরা নির্বাচনে অংশ নিলে গ্রামের জনগন নিজ নিজ সুবিধা মত তাদের প্রতি সমর্থন জানায়। বিশেষ করে গ্রামের বিরাজমান দলগুলোর যে কোন একটাকে সমর্থন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারাই গ্রামে নেতৃত্ব দানের বিশেষ উপায় এবং এসব কাজে পারদর্শী লোকেরা পুনঃ পুনঃ নির্বাচিত হয়ে থাকে। দেখা গেছে, কয়েক জন মেম্বার ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি কোন নির্বাচনেই হারেনি। এমনকি চেয়ারম্যানদের বেলায়ও দেখা গেছে, গবেষনা চলাকালীন সময়ে যারা চেয়ারম্যানের পদে আসীন, তাদের একজন ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত হওয়ার পর আর পরাজিত হননি। আর একজন চেয়ারম্যান ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৮৪ সনে পরাজিত হলেও পরের নির্বাচনে তিনি আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন। আজকাল মানুষের মাঝে শ্রেণী চেতনার বিকাশ ঘটায় বিত্তবিত্তের লোকেরা নিজেদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্য অপর শ্রেণীগুলোর সাথেই কেবল প্রতিযোগিতা করছে না, স্ব শ্রেণীর সাথেও প্রতিযোগিতা করে চলছে। আর একারনেই তাদের প্রার্থী সংখ্যা প্রতিটি নির্বাচনে বেশী দেখা যায়। পাকিস্তান আমলে তারা প্রতিযোগিতায় আসতে পারেনি। কারন, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটলেও জমিদাররা বহাল তবিয়তেই ছিল।অর্থাৎ প্রশাসন এবং অফিস আদালতের হর্তাকর্তা মূলতঃ জমিদার গোষ্ঠীর সন্তান-সন্ততি বা তাদের আত্মীয়-স্বজনেরাই ছিল। আর তাই জমিদার গোষ্ঠী তখনও বাংলাদেশে ক্ষমতাবিহীন রাজা যেমন ছিল, তেমনি সমাজে তাদের প্রভাবও অক্ষুন্ন ছিল। সমাজের নেতৃত্বও ওই শ্রেণীটির হাতে সীমাবদ্ধ ছিল।শ্রেণী চেতনা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে গ্রামের লোকজন তার বিকাশ ঘটাতে পারেনি। একমাত্র ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনগুলোতেই সাধারন মানুষ তাদের শ্রেণী চেতনার স্ফুরন রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের এই চেতনা দিন দিন শানিত হচ্ছে।

এলিটদের সংস্কৃতি

এলিটদের সাংস্কৃতিক মনোভাব ও মূল্যবোধ আলোচনা করা অপরিহার্য। আধুনিক কালের দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থায় গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটরা সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনশীলতাকে কোন দৃষ্টিভংগীতে গ্রহন করছে, তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলে তা পরিস্কার হয়ে উঠবে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এসব এলিট কি প্রাচীনত্বকেই আঁকড়ে আছে নাকি পরিবর্তনশীল অবস্থাকে গ্রহন করার মন মানসিকতা তাদের রয়েছে - এসব বিষয় তাদের সংস্কৃতি আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। গ্রামে আজকাল নানা দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকা সত্ত্বেও গ্রামীন মানুষের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি রয়েছে।

এখানকার এলিটগন সকলেই মুসলমান এবং ইসলামী সংস্কৃতির অনুসারী। প্রায় প্রত্যেক এলিটের বাড়ীতেই জুম্মা বা পাঞ্জেগানা মসজিদ রয়েছে। তারা ইসলামী আকিদা ভিত্তিক ছেলে-মেয়েদের নাম রাখে, জন্মের পর আকিকা করে, নির্দিষ্ট বয়সে ছেলেদের খাতনা করে, ইসলামী শরীয়তানুযায়ী ছেলেমেয়েদের বিয়ে সম্পন্ন করে, মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে, মৃতকে জানাজা দিয়ে দাফন করে, টুপি ও পায়জামা পাঞ্জাবী পরে এবং তাদের স্ত্রীরা বোরখা পরে বাড়ির বের হয়। মোট ৪৬ জন এলিটের অধিকাংশকেই দাঁড়ি রাখতে দেখা গেছে। আর সব মুসলমানের মত তারাও পীরের ভক্ত এবং পীরের বাড়িতে গমন করে। সময়ে সময়ে নিজ নিজ পীরকে দাওয়াত করে এনে এলাকায় বা সংশ্লিষ্ট খানকায় ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলে আয়োজন করে। অন্যান্য মানুষের সাথে তারা মসজিদে গমন করে এবং নামাজ আদায় করে। নিজের ধর্ম পালনের পরও তারা পর ধর্মের প্রতি সহনশীল। হিন্দুদের পূজা পার্বন যাতে নির্বিঘ্নে সমাপ্ন হতে পারে সে জন্য তারা হিন্দুদের সাথে সহযোগিতা করে থাকে। এমনকি আমন্ত্রনক্রমে তাদের কেউ কেউ এসব অনুষ্ঠানে যোগদানও করে থাকে।

এলিটদের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করে তাদের শিক্ষার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে তথ্য বিশ্লেষন করা হয়েছে। সুতরাং একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাদের অধিকাংশই সাধারন ক্ষেত্রে যেমন সামান্য শিক্ষিত, তেমনি ধর্ম ক্ষেত্রেও। ফলে ধর্ম জ্ঞানে তারা তেমন পরিপক্ক নহে। তবে দীর্ঘ দিনের চর্চা হেতু ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে তারা আধুনিকতা বিমুখ নয়। এক সময়ে যখন কেরোলিন কাপড় নেমে ছিল, তখন স্বল্প জ্ঞানী কিছু আলেম ফতুয়া দিয়েছিল যে, এসব কাপড় ব্যবহার করা হারাম এ নিয়ে সাধারন মানুষের মাঝে বেশ তোলপাড় সৃষ্টি হয়। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই বিজ্ঞ আলেমরা ফতুয়া দেন যে, জামা কাপড় ব্যবহারের উপর মুসলমানী হুকুম নির্ভর করে না। সুন্নতী লেবাছ পরলে তাতে সওয়াব আছে, না পরলে গোনাহ হবে না। তাছাড়া, কেমন কাপড়ে লেবা-ছ তৈরী করতে হবে ইসলামে এমন কোন বিধান নেই। এমনকি মানুষের সংশয় দূর করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য তারা নিজেরা কেরোলিন কাপড়ের তৈরী জামা পরে ইসলামী জলসায় হাজির হতেন। রেডিও ব্যবহারের বিরুদ্ধেও এক সময়ে অনুরূপ ফতোয়া জারি করা হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞ আলেমদের হস্তক্ষেপে রেডিও ব্যবহারের বিষয়টিও নিষ্পত্তি হয়। একথা উল্লেখের কারন হলো- ইউনিয়ন পরিষদে নেতৃত্ব দান করা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে রাজনৈতিক এলিটরা ধর্মীয় এলিটদের উপর নির্ভর করেই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মানতে বাধ্য হয়। কারন, ধর্মভীরু জনগন সর্বদাই ধর্মীয় এলিটদের সম্মানের চোখে দেখে থাকে। অপরদিকে, ধর্মীয় এলিটগনের প্রদত্ত ফতোয়া মতে সাধারন মানুষ জীবন চালনা করার প্রয়াস চালায় বলে রাজনৈতিক এলিটরা তাদের বিরুদ্ধাচরন করাকে জনগনের বিরুদ্ধাচরন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের এলিটগনের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা যাহাই থাকুক কেন, আধুনিক রুচিবোধ তাদের বেশ রয়েছে। দেখা গেছে, প্রায় প্রত্যেক এলিটেরই নিজস্ব রেডিও রয়েছে। মোট ৪২ জন রাজনৈতিক এলিটের উপর এবিষয়ে গবেষনা চালিয়ে দেখা যায়, মোট ৩৮ জন এলিটই রেডিও-এর মালিক। ৪·৫ নং সারনীতে এতদসম্পর্কিত তথ্য পেশ করা হয়েছে। উক্ত তথ্য মতে দেখা যায়, ১৯৭৩ সনের ১৩ জন এলিটের মধ্যে ১১ জনেরই রেডিও আছে।

সারনী নং - ৪·৫ ঃ রেডিও-এর মালিকানা অনুযায়ী এলিটের শ্রেণী ভাগ[১৭]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	রেডিও আছে	রেডিও নাই	শুনেনা	শুনে	নিয়মিত	অনিয়মিত	মোট
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	১	X	X	১	১	X	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ারম্যান	২	X	X	২	২	X	২
১৯৭৩	মেম্বার	৮	২	১	৯	৭	২	১০
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	২	X	X	২	২	X	২
১৯৭৭	মেম্বার	১১	১	X	১২	১০	২	১২
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	২	X	X	২	২	X	২
১৯৮৪	মেম্বার	১২	১	২	১০	১১	২	১৩
	মোট	৩৮	৪	৩	৩৮	৩৫	৬	৪২

উক্ত নির্বাচনে একজন চেয়ারম্যানের নিজের রেডিও আছে এবং তিনি একজন নিয়মিত শ্রোতা

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে ২ জন ভাইস-চেয়ারম্যানেরও নিজস্ব রেডিও রয়েছে এবং তারা নিয়মিত শ্রোতাও। অপরদিকে, মেম্বারদের মধ্যে মোট ৮ জনের রেডিও আছে এবং এদের মধ্যে ৭ জনই নিয়মিত রেডিও শোনে। মাত্র ২ জন মেম্বারের নিজস্ব রেডিও নেই। তবে রেডিও না থাকা সত্ত্বেও তাদের একজন অনিয়মিত রেডিও শোনে। ১৯৭৩ সনের উল্লেখিত এলিটদের সকলের মাঝেই এই প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে যে, তারা দেশ-বিদেশের খবর জানতে আগ্রহী এবং তারা রেডিও রাখে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে তাদের এরূপ অভ্যাস গড়ে উঠেছে এবং অদ্যাবধি তারা নিয়মিত রেডিও শুনে যাচ্ছে। অধিকাংশ এলিটই জানিয়েছে যে, তারা দেশীয় খবর শোনা ছাড়াও বিদেশের খবরও শুনে থাকে। বিশেষ করে বি বি সি, ভয়েস অব আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশী প্রচার মাধ্যমের খবর তারা নিয়মিত শুনে থাকে।

১৯৭৭ সনে নির্বাচিত এলিটদের মধ্যে ১৪ জন এলিটের মাত্র ১ জন ছাড়া সকলেরই রেডিও রয়েছে। নিজস্ব রেডিও থাকা ১৩ জন এলিটের মধ্যে ১২ জন নিয়মিত রেডিও শোনে। এসময়ে ২ জনকে অনিয়মিত শ্রোতা হিসেবে দেখা যায়। নিজস্ব রেডিও থাকা সত্ত্বেও ১ জন অনিয়মিত শ্রোতা এবং রেডিও না থাকা সত্ত্বেও অপর ১ জন অনিয়মিত শ্রোতা। এরাও দেশের খবর শুনেই সন্তুষ্ট নয়, বিদেশের খবরও শুনে থাকে। ১৯৭৩ সনের এলিট-দের মত তারাও পূর্বোল্লেখিত মাধ্যমগুলোর খবর শুনে থাকে। এদের কেউ কেউ চীন এবং পাকিস্তানের বাংলা অনুষ্ঠান শুনে বলে জানিয়েছে।

১৯৮৪ সনের এলিটগনের ১৫ জনের মধ্যে মোট ১৩ জনের নিজস্ব রেডিও আছে। ১৫ জন এলিটের ১৩ জনই নিয়মিত শ্রোতা এবং বাকী ২ জন অনিয়মিত শ্রোতা। রেডিও না থাকা সত্ত্বেও ১ জন এলিট অনিয়মিতভাবে রেডিও শুনে থাকে। পূর্ববর্তী এলিটগনের মত এরাও দেশের খবর শোনার পাশাপাশি বিদেশের খবর শুনে থাকে। দেখা যায়, এদের অনেকে অনেক দেশের বাংলা অনুষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত। চীন, পাকিস্তান, ভারত, মস্কো, সৌদি আরব, ম্যানিলা, জার্মানি বেতার তরংগ প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের নাম এবং প্রচারের সময় সম্পর্কে তারা বেশ ওয়াকেবহাল। তাদের কথিত সময় এবং প্রচার মাধ্যম সম্পর্কিত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কথিত সময়ে রেডিও চালু করে দেখা গেছে যে, তাদের প্রকাশিত তথ্য পুরাপুরি সত্য। তাদের উল্লেখিত মাধ্যমগুলো থেকে নিয়মিত অর্থাৎ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়, ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচন তিনটিতে নির্বাচিত এলিটদের মধ্যে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত এলিট ৪২ জনের মধ্যে ৩৮ জনের নিজস্ব রেডিও আছে এবং এদের ৩৫ জনই নিয়মিত শ্রোতা। অপরদিকে, মাত্র ৩ জন এলিটকে অনিয়মিত শ্রোতা হিসাবে দেখা যায়।

আধুনিক কালের প্রচার মাধ্যমগুলোর মধ্যে আজকাল টেলিভিশনও গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাই এবিষয়েও কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের এলিটগনের টেলিভিশন আসক্তি সম্পর্কিত তথ্য ৪·৬ নং সারনীতে প্রদর্শিত

সারনী নং - ৪·৬ : টেলিভিশনের মালিকানা ও দর্শনের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ[১৮]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	টি ভি আছে	টি ভি নাই	টি ভি দেখে	টি ভি দেখেনা	নিয়মিত	অনিয়মিত	মোট
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	X	১	১	X	১	১	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ারম্যান	X	২	২	X	১	১	২
১৯৭৩	মেম্বার	১	১০	৮	৩	৩	৫	১১
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	X	২	২	X	১	১	২
১৯৭৭	মেম্বার	১	১০	৮	৩	৩	৫	১১
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	১	১	২	X	১	১	২
১৯৮৪	মেম্বার	২	১১	৯	৪	৭	২	১৩
	মোট	৫	৩৭	৩২	১০	১৭	১৫	৪২

হয়েছে। দেখা যায়, ৪২ জন এলিটের মধ্যে মাত্র ৫ জনেরই টেলিভিশন আছে। এদের মধ্যে ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ১ জন, ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত ১ জন এবং ১৯৮৪ সনে নির্বাচিত ৩ জন টেলিভিশনের মালিক। ৪২ জন এলিটের মধ্যে ৩২ জন এলিট টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে থাকে। এদের মধ্যে ১৯৭৩ সনের ১১ জন, ১৯৭৭ সনের ১০ জন এবং ১৯৮৪ সনের ১১ জন এলিট রয়েছে। জানা যায়, ৫ জন এলিট টেলিভিশনের মালিক হলেও অন্য দর্শক এলিটরা

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রামীন ক্লাবের টেলিভিশনে অনুষ্ঠান দেখে। ৩২ জন দর্শকের মধ্যে ১৭ জন এলিট নিয়মিত দর্শক এবং বাকী ১৫ জন অনিয়মিত দর্শক। অবশিষ্ট ১০ জন এলিট টেলিভিশনের কোন অনুষ্ঠানই দর্শন করে না। জানা যায়, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে তারা ব্যবসা বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে না।

সংবাদ-পত্রের প্রতিও এলিটদের দৃষ্টিভংগী উল্লেখ করা দরকার। এতদসংক্রান্ত তথ্য ৪°৭ নং সারনীতে প্রদর্শিত হলো। তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিত এলিট গনের মধ্যে মোট ৪৩ জনের উপর গবেষনা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে, খবরের কাগজের প্রতি ২৫ এলিটের আসক্তি রয়েছে। বাকী ১৮ জন এলিট খবরের কাগজ পড়ে না। দেখা গেছে, দুটি

সারনী নং ৪°৭ : খবরের কাগজ পঠন অনুযায়ী এলিটের শ্রেণী ভাগ[১৯]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	খবরের কাগজ পড়ে	খবরের কাগজ পড়ে না	খবরের কাগজ নিয়মিত	খবরের কাগজ অনিয়মিত	মোট
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	১	X	১	X	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ারম্যান	২	X	১	১	২
১৯৭৩	মেম্বার	৫	৬	৩	২	১১
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	২	X	২	X	২
১৯৭৭	মেম্বার	৮	৫	৪	৪	১৩
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	২	X	১	১	২
১৯৮৪	মেম্বার	৫	৭	৩	২	১২
	মোট	২৫	১৮	১৫	১০	৪৩

ইউনিয়ন পরিষদ অফিসেই খবরের কাগজ রয়েছে। এদের একটিতে ইত্তেফাক এবং অপরটিতে ইনকিলাব পত্রিকা দেখা গেছে। ৪৩ জন এলিটের মধ্যে ২৫জন খবরের কাগজ পাঠক। এদের মধ্যে ১৫ জন নিয়মিত এবং ১০ জন অনিয়মিত পাঠক। ১৯৭৩ সনে নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা ৫ এবং অনিয়মিত পাঠকের সংখ্যা ৩। একমাত্র মোট ১৪ জন এলিটের মধ্যে নিয়মিত অনিয়মিত মিলিয়ে মোট ৮ জন এলিট খবরের কাগজ পাঠক। অবশিষ্ট ৬ জন খবরের কাগজ

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ করে না। অপরদিকে, ১৯৭৭ সনের ১৫ জন এলিটের মধ্যে ১০ জন এলিট খবরের কাগজ পড়ে। এদের মধ্যে ৬ জন নিয়মিত এবং ৪ জন অনিয়মিত পাঠক। এসময়ের পাঁচজন এলিট খবরের কাগজ পাঠ করে না। একইভাবে ১৯৮৪ সনের ১৪ জন এলিটের মধ্যে ৭ জন খবরের কাগজ পড়ে। তন্মধ্যে ৪ জন নিয়মিত এবং ৩ জন অনিয়মিত পাঠ করে থাকে। তিনটি নির্বাচনে ৪৩ জন এলিটের মধ্যে মোট ১৮ জন খবরের কাগজ মোটেই পাঠ করে না।

খবরের কাগজ পাঠ করা মূলতঃ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। এলিটদের শিক্ষা-গত যোগ্যতা সম্পর্কে শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এলিট পরিবারগুলোতে ধর্মীয় ভাবধারা যেমন রয়েছে, তেমনি আধুনিকতারও ছোঁয়া তারা পেয়েছে। তাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। আর এব্যাপারে তাদের মধ্যে এতই আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে যে, তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার খরচ থেকে তারা ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজের খরচের টাকা কেটে রাখে। অর্থাৎ তারা দৈনন্দিনের খরচ সংক্ষেপ করে ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনীয় খরচের টাকা হাতে রাখে। একজন প্রবীন এলিট এপ্রসংগে বলেছেন,'আমরা লেখা-পড়া শিখিনি, শিখতে পারিনি। কেন পারিনি,তা বলব না। আমাদের নিরক্ষরতার সুযোগে আমরা অনেক কিছুই হারিয়েছি। তাই আমাদের ছেলে-মেয়েদের আমরা সাধ্য মত শিক্ষিত করব।'

এলিটদের আত্মীয়তার বন্ধন

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত এলিটরাই যে, সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, তা নয়। এরা ছাড়াও সমাজে আরও অভিজাত শ্রেণীর লোক রয়েছে ,যারা গ্রামীন রাজনীতিতে জড়ায় না, বা গ্রামীন রাজনীতি পছন্দ করে না, বা জন সমর্থন নিয়ে নির্বাচিত হতে পারে না। কিন্তু তবুও তারা গ্রামীন রাজনীতিমুক্ত নয়। কারন, তারা কোন না কোনভাবে গ্রামীন রাজনীতির সাথে জড়িত রয়েছে। প্রত্যেক সমাজেই বিত্তবানের আলাদা স্থান ও সম্মান রয়েছে। এমনকি সমাজের সর্বত্র তাদের প্রভাব বিদ্যমান। গ্রামীন রাজনীতি যারা পরিচালনা করে তারা কোনভাবেই সমাজের এই বিত্তবান শ্রেণীর প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে না। কেত্র বিশেষে তাদের হাতের পুতুলের মত তাদের স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য হয়। কেননা, যারা বিত্ত-বান তাদের ছেলে-মেয়েরা শহরে থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করে এবং এসব ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

-স্বজন জাতীয় রাজনীতির সংগে জড়িত থাকে।[২০] অনেক বিত্তবানের ছেলে সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাও রয়েছে। ফলে গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটরা কখনও বিত্তবানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পায় না। কেননা, স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধি হওয়ায় নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে তারা বেশ ওয়াকেবহাল আছে। অপরদিকে, বিত্তবানদের সাথে এলিটদের কারও কারও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। দেখা গেছে, ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ও ১৯৭৭ সনে পুনরায় নির্বাচিত চেয়ারম্যানের আত্মীয়তার সম্পর্ক দেশের একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সাথেও রয়েছে। দু'টি ইউনিয়নের মোট ৪৬ জন এলিটের মধ্যে ২৬ জন এলিটরেই একের সাথে অপরের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গেছে। সমাজের বিত্তবানদের সাথেও তাদের অনেকেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এলিটদের সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনায় তাদের আর্থিক সংগতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, তাদের অধিকাংশই নিম্ন মধ্য-বিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। কাজেই কোন বিষয়ে বিত্তবানদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের সাথে এঁটে উঠা সম্ভব নয়। একদিকে এলিটদের মাঝেই বিত্তবানদের আত্মীয়-স্বজন যেমন রয়েছে ভিন্ন মত পোষনকারীদের প্রতিহত করার জন্য, আর একদিকে তেমনি রয়েছে তাদের আর্থিক সংগতি। সমাজের বিত্তবানরা সব সময় বিত্তবানদের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে। তবে দেখা গেছে, এখানে মাঝে মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রমও ঘটেছে। অবশ্য এমন ঘটার কারনও আছে। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সাথে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আত্মীয়তা স্থাপনের পিছনে রয়েছে বিত্তবানদের দৃষ্টিতে ছেলের যোগ্যতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এরূপ অবস্থার দরুনই উচ্চ আর নিম্ন বিত্তের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে।

অত্র গবেষনায় উল্লেখিত এলিটগনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বিশ্লেষনে দেখা গেছে, ৫ জন এলিটের আত্মীয়তার সম্পর্ক উচ্চবিত্তের সাথে যেমন রয়েছে, তেমনি নিম্ন-বিত্তের সাথেও রয়েছে। এই এলিটগন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। গবেষনায় দেখা গেছে, মোট ২০ জন এলিট বংশ খেতাব ব্যবহার করেছে। কারও কারও খেতাব আবার একই রকম হয়েছে। এর কারন, হলো- এক গ্রামের বংশ খেতাব অপর গ্রামের খেতাবের সাথে মিলে যায়। আর তাই দেখা গেছে, একই ইউনিয়নে অনেক গ্রামের লোককেই একই খেতাব ব্যবহার করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ভূঞা খেতাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের অনেক গ্রামেই এই খেতাবের লোক দেখা যায়। বংশ খেতাব ব্যবহারকারী এলিটরা হয়তো কোন এক

Dhaka University Institutional Repository

সময় বিত্তশালী ছিল। এমনকি তাদের মর্যাদাও হয়তোবা ছিল। এদের ব্যবহৃত বংশ খেতাব হলো -মিয়াজী, মজুমদার, ভুক্তা, পাটোয়ারী, মিয়া প্রভৃতি। মিয়া খেতাব ব্যবহারকারী এলিটদের পারিবারিক অবস্থান বিচারে দেখা গেছে, পূর্বোল্লেখিত মিয়া পরিবারের সাথে তারা কোনভাবেই সম্পর্কযুক্ত নয়। একজন চেয়ারম্যানের ব্যবহৃত মিয়া খেতাব তার পরিবারের তথা বংশ খেতাব। বলা যায়, এদের ব্যবহৃত মিয়া কোন বংশ খেতাব নয়, সাধারন অর্থে বা নামের সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। মিয়াজী খেতাব যারা ব্যবহার করেছে তারা আসলে অনেক আগে থেকেই এরূপ খেতাবে পরিচিত। অন্যান্য খেতাব ব্যবহারকারীদের বেলায় সামান্য কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে মাত্র। ভুক্তা খেতাব ব্যবহার করেছে কয়েকজন। অতীতে ভুক্তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা থাকলেও আজ তাদের অনেকে ভূমিহীন অবস্থায় কেবল খেতাবটাই ধরে রাখতে পেরেছে। জানা গেছে, ভুক্তা খেতাবধারী একজন এলিট মিয়া পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ। মজুমদার ব্যবহারকারী ৪ জন এলিটের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নিম্ন মধ্যবিত্ত হিসাবে ধরা যায়। এরূপ বংশ খেতাবধারীদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায় না। এলাকায় এরা সাধারন মানুষ হিসেবে পরিচিত। একজন মজুমদার খেতাবধারী এলিট মিয়া পরিবারের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কথা জানালেও মিয়া পরিবারের এলিটের এব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে তিনি এরূপ সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। অবশ্য উভয়ের উপস্থিতিতে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে সত্যতা যাচাই করা যেত। তবে একথা সত্য যে, বেশীর ভাগ এলিটের আত্মীয়তা তাদের সমপর্যায়ের লোকের সাথেই গড়ে উঠেছে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, এলিটদের শিক্ষা ও জমির মালিকানার উপর ভিত্তি করে ২৬ জন এলিটকে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অপর ২০ জনের মধ্যে ৬ জন উচ্চবিত্ত শ্রেণীর এবং ১৪ জন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এলিট। এলিটগন প্রশ্নের জবাব দানকালে প্রায় প্রত্যেক এলিটই নিজেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে দাবী করলেও সামগ্রিক অবস্থার বিচারে উচ্চবিত্তের ৬ জন ছাড়া বাকী ৪০ জন এলিটের ১৪ জন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং ২৬ জনকে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হিসেবে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী

গ্রামীন রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীর ভূমিকায় রয়েছে এলিটরা। জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, কাজেই এমন গুরুত্ব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভংগী এবং মুল্যবোধ বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদের এসবের উপর ভিত্তি করেই ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রামীন জনগনের কল্যান সাধনের এই প্রতিষ্ঠানটিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কি মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে তা বিশ্লেষন করা অপরিহার্য। এসব বিশ্লেষন করার জন্য নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো নেওয়া হয়েছে :-

১) জনসাধারনের সমস্যা অনুধাবন ও সমাধানের উপায় দানের ক্ষমতা

সমাজ একটা গতিশীল সত্তা। প্রতিনিয়ত তার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আর তাই সমাজে নিত্য নতুন সমস্যার মোকাবেলা করছে। এসব সমস্যা অনুধাবন করা গ্রামীন জনপ্রতিনিধিদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। সমস্যা অনুধাবন যারা করতে পারে, সমাধানের উপায় তাদের কিছু না কিছু জানা থাকবেই। গ্রামীন সমস্যা চিহ্নিতকরন এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে এলিটদের সচেতনতার বিষয়টি এখানে আলোচনা করা গেল।

সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদারও যে পরিবর্তন ঘটে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে না পারলে কোন সমস্যারই সমাধান বের করা সম্ভব নয়। নীতি নির্ধারন বা সিদ্ধান্ত নিতে হয় সমস্যার আলোকে। কাজেই সমস্যা অনুধাবন করতে না পারলে সিদ্ধান্ত গ্রহনের কোন মূল্যই থাকেনা। কেননা, সমস্যার সংগে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ওৎপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। " One important function of leadership is to correctly perceive the needs of the community in a given situation."[১] সুতরাং গ্রামীন নেতৃত্ব এমন হওয়া দরকার, যা গ্রামের সাধারন মানুষের সমস্যাদি প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সব সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবে।

গ্রামীন সমাজ ও গ্রামের মানুষ আজ এতই অবহেলিত যে, তারা শুধু জনসংখ্যার অংশ হিসাবেই বিবেচিত হয়, নাগরিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধার ভাগ বাটোয়ারা তাদের ভাগ্যে জোটেনা। কারন, অতীতে যারা নেতৃত্বে এসেছিল তাদের না ছিল শিক্ষা, আর না ছিল সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করার দক্ষতা। আভিজাত্য আর বংশ গৌরব পুঁজি করেই তারা ক্ষমতায় এসেছিল। তাছাড়া, সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে তখনও শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি। অধিকন্তু, শিক্ষিত লোকেরা যেমন দিন দিন শহরমুখী

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে চলছে, তেমনি তারা গ্রামীন রাজনীতিকেও অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে। এর ফলে গ্রাম কেবল প্রাকৃতিক শোভার লীলা ভূমিই হয়ে আছে। আধুনিকতার পরশ এখনও পায়নি। শহরের প্রতিটি ধনিকনার যোগানদার হলো গ্রাম। শহরের বহুতল বিলাসবহুল ইমারতগুলোর অবয়ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ইটের মাটিটুকুও অবহেলিত গ্রাম থেকে সরবরাহ হয়ে থাকে। কিন্তু বিনিময়ে গ্রামগুলো কিছুই পায় না। আপনার ভাগ্যের উপর ভর দিয়ে গ্রামের মানুষ আজও তাদের জীবন চালনা করছে। সমস্যা জর্জরিত গ্রামীন মানুষ তাদের সমস্যা তুলে ধরার সামর্থ্য যেমন রাখে না, তেমনি তারা সে রকম সচেতন বা সংগঠিতও নয়। এমতাবস্থায় গ্রামের সমস্যা চিহ্নিতকরনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। এবং শিক্ষিত, সচেতন ও বিচক্ষন নেতৃত্বের।

অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য নির্বাচিত এলিটদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জবাব বেশ সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এলিটদের চিন্তাধারা ও উপলব্ধি অনুসারে দেখা যায়, ইউনিয়নদ্বয়ের লোকজন অনেক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। মানুষের মৌলিক চাহিদা হল অন্ন ও বস্ত্র। অবশ্য এসমস্যা কেবল এখানকারই নয়, গোটা দেশের। কিন্তু তথাপি প্রশ্নের জবাবদাতা এলিটরা যেভাবে খাদ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে তাতে এটা উপলব্ধি করা সহজ যে, এখানে মানুষের জীবন বেশ দুর্বিষহ। মোট ৪৬ জন জবাব দাতার ৪০ জনই খাদ্য সম্পর্কে একমত পোষন করেছে যে, খাদ্য সমস্যা এখানে প্রকট। তাদের মতে, এখানকার শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী। আর এদের ৮০% ভাগই শ্রমজীবী। অর্থাৎ অন্যের কাছে শ্রম বিক্রী করে। নিজের জমিতে ফলানো ফসলে ওদের অন্নের সংস্থান হয় না। এখানে প্রায় ২০% ভাগ লোকই ভূমিহীন।[২] ফলে খাদ্যই এখানকার জনগনের প্রধান সমস্যা। খাদ্য সমস্যার কথা এক বাক্যে সকলে স্বীকার করেছে সত্য, তবে মাত্র ৬ জন এলিট এব্যাপারে ততটা গুরুত্ব দেয়নি। তাদের মতে, এটা জাতীয় সমস্যা, স্থানীয়ভাবে এর সমাধান সম্ভব নয়। এলিটদের সমস্যা নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শিক্ষা। ৪৬ জন এলিটের ৩৬ জনই শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। খাদ্যের পরেই তারা শিক্ষাকে আসল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদের মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শিক্ষা সামগ্রীই মূল সমস্যা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তারা চায় কিনা, এপ্রশ্নের জবাবে তারা জানায়, শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেই জনগন শিক্ষিত হবে না। মূল সমস্যার সমাধান দরকার। গরীব মানুষের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুব্যবস্থাই শিক্ষা সমস্যা দূর করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শিক্ষিতের হার বাড়বে। তাছাড়া, বর্তমান সময়ে জনগনের মাঝে এই চেতনা জেগেছে যে, শিক্ষা ছাড়া বর্তমান সমাজে বাঁচার উপায় নেই। কাজেই শিক্ষা সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে জনসাধারনের যে অসামর্থতা তা নিরসনই শিক্ষা সমস্যা দূরীকরনের আসল উপায়

Dhaka University Institutional Repository

বলে তাদের ধারনা। অপর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে চিকিৎসা সমস্যা। মোট ৩০ জন এলিট এ সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কৃষি সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে ২০জন এলিট। কর্মসংস্থান ও জনসংখ্যা সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে যথাক্রমে ২৭জন ও ৩৫জন এলিট এবং যাতায়াত সমস্যার কথা বলেছে ২৩জন এলিট।

খাদ্য সমস্যাকে ৪০জন এলিট গুরুত্ব এবং প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার পর এই সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কে তারা সকলে একমত হতে পারেনি। ৪০জনের সকলেই মনে করে কৃষি সমস্যাই খাদ্য সমস্যার অন্যতম কারন। কৃষি সমস্যার প্রতি আলাদা ভাবে ২০জনের সমর্থনের কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। অধিক পরিশ্রম, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি শ্রমিকদের সারা বছরের কর্মসংস্থান প্রভৃতি খাদ্য সমস্যার সমাধান দিতে পারে বলে তারা মনে করে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানি সেচের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। কেননা, এখানে কোন নদী নেই এবং এখানকার খাল বিল পুকুর মওসুম শুরুর আগেই শুকিয়ে যায়। তাছাড়া, এখানে অসংখ্য পুকুর ও বেশ কয়েকটা দীঘি থাকলেও সব গুলোই অগভীর। এগুলোর পানি দ্বারা ইরি বোরো চাষ করা সম্ভব হয় না। অনাবৃষ্টির সময়ও পানির অভাবে ফসল উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা থাকে না। এজন্য গ্রামে গ্রামে গভীর নলকূপ স্থাপন করা অপরিহার্য। কৃষি বীজ, কৃষি সামগ্রী, সার, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি চাহিদা মত সরবরাহ করাও কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বলে তারা মনে করে। তাছাড়া, চাষাবাদের জন্য আজ আর কাষ্ঠের লাঙ্গল ব্যবহার উপযোগী নয়। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য ফসলের বাড়তি উৎপাদন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। আর এজন্য কলের লাংগলের ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারী কোন উদ্যোগ তারা দেখতে পায় না। কৃষকদের দুর্দিনে প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণের অভাবে তারা আর্থিক দুরাকার প্রতিশ্রুতি -তে গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নেয়। কৃষকরা এভাবে দিন দিন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। কৃষক কৃষকের উন্নতি ছাড়া কৃষির উন্নতি সম্ভব নহে। আর কৃষির উন্নতি না হলে খাদ্য সমস্যাও দুর হবে না বলে এলিটদের বিশ্বাস। এদের কেউ কেউ একথাও উল্লেখ করেছে, এখানে কোন খাদ্য গুদাম নেই, যা এখানকার জন্য অপরিহার্য। পাটের উৎপাদন নিয়ে তারা নেতিবাচক জবাব দিয়েছে। তাদের উৎপাদন খরচের চেয়েও অনেক কম মূল্যে পাট বিক্রী করতে হয় বলে আজকাল তারা পাট উৎপাদনে আগ্রহী নয়। পাটের এই দুরাবস্থার জন্য তারা পাটের চোরাচালানকে দায়ী করে বলেছে যে, ভারতে পাটের পাচার বন্ধ করে বিদেশের সাথে বানিজ্যিক চুক্তিতে পাট

Dhaka University Institutional Repository

চালান না দিলে আগামী দিন গুলোতে কেবল নিজেদের প্রয়োজনীয় রশি পাকানোর জন্যই তারা পাটের চাষ করবে।

শিক্ষা সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাদের ধারনা ইতিপূর্বে কিছুটা ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রতি ঘরে ঘরে তারা শিক্ষিত লোক দেখতে চায়। ১জন চেয়ারম্যান ও ৯জন মেম্বারসহ মোট ১০জন এলিট শিক্ষার বৈষম্য দুর করার প্রতি বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। শহরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য যেভাবে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল গুলোতে ভীড় জমছে তাতে অল্পকাল পরে সাধারন শিক্ষা গ্রাম্য মানুষের শিক্ষারূপে পরিগনিত হবে বলে তারা মনে করে। গ্রামে গ্রামে হাই স্কুল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কলেজ স্থাপনের প্রতিও তারা গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া, গ্রামীন শিক্ষিত মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে বলেও তারা মনে করে।

পৌঁছাটি ইউনিয়নদ্বয়ের কোনটিতে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। গ্রামের হাতুড়ী ডাক্তার, হেকিম, বৈদ্যরাই এখানকার মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা। ৪৬জন এলিটের মধ্যে ৩০জন এলিটই এমন মন্তব্য করেছে। জনগনের চিকিৎসার জন্য অন্তুতঃ দু'টো ইউনিয়ন মিলে একটা পল্লী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপিত হলেও জনগনের অনেক উপকার হবে বলে তাদের বিশ্বাস।

অন্যান্য চিহ্নিত সমস্যাবলী সমাধানের উপায় সম্পর্কেও তাদের ধারনা বেশ পরিস্কার। গ্রামীনমানুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তারা গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলকারখানা স্থাপন করার পক্ষপাতী। কারণ, বছরের ৩ থেকে ৪মাস কৃষি কাজ করার পর সীমাহীনদুর্ভোগ নিয়ে বছরের বাকী সময়টা কৃষি শ্রমিকেরা কাটাতে বাধ্য হয়। এই অবসর সময়টাতে তাদের যে কোন একটা কাজে লাগানো গেলে কেবল তাদেরই নয়, দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। তাছাড়া, গ্রামীন পর্দানশীল মহিলারা যাতে ঘরে বসেই কাজ করতে পারে সে জন্য প্রতিটি গ্রামে কুটির শিল্প গড়ে তোলা অপরিহার্য বলে তারা মনে করে। এতে গ্রামীনমানুষের এবং সরকারেরও লাভ হবে। গ্রামীনমহিলারা ঘরে বসে বাঁশ ও বেতের যে সব জিনিস তৈরী করে সে সবের মান উন্নয়নপূর্বক বিদেশে রপ্তানীর ব্যবস্থা করার সরকারী উদ্যোগ প্রয়োজন বলে তারা মত পোষন করে। এভাবে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে এলিটদের ধারনা ব্যক্ত করার পাশাপাশি কেউ কেউ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কথাও বলেছে। উঁচু উঁচু রাস্তা ঘাট করা, খাল খনন করা প্রভৃতিকে তারা গ্রামের উন্নয়নের পূর্ব শর্ত বলে বিবেচনা করে। ৪০জন এলিট জনসংখ্যা সমস্যাকে গুরুতর সমস্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের মতে, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রন বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এলিটরা স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কার ধারনা পোষন করে থাকে। গ্রামীন মানুষের সমস্যা উপলব্ধির পাশাপাশি সমাধানের ব্যাপারেও তাদের ধারনা মোটামুটি স্পষ্ট। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যদিও সকল এলিট পরিষদ তার পরিচয় দিতে পারেনি, তথাপি একথা সত্য যে, সামান্য লিখিত এসব এলিট সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশের ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ নহে। অবশ্য পর্যি এলিট তথা চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানগন সমস্যা বিশ্লেষন ও সমাধানের ব্যাপারে যেরূপ ধারনা পোষন করে, তা তাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা পরিক্ষার অর্থেই বহন করে।

সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত এলিটদের ধারনা সংমিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এসব সমস্যার কতটা সুরাহা হয়েছে, এতদসম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে ইতিবাচক সাড়া কেহই দিতে পারেনি। চেয়ারম্যানগন জানিয়েছেন যে, তাদের নিজস্ব কোন ফান্ড নেই- সরকার প্রদত্ত সাহায্য একমাত্র ভরসা। আর সরকার থেকে যা পাওয়া যায়, তা সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, সরকারী সাহায্যের সবটুকু তারা ইউনিয়ন পরিষদের কাজে ব্যয় করতে পারে না। ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান সে সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ননা করে জানিয়েছেন যে, সে সময়ে ১৫% থেকে ২০% ভাগ উপরওয়ালাদের দিয়ে আসতে হত। চেয়ারম্যানকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এসব ক্ষেত্রে অনিয়ম রয়েছে। বরাদ্দকৃত গম বা চাউল উত্তোলন করতে বহু খড় কুটা পোড়াতে হয়। ফলে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয় না। ১৯৭৩ সনের ভাইস-চেয়ারম্যানগন (পরবর্তীতে মেম্বার) জানিয়েছেন যে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত গম বা চাউলের পরিবহন খরচ সরকার থেকে দেওয়া হয়, তারা কোনদিনও তা পাননি। 'বুঝিয়া পাইলাম' কথা লিখে তাদের অবশ্যই দস্তখত দিয়ে আসতে হত এবং অদ্যাবধি তা-ই করতে হচ্ছে। এর বেশী কিছু বলতে তারা নারাজ। তবে হাব ভাব দেখে মনে হয়, এমন আরও কথা আছে যা প্রকাশ করতে তারা ভয় পায়। কেননা, উপরস্থ কর্মকর্তাদের সাথে তাদের সব সময় উঠা বসা এবং তাদের কলমই ইউনিয়ন পরিষদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করে করে থাকে। তাই তাদের বিরুদ্ধে এলিটরা যার তার কাছে মুখ খুলবে এমনটি আশা করা যায় না। দুর্নীতি আর অনিয়ম সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে একজন ভাইস-চেয়ারম্যান বলেছেন, " পানিতে বাস করে আমরা কুমিরের সাথে লড়াই করতে চাই না।" মূলতঃ একথার মাঝেই উপরওয়ালাদের সাথে এলিটদের চাপা ক্ষোভের পরিচয় মেলে। অন্যান্য জটিল সমস্যার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভংগী হলো- এগুলো জাতীয় সমস্যা, স্থানীয়ভাবে এগুলোর সমাধান করা সম্ভব নহে। তবে সরকারী উদ্যোগের অভাবকেই তারা এসব সমস্যার দীর্ঘ স্থায়িত্বের মূল কারন বলে অভিহিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, গৃহীত সাক্ষাতকারে ৪৬জন এলিট প্রধান প্রধান সমস্যাবলী সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে ২৫জন এলিটকে বেশ একটু তৎপর মনে হয়েছে। সাদা সংএশনু প্রশ্নের জবাব সকল এলিট দিলেও উল্লেখিত ২৫জনের মতামত বেশ গুরুত্বপূর্ন ছিল। সমস্যার উৎপত্তি ও সমাধানের উপায় এবং সমাধানের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহও তারা অকপটে বর্ণনা করেছে। এই ২৫জনের মধ্যে চেয়ারম্যান ৩জন, ভাইস-চেয়ারম্যান ২জন এবং ২০জন মেম্বার ছিল। ১জন চেয়ারম্যান এবং ২জন ভাইস-চেয়ারম্যানকে বেশ পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী মনে হল। শিক্ষার দিক দিয়ে মূলতঃ এই তিনজনই শীর্ষ স্থানীয়। ভাইস-চেয়ারম্যানদের চেয়ে বয়স্ক হলেও তাদের চিন্তা চেতনায় প্রাচীনত্বের কোন লক্ষন পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন বিষয়ে তারা এত পরিস্কার ধারনা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে যে, এমনটি তাদের কাছ থেকে আশা করা যায়নি। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান মিলিয়ে ৪জন ও ১৫জন মেম্বারসহ মোট ১৯জনের চিন্তার প্রসারতা লক্ষ্য করা গেছে। তারা কোন সমস্যাকে কেবল স্থানীয়ভাবেই বিচার করে না, জাতীয় পর্যায়েও তাদের চিন্তা প্রসারিত। খাদ্য,শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতি সমস্যাকে তারা জাতীয় মানদন্ডে বিচার করতে যেমন সক্ষম হয়েছে তেমনি সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমস্যা সমাধানের সকল ক্ষেত্রেই যে প্রতিবন্ধকতা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে তাদের মতে তা হলো দুর্নীতি। গোটা সমাজ দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়ায় নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটছে।

তারা মনে করেন এই অবক্ষয় ঠেকানোর জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোককে স্ব স্ব ধর্মীয় অনুশাসন বাধ্যতা মূলক ভাবে মেনে চলতে হবে। কারন,কোন সরকারের আইন মানুষের বাইরের দিক নিয়ন্ত্রন করে। দুর্নীতিপরায়ন মানুষ সব সময় আইনকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্ম মানুষের অন্তরাত্মাকে নিয়ন্ত্রন করে বলে মানুষ তার নিজের কাজের জন্য নিজের কাছে জবাবদিহী থাকে এবং পাপের ভয় থাকে বলে মিথ্যা ও দুর্নীতি প্রবনতার পথ পরিহার করে চলতে সে আপনাআপনি বাধ্য হয়। তারা আরও বিশ্বাস করে যে,আইন প্রয়োগ করে দুর্নীতি দূর করা সুদূর পরাহত। কারন আইন যারা প্রয়োগ করবে তারাই যদি দুর্নীতি প্রবন হয় তবে সে আইনের কার্যকারিতা জনগনের কাছে তেমন থাকে না।

(২) পরিবার পরিকল্পনার প্রতি এলিটদের মনোভাব

জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে এলিটদের নিকট আলাদাভাবে প্রশ্ন রাখা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে এলিটদের মনোভাব ৫.১ নং সারনীতে দেখানো হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে তারা কি হিসেবে বিবেচনা করেন, এবের প্রশ্নের জবাবে উল্লেখিত সারনী অনুযায়ী সর্বাধিক সংখ্যক এলিটই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে জাতীয় অগ্রগতির পথে বিরাট অন্তরায় এবং মারাত্মক হুমকি হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনা করে বলে উল্লেখ করেছে। ৪৬ জন এলিটের ৩৫ জন এলিটই জনসংখ্যা রোধে পরিবার পরিকল্পনার প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। মাত্র ১১ জনই পরিবার পরিকল্পনার বিরোধিতা

সারণী নং ৩.১ : পরিবার পরিকল্পনার প্রতি মনোভাবের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ[৩]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	পরিবার পরিকল্পনা সমর্থনকারী এলিট	পরিবার পরিকল্পনা বিরোধী এলিট	মোট
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	১	X	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ারম্যান	২	X	২
১৯৭৩	মেম্বার	৮	২	১০
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	২	X	২
১৯৭৭	মেম্বার	১০	৩	১৩
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	২	X	২
১৯৮৪	মেম্বার	১০	৬	১৬
	মোট	৩৫	১১	৪৬

করেছেন। উল্লেখিত ৩৫ জনের কেহই স্থায়ী পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রন পছন্দ করেন না। পরিবার পরিকল্পনা সমর্থনকারী এলিটের সন্তান সংখ্যা পড়ে প্রায় ৫ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার অপরিহার্যতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তাদের সন্তান সংখ্যা এত বেশী হওয়ার কারন জানতে চাইলে অত্যন্ত সাদাসিদাভাবে তারা জবাব দেয় যে, পরিবার পরিকল্পনার কথা তারা কেবল শুনেই আসছে। আসলে তারা এখনও এটার সাথে পরিচিত হতে পারেনি। ১ জন চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৫ জন মেম্বার বেশ দুঃখের সাথেই বলেছে যে, পরিবার পরিকল্পনার কথা তারা কেবল রেডিও ও টেলিভিশনে শুনে এবং খবরের কাগজে পড়ে থাকে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী কিছু তারা জানে না। পরিবার পরিকল্পনা অফিসের কারও দেখা তারা পায় না। এমনকি এসম্পর্কে জনগনকে অবহিত করার ফিল্ড ওয়ার্কে বলতেও কিছুই তারা দেখতে পায় না। আর তাই গ্রামের লোকজন এব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনা। একজন চেয়ার-ম্যান বলেছেন যে, তিনি শুনেছেন তার ইউনিয়নে পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মী রয়েছে। কিন্তু কোনদিন তার দেখা পাননি। তিনি আরও বলেছেন যে, পরিবার পরিকল্পনা শুধুমাত্র প্রচার সর্বস্ব-বাস্তবে কোন কিছুই নেই। বিশেষ করে গ্রামের লোক পরিবার পরিকল্পনার সুফল বা কুফল বুঝতে পারে না। তার মতে, ইউনিয়নের মাঠকর্মীদের ইউনিয়ন পরিষদের সুপারভিশনে রাখলে বা বেতনের ব্যাপারে চেয়ারম্যানের নিকট হতে যদি ছাড়পত্র দেওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকত,

Dhaka University Institutional Repository

তবে অবশ্যই গ্রামের জনগন পরিবার পরিকল্পনার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেত। একজন ভাইসচেয়ারম্যান এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেই বলেছেন যে, পরিবার পরিকল্পনা কেবল মাত্র ঢাক-ঢোল পিটানোর তামাশা। গ্রামের জনগন আজও জানে না পরিবার পরিকল্পনা-র সুফল বা কুফল কি? জন্মনিয়ন্ত্রনের স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি তিনি সমর্থন করেন কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি বেশ ঝুঁকি বহুল। অস্থায়ী পদ্ধতি-তে যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করা যায়, তবে স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করে ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় দিক থেকে জন্মনিয়ন্ত্রনের পথে কোন বিধি নিষেধ আছে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে একজন চেয়ারম্যান হাদিসের আলোকে জানান যে, কম সম্পদ ও বেশী সন্তানের জঞ্জাল থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা বিরোধী এলিটরা তাদের বিরোধিতার উল্লেখযোগ্য কোন কারণ তুলে ধরতে পারেনি। তবে এটা যে তাদের অজ্ঞতার দরুন হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। কারণ, বিরোধিতার পক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শন না করে তারা নীরবতাই পালন করেছে।

সুতরাং দেখা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে একটা মারাত্মক সমস্যা এ ব্যাপারে এলিটরা বেশ সচেতন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের খাম-খেয়ালী, দায়িত্ব পালনে অনীহা এবং জনসংযোগের অভাবটাও তারা পুরাপুরি আঁচ করতে পেরেছেন। আর বিরোধীরা ঠিক বিরোধী হিসেবে বিবেচিত হত, যদি তারা এ ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর ইহার বিপক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করাত।

(৩) ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে এলিটদের মনোভাব।

ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রবর্তন করা হয় সর্ব প্রথম ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে। ১৯৭৬ সনে এক সরকারী নির্দেশে এই বিধান জারী করা হয়। এই বিধান মতে, প্রতিটি ইউনিয়নে দুইজন করে মনোনীত মহিলা মেম্বার রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক এসব মহিলা মেম্বারদের মনোনীত করা হত। বস্তুতঃ এরূপ মনোনয়নের ফলে মনোনীত মহিলা প্রতিনিধিত্ব বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমিত থাকে। কারন, এদের মনোনীত করতে গিয়ে মহকুমা প্রশাসক-কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে চেয়ারম্যানদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকেই মহিলারা মেম্বার মনোনীত হয়। মহিলারা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয় ১৯৫৬ সন থেকে। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডে প্রতিনিধিত্বের কোন অধিকার তারা তখনও প্রাপ্ত হয়নি। এমনকি বাংলাদেশের3

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দিকে তাদের এই অধিকার দেওয়া হয়নি। একমাত্র ১৯৭৭ সনেই মনোনয়নের মাধ্যমে তাদের এই অধিকার দেওয়া হয়। অপরদিকে, ১৯৮৩ সনে সামরিক সরকার মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা দুই থেকে বৃদ্ধি করে তিনে উন্নীত করে। ইউনিয়ন পরিষদে যেহেতু মহিলা প্রতিনিধিত্ব একটি নতুন সংযোজন, সেহেতু সবার কাছে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ধরনের মনে হয়। এটা সাধারন মানুষের মাঝে যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তেমনি এলিটদের মাঝেও। সুতরাং এব্যাপারে এলিটগনের চিন্তা-ভাবনাও একটু বিচার করে দেখা দরকার। আর তাই তাদের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হল।

মোট ৪৬ জন এলিটের কাছে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছে। ৫.২ সারনীতে তাদের মতামত সম্পর্কিত তথ্য পেশ করা হয়েছে। দেখা যায়, মোট ২জন চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং বেশ কয়েকজন মেম্বার মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করে। মোট ৪৬ জন এলিটের ২৩ জনকে সমর্থন করতে এবং ২৩ জনকে বিরোধিতা করতে দেখা যায়। ১৯৭৩ সনের ৯ জন, ১৯৭৭ সনের ৭ জন এবং ১৯৮৪ সনের ৭ জন মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের বিপক্ষে এবং ১৯৭৩ সনের ৬ জন, ১৯৭৭ সনের ৮ জন ও ১৯৮৪ সনের ৯ জন স্বপক্ষে মতামত প্রদান করেছে।

মহিলা প্রতিনিধির পক্ষ সমর্থনকারী এলিটগনের মতে, আধুনিক কালে মানুষের

সারনী নং- ৫.২ : ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে মনোভাবের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণীভাগ [8]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	ইউনিয়ন পরিষদে মহলা প্রতিনিধি সমর্থনকারী এলিট	বিরোধিতাকারী এলিট	মোট
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	X	১	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ারম্যান	১	১	২
১৯৭৩	মেম্বার	৮	৪	১২
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	X	২	২
১৯৭৭	মেম্বার	৭	৬	১৩
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	১	১	২
১৯৮৪	মেম্বার	৬	৮	১৪
	মোট	২৩	২৩	৪৬

সমাজে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। এদবের মধ্যে নর আর নারীর সমস্যা এক নয়। ফলে একে অপরের সমস্যা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেনা। সমাজের কাছে নারী সমস্যা তুলে ধরার এবং

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আবেদন সৃষ্টি করার জন্য মহিলা প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাদের কেউ কেউ দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিধবা মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর উপযুক্ত ছেলে না থাকলে বিধবা মহিলাকে দারুন হয়রানির শিকার হতে হয়। স্বার্থান্বেষীরা তার সম্পত্তি বেহাত করার জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্রে তাকে ফেলার চেষ্টা করে। ফলে প্রাণ নিয়ে পতির নিবাস ছেড়ে তাকে পালাতে হয়। তার হয়ে কেউ পাশে দাঁড়ায় না। ইউনিয়ন পর্যায়ে থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত যদি তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে তবে স্বার্থবাদীদের অবিচারের চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরার সহজ উপায় থাকে এবং প্রতিকারেরও পথ উন্মুক্ত হয়। ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা তারা সমর্থন করে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে সকলেই নেতিবাচক জবাব দিয়েছে। তাদের মতে, এতে অরাজকতার সৃষ্টি হবে এবং প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রয়োজনে মনোনীত মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে বলে তারা মনে করে। অপর দিকে, বিরোধী মতামত হল, এদেশে নারীর প্রতিনিধিত্বের দরকার নেই। এটা বিদেশী সমাজের রীতি। কারণ এদেশের নারীরা শুধু নরের সহধর্মিনীই নয়, গোটা সংসারের চাবিকাঠি তাদেরই হাতে। গ্রামের মহিলার সাংসারিক দায়িত্ব আর শহরের মহিলার সাংসারিক দায়িত্ব এক নয়। গ্রামীন মহিলার সাংসারিক দায়িত্ব অনেক অনেক বেশী। তারা মনে করে, রাস্তা ঘাটে বেড়াতে পারলেই কেবল নারী অধিকার প্রাপ্ত হয় না। ইসলাম ধর্মের দৃষ্টান্ত দিয়ে তারা দেখাবার প্রয়াস পায় যে, নারীরা স্বামী, পিতা, মাতা এবং এমনকি মাতার পৈতৃক সম্পত্তিরও ভাগ পেয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মে এসব নেই বলে সে সব ধর্মের দেশে আইন করে নারীর অধিকার দিতে হয়। তারা মনে করে, নারী পবিত্র আমানতই নয়, মানব সমাজের ধারক ও বাহক। তারা সন্তান ধারণ করে মানব সমাজকে টিকিয়ে রাখছে। কেবল তা-ই নয়, মানব সমাজকে তারাই পালন করেছে। একটা সন্তানের জন্য মাতাকে যত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, পিতাকে তার সামান্য টুকুও করতে হয় না। আর কেবল মাত্র জননীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত সন্তানই একদিন দেশের সুনাগরিক হয়ে থাকে। সুতরাং অধিকারের নামে নারীকে ঘরের বের করার মানেই মানুষের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া। নারী সমাজকে অর্থনৈতিক মুক্তি অগ্রগতিতে শরীক করার জন্য তারা কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সুতরাং দেখা যায় পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ই এ ব্যাপারে বেশ জ্ঞান রাখে। নিজেদের সমাজের পাশাপাশি তার ভিনদেশী সমাজেরও কিছু কিছু খোঁজ খবর রাখে। এ ব্যাপারে তাদের সচেতনতার পরিচয় মেলে। যুক্তিতর্কে উভয় পক্ষকেই বেশ পারদর্শী মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) যৌতুক প্রথার প্রতি এলিটদের মনোভাব ।

এলিটদের কাছে প্রশ্ন পত্রের বাইরে যৌতুক প্রথা সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে বলা হয়েছে। এব্যাপারে মোট ৪৬জনই জবাব দিয়েছে। তাদের মতামত ৫'৩নং সারনীতে পেশ করা হয়েছে তথ্য মতে দেখা যায়, ৪৬জন এলিটের ৩৯জনই যৌতুকের বিরোধীতা করছে এবং মাত্র ৭জন সমর্থন করেছে। বিরোধীরা যৌতুককে জীবন নিয়ে তামাশা হিসেবে অভিহিত করেছে। তাদের মতে, যৌতুক বিরোধী আইন কেবল কেতাবী কথা হয়ে আছে, বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। মেয়েরা আজকাল তাদের পিতার কাছে বোঝা হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে। বিত্ত-বেসাতহীন পিতারা যৌতুকের দাবী মিটাতে পারে না বলে মেয়ে বিয়ে দিতে পারে না। অনেক সময় যৌতুকের কারনে হয় মেয়েকে জীবন দিতে হয়, নতুবা পিতাকে জীবন দিতে হয়। বিরোধীরা আরও মনে করে, সমাজের উচ্চ মহলই যৌতুক প্রথা টিকিয়ে রেখেছে। এজন্য যৌতুকের আইনও নীরব হয়ে আছে।

সারনী নং- ৫'৩ :যৌতুক সম্পর্কে মনোভাবের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণীভাগ।

নির্বাচন	এলিটের শ্রেণী	যৌতুক সমর্থনকারী এলিট	যৌতুক বিরোধী এলিট	মোট
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	X	১	১
১৯৭৩	ভাইস চেয়ারম্যান	X	২	২
১৯৭৩	মেম্বার	৩	৬	৯
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	X	২	২
১৯৭৭	মেম্বার	২	১২	১৪
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	X	২	২
১৯৮৪	মেম্বার	X ২	১৪	১৬
		৭	৩৯	৪৬

তাছাড়া, এটা হিন্দু সমাজের প্রথা। হিন্দু মেয়েরা পৈর্তৃক সম্পত্তির ভাগ পায় না বলে বিয়ের সময়ে এককালীন অর্থ সম্পদসহ তাদের দিয়ে দিতে হয়। আজ এই প্রথা মুসলমান সমাজকেও গ্রাস করেছে। সমাজের উচ্চ মহল জামাতাকে সম্মানী দিতে গিয়েই মূলতঃ এ প্রথা বলবৎ করেছে। সমাজের সর্ব শ্রেণীর মানুষ সক্রিয় না হলে এই অবস্থা প্রশমনের উপায় নেই। যৌতুকের মত সামাজিক ব্যাধি দূর করতে না পারলে কন্যা সন্তান হত্যা করার পথ একদিন মাতা পিতা বেছে নিতে বাধ্য হবে। অপর দিকে, সমর্থনকারীরা তাদের সমর্থনের সপক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেনি। তারা কেন এটা সমর্থন করে, এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তারা নীরবতা পালন করেছে। আর এই ধরনের সকলেই

Dhaka University Institutional Repository

সামান্য লিখিত। কাজেই এদের কাছ থেকে তেমন যুক্তিযুক্ত কোন বক্তব্য পাওয়াও সম্ভব নয়। এদের ব্যক্তিগত পছন্দের উপরই যৌতুক প্রথার প্রতি সমর্থন নির্ভর করে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(৭) সমস্যা নিরূপণে এলিটদের দূরদর্শিতা:

সমস্যা নিরূপণে এলিটদের দূরদর্শিতা বিশ্লেষন করা অপরিহার্য। স্থানীয় বা জাতীয় কোন সমস্যার উপর তারা জোর দেয়; এ প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয়েছে এলিটদের কাছে। মোট ৪৬জন এলিটের সকলেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তাদের জবাবের তথ্য ৫.৪নং সারনীতে পেশ করা হয়েছে। ইহাতে দেখা যায়, ৩জন চেয়ারম্যান, ২জন ভাইস চেয়ারম্যান ও ২১জন মেম্বারসহ মোট ২৬ এলিটই স্থানীয় সমস্যার উপর জোর দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হল, আমরা যেহেতু স্থানীয় প্রতিনিধি সেহেতু আমরা স্থানীয় সমস্যার কথাই বলব। তিনটি নির্বাচনে মোট ৫জন চেয়ারম্যানের ৩জনই স্থানীয় সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাদের মতে, আঞ্চলিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা গুলিই জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি করে। কাজেই স্থানীয় ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা গুলোর সমাধান করা গেলে জাতীয় সমস্যা ততটা প্রকট রূপ নিবেনা। ২জন ভাইস চেয়ারম্যানই স্থানীয় সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। তারা মনে করে, স্থানীয় সমস্যা আপাতঃ ক্ষুদ্র মনে হয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সমস্যাই একদিন জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মতে সমস্যা যত ক্ষুদ্রই হউক, সারনী নং- ৫.৪: স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যার ভিত্তিতে এলিটের শ্রেনী ভাগ।[৩]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেনী	জাতীয় সমস্যার প্রতি গুরুত্বদানকারী এলিট	স্থানীয় সমস্যার প্রতি গুরুত্বদানকারী এলিট	মোট
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	X	১	১
১৯৭৩	ভাইস চেয়ারম্যান	X	২	২
১৯৭৩	মেম্বার	৫	৬	১১
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	১	১	২
১৯৭৭	মেম্বার	৮	৬	১৪
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	১	১	২
১৯৮৪	মেম্বার	৫	৯	১৪
		২০	২৬	৪৬

তার সমাধানে দীর্ঘ পুথিগাই ইহাকে জাতীয় রূপ দান করে। তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিত এলিটদের মধ্যে মোট ১১জন মেম্বার স্থানীয় সমস্যার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্যই স্থানীয় জনগন তাদের নির্বাচিত করেছে এবং এটাই তাদের দায়িত্ব। তাছাড়া স্থানীয় সমস্যা উপেক্ষা করে জাতীয় সমস্যাকে বড় করে দেখা দায়িত্বহীনতারই পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বৃহত্তর কর্মের দায়িত্ব প্রাপ্ত বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদ রয়েছে। জাতীয় সমস্যা সমাধানের ভার উহার উপর ন্যাস্ত। অপর দিকে ২জন চেয়ারম্যান ও ১৮জন মেম্বারসহ মোট ২০জন এলিট জাতীয় সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাদের মতে, জাতীয় সমস্যা এ জন্য অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত যে, একটা জাতির অস্তিত্বের সাথে জাতীয় সমস্যা জড়িত। স্থানীয় সংস্থাগুলো যদি জাতীয় সমস্যার উপর গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধানের প্রচেষ্টা না নেয় তবে পূর্ববর্তী বা শীর্ষ সংস্থা জাতীয় সংসদ কেবল মাত্র আইন প্রনয়ন করেই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। স্থানীয় সংস্থাগুলো জনগনের সাথে এত ঘনিষ্টভাবে জড়িত যে, অপর কোন সংস্থাই ততটা ঘনিষ্ঠ নয়। কাজেই স্থানীয় সংস্থা তথা ইউনিয়ন পরিষদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছাড়া জাতীয়সংসদ কেবলমাত্র আইন প্রনয়ন করে জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

এলিটগনের প্রদত্ত মতামত যাচাইয়ে দেখা যায় জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে তারা যেমন সচেতন, তেমনি স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কেও। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এলিটই স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য রেখেছে। তাদের এটা অবশ্যম্ভাবী যুক্তি যে, তারা স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্যই স্থানীয় জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে। অপরদিকে স্থানীয় সমস্যার চেয়ে জাতীয় সমস্যাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধানের জন্য স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা অগ্রনী বলে যারা যুক্তি দেখিয়েছেন তাদের যুক্তিও অগ্রাহ্য করা যায়না। সুতরাং দেখা যায়, এলিটগনকে স্থানীয় বা জাতীয় উভয়বিধ সমস্যা নিরূপনে মোটামুটি ভাবে বিচক্ষন বলে মনে হয়। স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় সমস্যাকে তারা কেহই পাশ কাটিয়ে যায় না-স্থানীয় সমস্যা তারা যেমন অনুধাবন করে তেমনি সমাধানও আগ্রহী।

(৬)সরকারের ধরন সম্পর্কে এলিটদের মতামত:

সরকার সম্পর্কিত ধারনা যাচাইয়ের জন্য ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে নির্বাচিত এলিটদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল। কি ধরনের সরকার-সংসদীয় সরকার, না রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা তারা চায়, এ প্রশ্নের জবাব তারা সকলেই দিয়েছে। তাদের প্রদত্ত জবাব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং উক্ত জবাবের ভিত্তিতে ৫টি সংসারনী প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সারনী মতে দেখা যায়, ৪জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ২৯জন মেম্বারসহ মোট ৩৪জন এলিট রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সমর্থন করেছে। অপরদিকে ১জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ১০জন মেম্বারসহ মোট ১২জন এলিট মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার সমর্থন করেছে। ১৯৭৩সনে নির্বাচিত এলিটগনের ১জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৮জন মেম্বার সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে মতামত দিয়েছে। অপরপক্ষে, ১জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৩জন মেম্বার মন্ত্রী-পরিষদ শাসিত সরকার সমর্থন করেছে। ১৯৭৭ সনের ১৫ এলিটের মধ্যে ১২ জন এলিটই

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেছে। এদের মধ্যে ২ জন চেয়ারম্যান রয়েছে। এসময়ে মাত্র ৪ জন মেম্বারই মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেছে। ১৯৮৪ সনের ১ জন

সারণী নং -৫.৪: সরকারের ধরন সম্পর্কে মতামতের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ[7]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সমর্থনকারী এলিট	মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার সমর্থনকারী এলিট	মোট
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	১	X	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ারম্যান	১	১	২
১৯৭৩	মেম্বার	৮	৩	১১
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	২	X	২
১৯৭৭	মেম্বার	১০	৩	১৩
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	১	১	২
১৯৮৪	মেম্বার	১১	৪	১৫
	মোট	৩৪	১২	৪৬

চেয়ারম্যান ও ১১ জন মেম্বারসহ মোট ১২ জন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সমর্থন করেছে। এসময়ে ১ জন চেয়ারম্যান ও ৪ জন মেম্বারসহ মোট ৫ জন মন্ত্রীপরিষদ সরকার সমর্থন করেছে। এলিটদের দলীয় অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যাবে, দলের নীতি ও আদর্শের সাথে সরকার ব্যবস্থার প্রতি তাদের সমর্থনের কিছুটা ব্যবধান রয়েছে। যেমন ১৯৭৩ সনে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ সমর্থক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সমর্থন করেছে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা সমর্থনকারী এলিটরা যেমন তাদের সমর্থনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে, তেমনি মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা সমর্থনকারীরাও যুক্তি প্রদর্শন করেছে।

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটরা ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকলেও জাতীয় চেতনা তাদের মধ্যে মোটামুটি লক্ষ করা গেছে। জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাদের চিন্তা-চেতনা অনেকটা পরিস্কার। সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দানে তারা মোটামুটি রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। এপ্রশ্নের জবাব দানে তারা দলীয় অবস্থানের দিক বিবেচনা করেনি। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা সমর্থনকারীদের সমর্থনের কারন জানতে চাওয়া হলে সমর্থনকারী এলিটরা জানায় যে, এ ব্যবস্থাই বাংলাদেশের জন্য উপযোগী। এতে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় থাকে। তাদের মতে, রাষ্ট্রপতির শাসনকে এক ব্যক্তির শাসন বলা হলেও এক দলের শাসনের চেয়ে এক ব্যক্তির শাসন অনেক ভাল। একজন চেয়ারম্যান অতীতের বা আওয়ামী লীগের মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারের প্রতি ইংগিত করে বলেছেন যে, এরূপ সরকার ব্যবস্থা দলীয় স্বৈরাচার ছাড়া কিছুই নহে। তিনি মনে করেন যে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার হলে যে বহু দলীয় রাজনীতি থাকবেনা, এমন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে যে ব্যবস্থায় কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি আর তার দল ছাড়া অন্য কোন দলের রাজনীতি থাকবে না, সেরূপ স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা সমর্থনকারীরা মনে করেন, রাষ্ট্রপতির শাসন স্বেচ্ছাচারের রূপ নিলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যায়, তাকে অপসারন করা যায়, যদি দেশে বহুদলীয় রাজনীতি কায়েম থাকে। এক ব্যক্তির সাথে লড়াই করা যত সহজ, এক দলের সাথে লড়াই করা তত সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, একটি মাত্র দলের রাজনীতি কায়েম হলে জনগনের মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন পেটুয়া বাহিনীর জুলুম-নির্যাতনের মুখে স্বৈর শাসকের বিরুদ্ধে জনগনের মাথা তোলার কোন উপায় থাকে না। কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থা কায়েম থাকলে রাষ্ট্রপতির দল পেটুয়া বাহিনী গড়ে তুললেও অন্যান্য দলগুলোও আত্মরক্ষার জন্য এরূপ বাহিনী গড়ে তোলে। ফলে রাষ্ট্রপতির সমর্থিত বাহিনীটি বাধার সম্মুখীন হয় এবং অত্যাচারের পথ পরিহার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু একটিমাত্র দলের শাসন কায়েম করে কোন ব্যক্তি সরকারে অধিষ্ঠিত হলে জনগনের অধিকার অবশ্যই খর্ব হবে এবং এরূপ ক্ষমতাধর ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সামর্থ্য জনগনের থাকেনা। নজির হিসেবে তারা রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের একদলীয় শাসন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে, রাষ্ট্রপতির শাসনের দৃষ্টান্ত হিসেবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে এরূপ রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য চেয়েছে। পেটুয়া বাহিনী বলতে তারা কি বুঝাতে চায়, এপ্রশ্নের জবাবে তারা অতীত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলে যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর রক্ষিবাহিনী, লালবাহিনী, সবুজবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রভৃতির মত অসংখ্য বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য তাৎক্ষনিকভাবে বুঝা না গেলেও পরবর্তীতে দেখা গেছে, জনগনের মুখ বন্ধ রাখার জন্যই এসব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। তারা মনে করে, এসব বাহিনীই পেটুয়া বাহিনী। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে তারা বলে যে, এই নির্বাচনে জনগন বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি রায় দিয়েছিল। কিন্তু জাতীয় সংসদ জনগনের সেই রায়ের প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শন করতে পারেনি, তেমনি সংসদীয় ব্যবস্থাও ধরে রাখতে পারেনি। এমনকি, বহুদলীয় রাজনীতির ধারাকেও সংসদ কবরস্থ করেছিল। তাদের মতে, বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারই হবে যথাযথ ব্যবস্থা। পূর্বোল্লেখিত ধারার পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা কতটা স্থিতিশীলতা ও সাফল্য লক্ষ্য করছেন, এপ্রশ্নের জবাবে তারা জানায়, ১৯৭৫ সনে রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে বহুদলীয় ব্যবস্থা ফিরে এসেছে যার, গনতন্ত্র আসেনি। তবে গনতন্ত্রের চর্চা তখন থেকে অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। তাছাড়া, পেটুয়া বাহিনীও এখন আর তেমন সুবিধা করতে পারে না। কারন, সব দলেরই

Dhaka University Institutional Repository

এখন শেটুয়া বাহিনী থাকায় একক শাসন কেহই চায় না। উল্লেখ করা দরকার যে, ৩৩জন এলিটের মধ্যে মাত্র ১জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৬জন মেম্বারসহ মোট ৮জন এলিটই এভাবে বিস্তারিত জবাব দিয়েছে। অন্য ২৫জন এলিট রাজনৈতিক স্থিতিশী-লতা এবং শান্তি শৃংখলার জন্যই রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা সমর্থনের কথা জানিয়েছেন মাত্র।

মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা সমর্থনকারী ১জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৮জন মেম্বারসহ মোট ৯জন এলিট তাদের সমর্থনের পক্ষে যুক্তি দেখায় যে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা সংসদের কাছে দায়ী থাকে। সংসদ জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বলে সংসদীয় সরকার পরোক্ষভাবে জনগনের কাছেই দায়ী থাকে। জনগনের সমস্যা সংসদে তোলা যায় এবং আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করা যায়। জনগনের স্বার্থ ও কল্যানের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইনপ্রনয়ন করা সংসদীয় ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে আইন জনগনের কল্যান বয়ে আনতে সক্ষম নয়, সেই আইনের বিরুদ্ধে জনগন বিদ্রোহ করতে পারে। মোট কথা, জনগনের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখার অন্যতম ব্যবস্থাই হলো সংসদীয় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেককেই তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। ফলে শাসকের মাঝে সংগত চিন্তাই থাকে অধিক। এরূপ ব্যবস্থায় শাসক কখনই নিজেদের প্রভু ভাবতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে সংসদ আর মন্ত্রী পরিষদ সবই রাষ্ট্রপতির নির্দেশনামায় আবদ্ধ থাকে। ফলে জনকল্যানের চেয়ে মন্ত্রীরা এক ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্যই সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তারা সর্বদা 'জি হুজুর, জি হুজুর' বলে নিজেদের চাকুরী বহাল রাখার প্রয়াস পায়। জনগনের খেদমতের চেয়ে তারা রাষ্ট্রপতির খেদমতেই অধিক সময় ব্যয় করে থাকে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সমর্থনকারী এলিটরা উদাহরণ স্বরূপ বৃটেন ও ভারতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, জনগণ বরাবরই তাদের পছন্দ মত সরকার নির্বাচিত করছে। নিয়মতান্ত্রিক পথে সে সব দেশের রাজনীতি চলছে। বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার পর কোন সংসদ সার্বভৌম ছিল কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে জানায় যে, ১৯৭৩সনে নির্বাচিত সংসদ সার্বভৌম ছিল। সার্বভৌম সংসদে কি করে রাষ্ট্রপতির শাসন ও এক দলীয় শাসন কায়েমের আইন পাশ করানো সম্ভব হলো এ প্রশ্নের জবাব তারা কেহই দিতে পারেনি। উল্লেখ্য মোট ৯জন এলিট মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারের পক্ষে এরূপ মন্তব্য করলেও অন্যেরা তাদের সমর্থনের কারন এমনভাবে তুলে ধরতে পারেনি। উভয় পক্ষেরই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এলিটরা মন্তব্য করেছেন যে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলি আসলেই হ-য-ব-র-ল সৃষ্টি করছে-তাদের কথায় ও কাজে কোন মিল নেই।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের রূপ সম্পর্কে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত প্রদানের চেয়ে অনেকেই দলীয় আদর্শের প্রতিও খেয়াল রেখেছে। ব্যতিক্রমধর্মী মতামতের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য তাদের কেউ কেউ নিজের দলকেও সমালোচনা করতে দ্বিধা করেনি। তাই বলে একথা বলা যাবেনা যে, সকল এলিটই জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ও বিচক্ষণ।

(৭) গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে এলিটদের মতামত

গ্রামীন উন্নয়নের জন্য সরকারী উদ্যোগে আজকাল কিছু কিছু কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সে সব কর্মসূচী সম্পর্কে তাদের মতামত জানা দরকার এজন্য যে, সে সব বাস্তবায়নে তারা কতটা আন্তরিক বা তৎপর। তাদের এই মতামত জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ও দেশবাসী-উভয়ের জানার সুবিধা হবে যে, গৃহীত কর্মসূচী পল্লী উন্নয়নে কতটা সহায়ক হবে। আর সে মতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনেরও উদ্যোগ সরকার নেবে। অত্র গৌহাটী ইউনিয়নদ্বয়ের জন্য গৃহীত কর্মসূচীর প্রতি এলিটদের মতামত বিশ্লেষন করার প্রয়াসেই এত আলোচনার অবতারনা। এই আলোচনায় সে সব কর্মসূচীই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের উপর। মোটকথা, সরকারীভাবে তারা এসব কাজের দায়িত্ব পেয়ে থাকে। এসবের মধ্যে রয়েছে রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রামস[৮] এবং ফুড ফর ওয়ার্কস বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অত্র আলোচনায় নেওয়া হল। অত্র ইউনিয়নদ্বয়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর তৎপরতাই বেশী। রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ বর্তমানে আর নেই।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সাধারনতঃ বিদেশী সংস্থা বা জাতিসংঘের দেওয়া সাহায্যের উপর নির্ভর করেই পরিচালিত হয়ে থাকে। ইউনিয়ন পর্যায়ে এই কর্মসূচীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিরা। ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত এলিটরা জানায়, সে সময়ে অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের জন্য সরকারী সাহায্য একান্তই অপ্রতুল ছিল। যে সব প্রকল্পের জন্য সরকারী সাহায্য হিসেবে গম বা চাউল বরাদ্দ হত, অধিকাংশ সময়ও সেগুলোর দেখা তারা পেত না। গুদাম থেকে কখন কিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যেত, তারা জানত না। তাছাড়া, গম বা চাউলের একটা নির্দিষ্ট অংশ কর্মকর্তাদের দিয়ে আসতে হত। এর ফলে সে সময়ে গ্রামের কোন উন্নতি হয়নি। অবশ্য বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তারা কিছুই বলতে নারাজ।

উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে নির্বাচিত এলিটগনও তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। মোট ৪৬ জন এলিটের সকলেই গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে ইতিবাচক জবা-ব দিয়েছেন। কেবলমাত্র ২জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৭জন মেম্বার উপরি-উক্ত মন্তব্য করেছেন। অন্যেরা, এমনকি মন্তব্যকারীরাও কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হবার কথা বেশ জোরালোভাবে পেশ করেছেন। গবেষণা চলাকালীন সময়ে ইউনিয়ন পরিষদগুলোয় নতুন প্রকল্পের কাজ চলছিল। প্রকল্পের কাজের সাথে জড়িত প্রাক্তন এবং বর্তমান এলিটরা প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন বলে জানান ।

তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিত এলিটগণ তাদের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কাজের বিবরণ দিয়েছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, জেলা পরিষদের সাড়ে তিন মাইল পাকা রাস্তা(প্রকৃত-পক্ষে জেলা পরিষদের রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের কাজ জেলা পি এন্ড বি-এর হাতে। এতে ইউনিয়ন পরি-ষদের কোন হাত নেই।), ইউনিয়ন পরিষদের ২৩ মাইল কাঁচা রাস্তা, উপজেলা পরিষদের ২০ মাইল কাঁচা রাস্তা, ৪/৫টি সেতু ও ৫/৬টি কালভার্ট নির্মাণের কাজ তারা সম্পন্ন করেছেন। তাছাড়া, কোন কোন মেম্বার জানান, স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে স্ব স্ব এলাকায় তারা কয়েক মাইল দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেছেন। একইভাবে স্কুল ও মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। এলিটগণ জানান, রাস্তা-ঘাট এবং পুল ও কালভার্ট ছাড়া অন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়নের কোন দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়নি।

গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হওয়ার কথা এলিটগণ জোর দিয়ে বললেও প্রকল্পগুলোর কাজ কতটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা জানার জন্য নিরপেক্ষ মতামত গ্রহণ করা দরকার। আর এই ক্ষুদ্র পরিসরে তা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা, নিজের দোষ কেউ কোনদিন স্বীকার করতে চায় না। অপরদিকে, অন্যেরা সামান্য দোষকেও অনেক বড় করে তুলে ধরার প্রয়াস পায়। তাই এক্ষেত্রে এলিটদের বক্তব্যই যথেষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি- একথা বলতে গেলে দুর্নীতির প্রশ্নটি আপনা আপনি এসে যায়। হয়তোবা এজন্যই তারা বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত এলিটগনের মুখ থেকে দুর্নীতির সামান্য যে আভাস পাওয়া গেছে, তা থেকেই দুর্নীতির বিষয়টি সহজে আঁচ করে নেওয়া যায়। উপরওয়ালারা যেখানে দুর্নীতি লালন করছে, সেখানে এই সর্বনিম্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা কতটা সৎ ও আন্তরিক হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের দুর্নীতি যারা প্রতিহত করবে বা প্রতিহত করার দায়িত্বে নিয়োজিত , মূলতঃ তারাই গ্রামের এসব এলিটকে দুর্নীতির ছবক দিচ্ছে। কাজেই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে এলিটরা ইতিবাচক জবাব দিলেও আসলে তারা দুর্নীতি মুক্ত কিনা, সন্দেহ আছে। তবে একথা সত্য যে, এখানে রাস্তা ঘাট নি

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তর রয়েছে এবং দীর্ঘ দিনের একটু একটু অগ্রগতির মাধ্যমেই বর্তমান রূপ নিয়েছে।

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের মাঝে দুর্নীতির কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। ১৯৭৩ এবং পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত অর্থাৎ গবেষনাকালীন সময়ে ক্ষমতায় নেই এমন সব এলিটের কাছে তাদের পরবর্তী এলিটগনের দুর্নীতি বা সততা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে দুর্নীতির ব্যাপারে জবাব দানে তারা বেশ সতর্কতা অবলম্বন করে। এখানে যারা আসে আর যারা এখান থেকে চলে যায়, কেউ কারও বিরুদ্ধে কিছুই বলবে না, এটা এলিটদের একটা ঐতিহ্য বলেই মনে হয়। কেননা, বিরোধী কোন এলিটও তার বিপক্ষের এলিটের দোষ দেখাবার প্রয়াস পায়নি। আজকাল ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনেও কারচুপি, কেন্দ্র দখল, ভোট জালিয়াতি প্রভৃতি অপকর্ম ঘটছে। এমনকি অধিক জনপ্রিয় প্রার্থীকে সায়েল তথা হত্যা করার নজিরও বিগত দিনে দেখা গেছে। এখানে যদি অন্য কোন সুবিধা না থাকবে, তবে এমনটি ঘটবেই বা কেন। মুনাফার কোন কিছু নিশ্চয়ই এখানে আছে। আর হয়তো বা একারণেই দিন দিন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। সুতরাং এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামীন নেতৃত্ব নিয়ে সাধারন মানুষের মাঝে আজ লোভ লালসার প্রাধান্য দেখা দিয়েছে। প্লেটো বলেছেন, "যখনই লালসার আধিপত্য বিরাজ করবে তখনই বুঝতে হবে যে, জীবনের সংগতি বিনষ্ট হয়ে গেছে।"[৯] আমাদের গ্রামীন সমাজে সত্যিকার অর্থেই আজ আর জীবনের সংগতি নেই। দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তা ও সমাজের অন্যান্য দুর্নীতিবাজদের ভোগ লালসার শিকার হয়ে গোটা গ্রামীন সমাজ আজ বিপন্ন। প্লেটোর উক্তি "নিকৃষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে অপরাধের প্রাবল্যই বেশী দেখা যায়"[১০] আমাদের দেশে একানুভাবে প্রনিধানযোগ্য। শাসকের অসততা গ্রামীন সমাজেও প্রভাব ফেলে। শাসক দুর্নীতিবাজ হলে তাকে ঘিরে থাকা মহলও দুর্নীতির জাল চারি-দিকে পেতে রাখে। তাই একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এখানকার গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটরা দুর্নীতির উর্ধ্বে নহে। কম বেশী নিশ্চয়ই আছে। তবে কমের ভাগটাই বেশী বলে মনে হয়। কেননা, তাদের বর্নিত প্রতিটি প্রকল্প সম্পন্ন হতে দেখা গেছে। তারা নির্দ্বিধায় বলেছে, "প্রায় সম্পদের মাঝে সামঞ্জস্য রেখে আমরা আমাদের কাজ সমাধা করেছি।" এদিক থেকে তাদের আন্তরিক বলেই মনে হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে সকলেই এমন নিখুঁত জবাব দিয়েছে যে, মনে হয়েছে তাদের সকলেই স্বর্গের বাসিন্দা। অথচ এলাকায় এব্যাপারে বেশ কানা ঘুষা শোনা গেছে। গ্রামের অশিক্ষিত জনগন আমাকে সরকারের লোক ভেবে বলেছে, "লিখবেন। একটু ভাল করে লিখবেন। আমরা কেবল মাটির বোঝা টানছি, ফল ভোগ করছে তারাই।" এই বক্তব্য শ্রমজীবি মানুষের করুন আর্তনাদ মাত্র। তাদের বক্তব্য কেউ শুনতে পাবেনা। তাই সব প্রকল্পের কাজই সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকে।

গ্রামের উন্নয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যান তদীয় ইউনিয়নে মৎস প্রকল্প, পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প ও বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন। তার মতে, এলাকার জন্য সব ক'টাই অপরিহার্য। বড় বড় দীঘি ও হাজামজা পুকুর খনন করে মাছের চাষ করলে, স্কুলগুলোতে রাতে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এবং পরিবার পরিকল্পনার বাস্তব জ্ঞান দান করলে তা এলাকার জন্য বেশ মংগলজনক হবে। উক্ত চেয়ারম্যান মনে করেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় জ্ঞানের অভাবে এবং

Dhaka University Institutional Repository

সচেতনার অভাবে গ্রামের মানুষ নানাবিধ রোগ, শোক এবং সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয়তা এ জন্য যে, শিক্ষার অভাবে গ্রামের নিরীহ মানুষ আজও নানা হয়রানীর শিকার হচ্ছে। অপর দুইজন চেয়ারম্যান হাঁস-মুরগীর প্রকল্প ও মৎস প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। মৎস প্রকল্পের ব্যাপারে তিনিও পূর্বজনের ন্যায় একই মতামত প্রদান করেছেন। হাঁস মুরগীর প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, অল্প পুঁজিতে বিরাট লাভের উপায় হলো হাঁস-মুরগী পোষন করা। কিন্তু গ্রামের মানুষ হাঁস-মুরগী পুষতে জানে না। মহামারীতে প্রতি বছরই অগনিত হাঁস মুরগী মারা যায়। সুতরাং এ ধরনের একটা প্রকল্প হাতে নেওয়ার মানে জনগনকে হাঁস-মুরগী পোষা শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের রক্ষনাবেক্ষন করা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ২জন ভাইস-চেয়ারম্যানও মৎস প্রকল্প, হাঁস মুরগীর প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে পূর্বরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তবে একজন ভাইস-চেয়ারম্যান এসব প্রকল্প ছাড়াও এলাকার জন্য আরও পুল ও কালভার্ট নির্মানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ৮জন মেম্বারের একজনই পূর্ববর্তীদের অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। একজন মাত্র মেম্বার গ্রামের মাঝে একটা নতুন রাস্তা তৈরীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাম উন্নয়নের ব্যাপারে এলিটরা বেশ আগ্রহী এবং গ্রামীন সমস্যার ব্যাপারেও তারা সচেতন। নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব পেশের মধ্য দিয়ে তারা তাদের দূরদর্শীতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

(৮) এলিটদের কর্তব্যজ্ঞান।

গ্রামীন রাজনীতির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগনের দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা অপরিহার্য। কারন, তাদের দায়িত্ব বোধ ও কর্তব্য পরায়নতার মধ্য দিয়েই তাদের আসল মনোভাব ফুটে উঠে। কর্তব্যপরায়নতা সম্পর্কে জানতে হলে তাদের মাঝে বেশ কিছুদিন অবস্থান করা অপরিহার্য। সাময়িকভাবে তাদের মাঝে থেকে বা আলাপ করে এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তথাপি তাদের প্রদত্ত জবাব ছাড়াও গবেষনা চলাকালিন সময়ে আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কখনও কখনও সন্ধ্যার পরও ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে হাজির হয়েছি। এতে আমি অধিকাংশ এলিটকেই হাজির দেখেছি। ইউনিয়ন অফিস বাজারে থাকায় সকলেই বিকেলে একবার একবার আসে। এই উপস্থিতির উপর ভিত্তি করেই আমি ১৯৭৩, ১৯৭৭ও ১৯৮৪ সনের এলিটগনের কর্তব্যজ্ঞান সম্পর্কে প্রদত্ত জবাব সত্য বলে ধরে নিতে পারি। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থিতি এবং সর্বসাধারনের কাছে তাদের ব্যক্তিত সময়ের ভিত্তিতে তাদের কর্তব্যপরায়নতা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করছি। বলা আবশ্যক যে, ১৯৮৮ সনে নির্বাচিত এসব এলিটের উপস্থিতির আলোকে পূর্ববর্তী এলিটগনের কর্তব্য পরায়নতা সম্পর্কে আমাকে সিদ্ধান্ত উপনীত হতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক) ইউনিয়ন পরিষদের সভায় অংশ গ্রহন

ইউনিয়ন পরিষদ দেশের ক্ষুদ্রতম সংসদ। জাতীয় সংসদে জনগন কর্তৃক নির্বাচিত জাতীয় প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করে, আর ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়নের জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথমোক্তরা জাতীয় নীতি নির্ধারন করে, আর শেষোক্তরা স্থানীয় নীতি নির্ধারন করে। দুইয়ের মধ্যে এটাই তফাৎ। নীতি নির্ধারন করা উভয় প্রতিষ্ঠানেরই কাজ। ইউনিয়ন পরিষদ কেবলমাত্র নিজ প্রয়োজনেই নীতি নির্ধারন করে থাকে। ইহার সভায় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় ইহার প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা করে। সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদের সভায় হাজির হওয়া প্রতিনিধিদের জন্য অতীব জরুরী। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদেরই মাসে একবার একটা সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মাসের একটা নির্ধারিত তারিখে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে সভায় হাজির হওয়ার জন্য প্রতিনিধিদের কোন রকম নোটিশ প্রদান করা হয় না। তবে পরিষদ অফিসের নোটিশ বোর্ডে সভার তারিখ ও আলোচনার বিষয় উল্লেখ করে প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সভা আহবান করেন এবং পদাধিকার বলে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ প্রয়োজনে এবং কোন প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে সপ্তাহে একাধিক গোপন সভাও অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় আমার অবস্থান কালে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। অর্থাৎ মাসিক সভা ছাড়াও ৩মাসে ৫টি করে অতিরিক্ত মোট ১৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হতে আমি দেখেছি। দু'টি ইউনিয়নের ১৫ টি সভার কোনটিতেই অংশ গ্রহনের অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়নি। কেননা, সাধারন সভায় যে কেহ উপস্থিত থাকতে পারে। কিন্তু গোপন সভায় একমাত্র প্রতিনিধি ছাড়া অপর কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই জরুরী সভা সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য যা প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এবং হাজিরা খাতায় তাদের স্বাক্ষর প্রদান সংক্রান্ত- ইউনিয়ন অফিসের সেক্রেটারী এবং চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সভা অনুষ্ঠানের পর সংগ্রহ করেছি। গোপন বিষয় প্রকাশ না করলেও অন্যান্য তথ্য সরবরাহে তাদের সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। মোট ৬টি সভায় যোগদান করে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের মোট ১০ জন এলিটের মধ্যে ২টি সাধারন সভায় মাত্র ১জন মেম্বারকে অনুপস্থিত থাকতে দেখেছি। জানা গেছে, শারীরিক অসুস্থতার কারনেই উক্ত প্রতিনিধি উপস্থিত হতে পারেনি। দুটি ইউনিয়নেরই প্রতিটি সভায় প্রতিনিধিদের হাজিরা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই আমি চেয়ারম্যানদের শরনাপন্ন হয়েছি। উপস্থিতির হার সূচকে দেখাবার জন্য আমি হাজিরা খাতা তথা সভায়

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর দেওয়া খাতা প্রত্যক্ষ করেছি। এতে কোন সভায় কাউকে অনুপস্থিত দেখা যায়নি। গবেষনা চলাকালিন সময়ের এই উপস্থিতিকে এলিটদের কর্তব্য জ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ননা করা যায়। এখানে উল্লেখ্য, মনোনীত মহিলা মেম্বারদের এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত না করার কারন আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু গবেষনা চলাকালিন সময়ে কোন সভাতেই কোন মনোনীত মহিলা মেম্বারকেই হাজির হতে দেখা যায়নি।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা অপরিহার্য যে, সকল মেম্বারই একমত ও পথের অনুসারী নয়। এখানে বিরোধী শিবিরের অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় এ ব্যাপারে কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনকালিন সময়ে মেম্বাররা/যে চেয়ারম্যানের পক্ষাবলম্বন করে থাকে নির্বাচনের পরে সেই চেয়ারম্যানকে ইউনিয়ন পরিষদে না পেলেও তার পক্ষীয় বিজয়ী মেম্বাররা বিরোধী পক্ষেই থেকে যায়। অনেক সময় গ্রাম্য কোন্দল বা পূর্ব শত্রুতার জেরও এখানে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একই রাজনৈতিক মত ও পথের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখিত কারনে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। ফলে অনেক সময় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে চেয়ারম্যানকে হিমসিম খেতে হয়। এ জন্য চেয়ারম্যান ও নানা ফন্দি ফিকির করে এবং বিরোধী মেম্বারদের নানা রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে রক্ষা করে নেন। ফলে বিরোধীরা তাদের বিরোধী মনোভাব পরিহার করে সভায় উপস্থিত থাকে। সকল সভাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মেম্বারের ভোটে যে কোন প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট পাশের জন্য দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়। তবে একথা সত্য যে, চেয়ারম্যান যে প্রস্তাব করেন, তা অগ্রাহ্য কোন মেম্বারই করে বলে আজও জানা যায়নি। অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে কেউ বিরোধী মনোভাব পোষন করলেও শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্রস্তাবে তারা সম্মত হয়।

খ) জনসাধারনের কাজে ব্যয়িত সময়ঃ-

জনসাধারনের কাজে এলিটরা প্রতিদিন কতটা সময় ব্যয় করে তাও তাদের কর্তব্য পরায়নতার পরিচয় বহন করে। জনসাধারনের কাজ করতে তারা কতটা আগ্রহী, তা তাদের ব্যয়িত সময় থেকে অনুমান করা সহজ হবে। এখানে বলে রাখা আবশ্যক, গ্রামীন মানুষের মধ্যে দৈনন্দিনের সমস্যাবলী যেমন একের সাথে অপরের ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, জায়গা-জমি জবর দখল প্রভৃতি মিমাংসার প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রামের মেম্বারদের উপর বর্তায়। গ্রামে প্রায় প্রতিদিনই তাদের কোন না কোন সালিশে বসতে হয়। বেশী মারাত্মক কিছু ঘটলে কেবল সেখানেই চেয়ারম্যানকে উপস্থিত হতে হয়। আর এদিক থেকে বলা যায়, গ্রামীন বিষয়ে চেয়ারম্যানের চেয়ে মেম্বাররাই

Dhaka University Institutional Repository

বেশী দায়িত্ব পালন করে থাকে। মেম্বারদের এসব দায়িত্বকে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের অংশ হিসেবে ধরা হলে অতিরঞ্জিত হবেনা। যাহোক, ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারের অর্পিত দায়িত্বের বেশীর ভাগই চেয়ারম্যানের উপর বর্তায়। তাই চেয়ারম্যানকে সর্বদাই সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। বলে চেয়ারম্যানগন জানিয়েছেন। গড়ে প্রতিদিন কত সময় তারা সরকারী কাজে ব্যয় করেন, এপ্রশ্নের জবাবে দু'জন চেয়ারম্যান ১০ ঘন্টা করে ব্যয় করার কথা জানিয়েছেন। তাদের এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমানিত হয়েছে। কেননা, আমি যতবার বা যখনই ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে গিয়েছি, তখনই তাদের উপস্থিত পেয়েছি এবং কাজে ব্যস্ত দেখেছি। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে অন্তর্ভুক্ত এলিটদের ব্যয়িত সময়ের আমি সরেজমিনে জরিপ করেছি এবং এসময়ে দু'টি ইউনিয়নে এদের সংখ্যা ২০। প্রত্যেক এলিটদেরও আমি এব্যাপারে প্রশ্ন করেছি। তাদের কেহই প্রতিদিন ৬ঘন্টা কম সময় উল্লেখ করেনি।

দেখা যায়, ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের এলিটরা প্রত্যেকে প্রতিদিন গড়ে ৭$\frac{১}{২}$ ঘন্টা সময় সরকারী কাজে ব্যয় করেছে। তবে চেয়ারম্যানদেরই সর্বোচ্চ সময় ব্যয় করতে দেখা যায়। সুতরাং এলিটদের কর্মব্যস্ততার এরূপ তথ্য প্রমান দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে, দায়িত্ব পালনে তারা মোটামুটি আন্তরিক।

(২১) গ্রামীন বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে এলিটদের ধারনা

একথা আগেও বলা হয়েছে যে, সরকারীকাজের ফাঁকে ফাঁকে এলিটরা গ্রামীন মানুষের সমস্যাবলী সমাধানের প্রয়াস চালায় এবং এজন্য প্রতিদিনই তাদের কোন না কোন সালিশে অংশ নিতে হয়। মোটকথা, তারা যেমন গ্রামের মানুষ, তেমনি গ্রামের শাসক এবং বিচারকও। তারা গ্রামে অনেক কিছু ঘটাতে পারে, আবার মিমাংসাও করতে পারে। গ্রামের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে এলিটদের প্রায় সকলের কাছেই জানতে চাওয়া হয়েছিল। তবে বেশী সংখ্যকই এব্যাপারে প্রশ্নযো-গ্য জবাব দিতে সক্ষম হয়েছে। মোট ৩০ জন এলিট এব্যাপারে মতামত প্রদান করেছে। তাদের মতে, গ্রাম্য বিচারের তুলনা হয় না। মানসিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি দিক দিয়ে গ্রামীন বিচারের মূল্য রয়েছে। গ্রাম্য বিচারে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এখানে সাক্ষী সাবুদের অভাব হয় না। কিন্তু কোর্ট-কাচারীর বিচার বেশ ব্যয় বহুল। এবং বর্তমান কোর্ট-কাচারী দুর্নীতিতে ভরে আছে। ন্যায় বিচার পাওয়া সাধারন মানুষের জন্য আজ বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাকার অভাবে সাধারন মানুষ আদালতের শরনাপন্ন হতে পারে না। কোন মামলার আসামী ধরতে হলে থানার সাথে যোগাযোগ করতে হয়। কোর্ট ফাইল এদিক থেকে ওদিক নিতে গেলেই টাকার দরকার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায়, কোর্ট কাছারীর বিচার পাওয়া আজ আর সাধারন গরীব মানুষের জন্য নহে। সীমাহীন দুর্নীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে গ্রামের মানুষ ন্যায় বিচারের আশা করতে পারে না। তাছাড়া, কোর্ট কাছারীর বিচার দীর্ঘ দিনের ব্যাপার। অথচ গ্রামীন বিচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে কোন ঘটনা ঘটার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই। গ্রামে ন্যায় বিচার হয় কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে তারা জানায়, সব কেসে ন্যায় বিচার হয়, এমনটি বলা যায় না। তবে কোর্ট কাছারীর পেরেশানির চেয়ে এটা অনেক গুন ভাল। কারন, একজন সাক্ষী কোর্টে গিয়ে যতটা মিথ্যা বলে আসতে পারে গ্রামে তা পারে না। এখানে তার মিথ্যা বক্তব্যের প্রতিবাদ সাথে সাথেই হয়ে যায়। তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার সাহসও কেউ পায় না। তারা মনে করে, গ্রামীন বিচার ব্যবস্থা কিভাবে Systemetic হওয়া উচিত। Systemetic দ্বারা তারা কি বুঝাতে চান। এ প্রশ্নের জবাবে দু'জন মেম্বার বলেছেন যে, গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং এখানে স্থায়ীভাবে বিচারক থাকা উচিত। গ্রাম্য বিচার যদি কোর্ট কাছারীর চেয়েও সুষ্ঠু এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে হয়ে থাকে তবে গ্রাম আদালতের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, এ প্রশ্নের জবাবে তারা বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। আজকাল এক শ্রেনীর মাস্তানের উদ্ভব ঘটেছে যারা গ্রাম্য বিচারকে অচল করে দিচ্ছে। এখন এক রকম রায় দিয়ে এলে পরক্ষনেই মাস্তান পার্টি আর এক রকম রায় দিয়ে গ্রাম্য কোন্দল আরও ঘনীভূত করে তোলে। এমতাবস্থায়, গ্রামে যদি আদালত থাকে এবং কোর্টের রায়ের ন্যায় উহার রায় সবার মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক থাকে, তবে মাস্তানের দৌরাত্ম্য অনেকাংশে কমে যাবে। একজন চেয়ারম্যান বলেছেন অন্য কথা। তিনি বলেছেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের হাতে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন সত্য, কিন্তু একজন আসামী হাজির করার শক্তিটুকু ইউনিয়ন পরিষদের নাই। একজন আসামীকে বার বার নোটিশ করার পরও সে হাজির না হলে ইউনিয়ন পরিষদ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিতে পারে না। তাছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদ কোন রায় প্রদান করলে বা জরিমানা করলে তা আদায় করার মত কোন ক্ষমতাই ইহার নেই। তার মতে, গ্রামীন বিচার ব্যবস্থাকে আরও সুষ্ঠু ও উন্নত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য।

গ্রামীন বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল এলিটই এক মত পোষন করেছেন যে, গ্রামের বিচার গ্রামে হওয়া পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ের জন্যই মংগলজনক।

সুতরাং দেখা যায়, এলিটরা এদিক দিয়েও বিশেষ জ্ঞান রাখে। একথা অনস্বীকার্য যে, আদালতের বিচার দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার এবং তা অত্যন্ত ব্যয় বহুলও বটে। তাই গ্রামে বিচারের একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি গড়ে তোলা হলে গ্রামীন মানুষের জন্য তাই হবে অধিকতর কল্যানকর। আর বেশীর ভাগ এলিটই মূলতঃ একথাই প্রকাশ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের সাথে এলিটদের সম্পর্ক

এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক দলের সাথে এলিটদের জড়িত থাকার ও আনুগত্যের বিশ্লেষন করার অবকাশ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ যেহেতু সরকারের সর্বনিম্ন প্রতিষ্ঠান , সেহেতু এমনটি ভাবা স্বাভাবিক যে, এপ্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই সরকার দলীয় লোক। সাক্ষাতকার গ্রহনের প্রাথমিক পর্যায়ে এটা সত্য বলেও প্রমানিত হয়েছে। প্রত্যেক এলিটই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তিনি সরকারী দলের সমর্থক। কিন্তু পর মুহূর্তেই দেখা যায়, প্রত্যেক এলিটই প্রশ্নের জবাব দানকালে নিজের পছন্দনীয় দলের নাম প্রকাশ করতে কুন্ঠা বোধ করেননি। এই অধ্যায়ে এলিটদের দলীয় পরিচিতি, দল পরিবর্তনকারীদের বিবরন এবং দলের প্রতি আনুগত্য নিয়ে আলোচনা করছি।

এলিটদের দলীয় অবস্থান

এই আলোচনাভুক্ত ৪৬ জন এলিটের প্রত্যেকেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত রয়েছেন। দলের প্রতি সমর্থনের ভিত্তিতে ৬·১ নং সারনীতে তাদের দলীয় পরিচিতি প্রদর্শিত হলো। দেখা যায়, দু'টি ইউনিয়নে তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিত এলিটদের মধ্যে মোট

সারনী নং- ৬·১ : রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থনের ভিত্তিতে এলিটের শ্রেণী ভাগ[১]

নির্বাচন বর্ষ	এলিটের শ্রেণী	এলিটগন সমর্থিত রাজনৈতিক দল			মোট
		আওয়ামী লীগ	মুসলিম লীগ	বি এন পি	
১৯৭৩	চেয়ারম্যান	X	১	X	১
১৯৭৩	ভাইস-চেয়ারম্যান	১	১	X	২
১৯৭৩	মেম্বার	৪	৮	X	১২
১৯৭৭	চেয়ারম্যান	X	X	২	২
১৯৭৭	মেম্বার	১	১	১১	১৩
১৯৮৪	চেয়ারম্যান	১	X	১	২
১৯৮৪	মেম্বার	৩	X	১১	১৪
	মোট	১০	১১	২৫	৪৬

৪৬ জন এলিটই রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত। তাদের প্রাথমিক পরিচয় সরকারী দলের সমর্থক হিসাবে পেশ করেছে। মোট ৪৬ জন এলিট ৩টি মাত্র রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেছে। অপর কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি অত্র ইউনিয়নদ্বয়ের তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিত এলিটগনের সমর্থন নাই। ১৯৭৭ সনের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলিটই বি এন পি-কে সমর্থন করে। অর্থাৎ এসময়ে মোট ১৩ জন এলিটকে বি এন পি সমর্থন করছে। দেখা যায়, এদের অধিকাংশই মুসলিম লীগ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

দল পরিত্যাগ করে এসেছেন।[২] ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল মুসলিম লীগ সমর্থক।[৩] এ সময়ে দু'টি ইউনিয়নে মোট ৮জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে ৬জন মুসলিম লীগ ও ২জন আওয়ামী লীগ। ভাইস-চেয়ারম্যান প্রার্থী ৭জনের মধ্যে ৬জন মুসলিম লীগ ও ১জন আওয়ামী লীগ এবং ৬৫জন মেম্বার প্রার্থীর মধ্যে ২০জন ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক ও বাকী ৪৫জন মুসলিম লীগ সমর্থক। ফলাফলে দেখা যায়, ১৯৭৩ সনে আওয়ামী লীগের ১জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৪জন মেম্বারসহ মোট ৫জন সমর্থক নির্বাচিত হয়েছেন। একই সময়ে ১জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস চেয়ারম্যান ও ৮জন মেম্বারসহ মোট ১০জন মুসলিম লীগ সমর্থক নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭৭সনের নির্বাচন দেখা যায়, আওয়ামী লীগের মাত্র ১জন সমর্থক মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে। অপরদিকে এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আরও ৩জন সমর্থক পুনরায় নির্বাচিত হলেও তারা তাদের পূর্বের সমর্থন পরিবর্তন করে ক্ষমতাসীন দল বি.এন.পি-র প্রতি সমর্থন জানায়। একই ভাবে এই নির্বাচনে মুসলিম লীগেরও মাত্র ১জন মেম্বার নির্বাচিত হয়। এ সময়ে মুসলিম লীগের আরও কয়েকজন নির্বাচিত হলেও তারা ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থনে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। মোট কথা, এ নির্বাচনে ২জন চেয়ারম্যানসহ বি.এন.পির সমর্থক এলিট ছিল মোট ১৩জন। এই ১৩জনই আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের পুরানো সমর্থক ছিল। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভাইস চেয়ারম্যানের একটি আসন পেলেও ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে শীর্ষ স্থানীয় কোন পদ পায়নি। একই ভাবে মুসলিম লীগও ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে শীর্ষ স্থানীয় একটি আসনও পায়নি। এ সময় মাত্র ১জন মেম্বার ছাড়া এই দলের সকলেই বি.এন.পি-কে সমর্থন করেন। কারন, মুসলিম লীগ তখন জিয়াউর রহমান কর্তৃক গঠিত জাতীয় দল তথা জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলের শরীক দল ছিল।[৪] এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, বি.এন.পি-র রাজনৈতিক ভিত মজবুত করার পিছনে রয়েছে মুসলিম লীগের অবদান। মুসলিম লীগের সমর্থকরা নিরংকুশ ভাবে বি.এন.পি-কে সমর্থন জানিয়ে এই দলটির প্রতিষ্ঠা লাভে গঠনমূলক সহযোগিতা করেছে। তাছাড়া, আওয়ামী লীগও বি.এন.পি-র প্রতিষ্ঠা লাভের দ্বিতীয় সহায়ক শক্তি ছিল। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে বি.এন.পি ছিল না। মুসলিম লীগ এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকরাই এ সময়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ১৩জন, মুসলিম লীগের ১০জন এবং বি.এন.পি-র ৩০জন সমর্থক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফলাফলে দেখা যায়, ১জন চেয়ারম্যান ও ৩জন মেম্বারসহ মোট ৪জন আওয়ামী লীগ এবং ১জন চেয়ারম্যান ও ১১জন মেম্বারসহ মোট ১২জন এলিট বি.এন.পির সমর্থক নির্বাচিত হয়েছে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ একটি আসনও লাভ করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক ভাবে সকলেই সরকার সমর্থক হিসেবে পরিচয় দিলেও ১৯৭৩সনে নির্বাচিত মুসলিম লীগ সমর্থক ১০জনের কেহই আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন দলীয় ভিত্তিতে জানা যায়নি। তারা শুধুমাত্র সরকারকে সমর্থন করেছে। কিন্তু ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে তারা সকলে(১জন ছাড়া) বি.এন.পি-র প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে এবং অত্র গবেষনা চলাকালিন সময় পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে।

এলিটদের দলীয় আনুগত্য ও দল ত্যাগের কারনঃ-

অত্র আলোচনায় তিনটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সমর্থক এলিট রয়েছে। অন্য কোন দল সম্পর্কে তারা তেমন আগ্রহী নয়। বিশেষ বিশেষ দলগুলোর কর্মসূচী সম্পর্কেও তারা কিছুটা ওয়াকেবহাল। ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে নির্বাচিত এলিটদের দলীয় আনুগত্য পর্যালোচনা করে একথা সহজেই বলা যায় যে, রাজনীতিতে স্থায়ী সমর্থন বলে কোন কথা নেই। রাজনীতির মূল কথা হলো ক্ষমতা লাভ করা। এলিটরা ক্ষমতা লাভের বিষয়ে বেশ সচেতন বলে মনে হয়। আর এ জন্য রাজনৈতিক মতাদর্শের তোয়াক্কা না করে তারা ক্ষমতাসীন দলের প্রতিই সমর্থন জানায়।

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ আর জনগনের আনুকুল্য লাভ এক কথা নয়। দেখা যায়, যে জনগন আওয়ামী লীগকে একচেটিয়া ভাবে ১৯৭০ সনে ভোট দিয়েছিল, সেই জনগনই ১৯৭৩ সনে মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ উভয়কেই ভোট দিয়েছিল। আবার সেই একই জনতা ১৯৭৭সনে উভয় দলকে প্রত্যাখ্যান করে নবগঠিত বি.এন.পিকে সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে প্রাধান্য বিস্তার করা সত্ত্বেও ১৯৭৭ সনে মুসলিম লীগ মাত্র ১টি আসনই লাভ করে। ঠিক একই অবস্থা আওয়ামী লীগের বেলায়ও ঘটেছে। সমসাময়িক অবস্থা রাজনীতিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। জনগন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে সমসাময়িক অবস্থার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। যে জনগন ১৯৭৩ সনে মুসলিম লীগকে এবং ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখান করে বি.এন.পি-কে ভোট দিয়েছে সেই জনগন যে আবার আওয়ামী লীগ বা মুসলিম লীগকে ভোট দিবে না একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। যাহোক, এলিটরা জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয় বলেই জনগনের সমর্থনই তাদের সমর্থনের চাবি কাঠি। জনগনের আশা-আকাংখা পূরনে যখনই কোন রাজনৈতিক দল ব্যর্থ হয় জনগন তখনই সেই দলের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ফলেসেই দলের ভরাডুবি ঘটে। অপরদিকে, নব প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে দল জনতার মাঝে আত্মপ্রকাশ করে জনগন সে দলকেই সমর্থন দেয়। আর এটাই বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস। সুতরাং রাজনৈতিক দলের প্রতি এলিট বা জন-গন কারও সমর্থনেরই স্থায়ীত্ব নাই। ১৯৭৩ সনে ৫জন এলিট আওয়ামী লীগ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ সনে মাত্র ১জন এবং ১৯৮৪ সনে ৩জন আওয়ামী লীগের সমর্থক নির্বাচিত হয়েছিল। বিরোধী দলের প্রতি তারা সমর্থন জ্ঞাপন করতে পারেনি দু'টি কারনে। প্রথমতঃ জনতার চাপ অর্থাৎ জনতা সেই দলকে পছন্দ করে না। দ্বিতীয় কারন হলো ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতা করে এলিটরা সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। আর একারনেই হয়তো বা এলিটরা দলে দলে ক্ষমতাসীন দলে যোগদান করে। তবে এখানে একটা বিষয় লক্ষনীয় যে, ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত মুসলিম লীগ সমর্থক এলিটরা আদর্শগত ব্যবধানহেতু আওয়ামী লীগে যোগদান করেনি। কিন্তু ১৯৭৭ সনে বি এন পি-তে যোগদান করে। কারন, এক্ষেত্রে দলীয় আদর্শের সামান্যই ব্যবধান ছিল। কিন্তু বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এসময়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক এলিটরা বি এন পি-তে যোগদান করেছে।

এলিটদের দল পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, তারা প্রাথমিকভাবে সকলেই সরকারী দলের লোক। কিন্তু তাদের নিজস্ব সমর্থিত দলও যে আছে তা-ও তারা প্রকাশ করেছে। তবে তাদের মধ্যে এমনও রয়েছে, যে বা যারা সব সময়ই সরকারী দলের প্রতি সমর্থন জানায়। তাদের মধ্যে এমন একজন চেয়ারম্যান পাওয়া গেছে, যিনি জানিয়েছেন যে, তিনি সব সময়ই সরকারী দল সমর্থন করে থাকেন। এমনকি মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ১৯৭৩ সনে আওয়ামী লীগ সমর্থন করেছিলেন। অন্য সব দল পরিবর্তনকারী এলিটরা তাদের দল পরিবর্তনের কারন বর্ণনা করেছে। দল পরিবর্তনের কারন হিসেবে মুসলিম লীগ ত্যাগী এলিটদের একজন জানিয়েছে যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুসলিম লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলিম লীগ ছেড়ে অন্য কোন দলে যোগদান করেনি এবং নিজেদের পূর্ব পরিচয় বহাল রেখেই ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে তারা অংশ গ্রহন করেছে। এ নির্বাচনে তারা যে অভাবনীয় বিজয় লাভ করে তাতে কোন কোন মহল বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে তাদের নতুন পথ বেছে নিতে হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই নতুন পথ অবলম্বনের সুযোগ তাদের এসে যায়। ১৯৭৫ সনের পরিবর্তনকে তারা স্বাগত জানায় এবং নতুন সরকারকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। এ সময়ে তাদের দলও রাজনীতি করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু নেতাদের অধিকাংশই বি.এন.পি-তে যোগদান করায় দল অনেকটা নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া, এক একজন নেতা মুসলিম লীগকে ভেঙ্গে নিয়ে এক একটা ব্যক্তিগত মুসলিম লীগ গড়ে তোলায় দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

মুসলিম লীগের অপর দলত্যাগী এলিটরা উল্লেখযোগ্য কোন কারন তুলে ধরতে পারেনি। তবে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং জিয়াউর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়েই তারা বি.এন.পি-তে যোগ দিয়েছেন বলে জানায়। অপরদিকে, আওয়ামী লীগ ছেড়ে বি এন পি-তে

Dhaka University Institutional Repository

যোগদানকারী ৩জন এলিট দলীয় নেতা ও কর্মীদের কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলীয় ভাবে প্রতিটি গ্রামে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি গঠিত হয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যেই তারা জনগনের আস্থা হারিয়ে ফেলে। রিলিফ সামগ্রী বিতরনে ব্যাপক কারচুপি, স্বজন প্রীতি ও আত্মসাতের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। এমনকি এল ইউনিয়নদ্বয়ের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি সমূহের মনোনীত চেয়ারম্যানও দলীয় ভাবে ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ নির্বাচিত হতে পারেনি। এমনকি কোন একজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল বলেও জানা গেছে। যাহোক, ১৯৭৭ সনে পুনঃনির্বাচিত আওয়ামী লীগ পরিত্যাগকারী এলিটরা তাদের দলত্যাগের কারন হিসেবে এসব বিষয় উল্লেখ করেছে। ভবিষ্যতে বি.এন.পি পরিত্যাগ করার কোন ইচ্ছা তাদের আছে কিনা, জানতে চাইলে তারা জানায় যে, সময়ের আলোকেই তারা সিদ্ধান্ত নিবে। তাদের এ কথার মধ্যে দিয়ে এটাই ফুটে উঠে যে, যে দল ক্ষমতায় এসে তাদের আমন্ত্রন জানাবে সেই দলের সমর্থনেই এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ যে কথাটা একজন চেয়ার-ম্যান মুখ দিয়ে বের করেছে "আমি সব সময়ই সরকারী দল সমর্থন করি" অনেকাংশই সত্য। ক্ষমতার কারনেই এলিটদের অনেকে সময়ে সময়ে তাদের দলীয় সমর্থন পরিবর্তন করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, দল পরিত্যাগের আগে অনেক এলিটই স্ব-স্ব দলের প্রতি বেশ অনুগত ছিল। কিন্তু নানা কারন ও পরিস্থিতিতে এলিটদের সেই আনুগত্য অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয়ে উঠেনি। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল সব সময়ই এলিটদের প্রলোভনের মাধ্যমে স্বীয় দলভুক্ত করার প্রয়াস পায়। অপরদিকে, গ্রামীন এলিটরা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর নিতান্ত সমর্থকই মাত্র। দলীয় নেতৃত্বে তাদের কোন অবস্থান নেই। ফলে দলের প্রতি তাদের দীর্ঘ ও স্থায়ী সমর্থন আশা করা যায় না। স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থনের ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু ইউনিয়নের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বৃহত্তর ক্ষমতার অধিকারী ক্ষমতাসীন দলের সাথে বিরোধিতায় মেতে থাকার মানসিকতা খুব কম এলিটেরই আছে। মুসলিম লীগ সমর্থকদের বি.এন.পিতে যোগদান আওয়ামী লীগের বিরোধীতা হিসেবেই ধরে নেওয়া যায়। এলিটদের দল পরিবর্তনের আর একটা বিশেষ কারন লক্ষ্য করা গেছে। আর সেটা হলো রাজনৈতিক নির্যাতন। ক্ষমতাসীন দল নানাভাবে বিরোধীদের হয়রান করে থাকে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব কেহই সহ্য করতে পারে না। নানা ভাবে হয়রানি করে হয় তাদের দলে ভিড়াতে হবে, নতুবা উৎখাত করতে হবে। বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে নিম্ন পর্যায়েই এরূপ হয়রানি বেশী হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়টি সকল এলিটই উল্লেখ করেছে। এই প্রবনতার ফলে যে কেহই ক্ষমতাসীন হয়ে অনায়াসেই দল গঠন করতে পারে এবং রাতারাতি সেই দলের অগনিত সমর্থক জুটে যায়। ফলে রাজনৈতিক আদর্শের চেয়ে ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থন দানের প্রতিই এলিটরা গুরুত্ব দেয় অধিক। রাজনীতিতে আজ আর আদর্শের বালাই নেই। যখন তখন দল বদল করা অতি সহজ ব্যাপার। একটু পিছনে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামছ ও হানাদার বাহিনীর সহযোগী দালালদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারের ব্যবস্থা করা হলেও তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এর ফলে অনেক নির্দোষ মুসলিম লীগ সমর্থক ও বিচারের সম্মুখীন হয়। পাইকারী ভাবে মুসলিম লীগ সমর্থকদের জেলে পুরে দেওয়া শুরু হলে রাজনৈতিক সংগনে প্রতিবাদ উঠতে থাকে। ফলে সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। একথা আগেও বলা হয়েছে যে, এখানকার মুসলিম লীগাররা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যেমন যায়নি, তেমনি পক্ষও অবলম্বন করেনি। তাদের আত্মীয় স্বজন এমনকি কারও কারও ছেলেও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তথাপি দেখা গেছে, এখানকার কয়েকজন মুসলিম লীগারকে জেলে যেতে হয়েছিল এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়ে সরকারের সাধারন ক্ষমা ঘোষনার আগেই তারা মুক্তি পেয়েছিল। অবশ্য এখানে যে সব রাজাকার ছিল তারা সংখ্যায় এতই নগন্য ছিল যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, এ অবস্থা বিচার করে একথা বলা চলে যে, ১৯৭৩ সনে মুসলিম লীগ সমর্থকরা এমন এক অবস্থায় ছিল যে, দলীয় অবস্থান পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগে যোগদান করার সুযোগ তারা যেমন পায়নি, তেমন আওয়ামী লীগের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার দরুন উক্ত দলে যোগদান করতেও তারা অসম্মত ছিল। এমনকি আওয়ামী লীগাররাও তাদের দলে ভিড়াবার পক্ষপাতী ছিল না। ফলে ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে তারা অংশ নিলেও মুসলিম লীগের নিশানা মুছতে পারেনি। এ দলের সমর্থকই তারা ছিল। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয় আওয়ামী লীগকে শংকিত করেছিল,তাতে সন্দেহ নেই। আর তাই বি.এন.পি-তে যোগদানকে মুসলিম লীগ সমর্থকরা নিরাপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আওয়ামী লীগাররা জানিয়েছে যে, তারা স্বেচ্ছায় দল পরিবর্তন করেছে। কারন, ইউনিয়ন পরিষদে যেহেতু তারা নির্বাচিত হয়েছে, সেহেতু সরকারের লোকদের সাথে কাজ করতে হবে। কাজেই বৈরী হয়ে থাকলে নিজেরই ক্ষতি হবে। তাদের মতে, এজন্য সরকারের লোক হওয়াই ভাল। তাদের দল ত্যাগের কারন উল্লেখ করে ইতিপূর্বে দলীয় নেতা ও কর্মী -দের কার্যকলাপের প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে। এই উভয়বিধ কারনে তারা বি.এন.পি-তে যোগদান করেছে। তাছাড়া বিরোধীদের প্রতি নির্যাতনের দৃশ্য তারা স্বচক্ষে দেখেছে এবং পরিবর্তিত

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় অনুরূপ নির্যাতনের আশংকায় তারাও শংকিত হয়ে উঠেছিল।

দলগত অবস্থান পরিবর্তন সম্পর্কে এলিটরা যে বক্তব্য রেখেছে তা সর্বাংশ সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু এছাড়াও দল বদলের আরও কারন রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে এলিটরা অত্যাধিক ক্ষমতা রাখে। তাদের এই ক্ষমতার উৎস হলো রাজনৈতিক দল। ক্ষমতাসীন দল সমাজের সর্বত্র অত্যাধিক ক্ষমতাবান। আর তাই এলিটরা গ্রামীণ সমাজে নিজেদের আধিপত্য কায়েমের জন্য উক্ত ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হতে বেশ আগ্রহী হয়। কেননা, এ দলের ছত্রছায়ায় অতি অনায়াসে সমাজে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করা যায়। আর এর মাধ্যমে তারা এইটুকু সুযোগ লাভ করে-পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত না হলেও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রনে তাদের হাত থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গবেষণা পরিচালনার সময় ইউনিয়ন পরিষদদ্বয়ের প্রকল্প সমূহের কাজ দেখার জন্য প্রকল্প স্থলে উপস্থিত হয়ে আমি প্রায় সকল প্রাক্তন এলিটকেই উপস্থিত থাকতে দেখেছি এবং তাদের অনেকেই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিরও মেম্বার ছিল। ক্ষমতার ভিত শক্ত রাখার জন্য ক্ষমতাসীন যে কোন দলই সর্বদা এদের দলে ভিড়িয়ে রাখতে চায়। কেননা, সুদুর গ্রাম পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রামীন সংগঠন নেই। তাই নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোকে এসব এলিটের উপরই নির্ভর করতে হয়।

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন দেশীর কাপ কেন্দ্রেই সড়বড়ে। তারা সব সময় সরকারের এবং ক্ষমতাসীন দলের। তাদের সমর্থনের ভিত্তি হল ক্ষমতাসীন সরকার ও তার দল।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিট সম্পর্কে অতি সম্প্রতি গবেষনা সুরু হয়েছে। সহর কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত থাকায় দীর্ঘ দিন যাবত গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটরা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারেনি। কিন্তু আধুনিক কালের রাজনীতি যতই গ্রামমুখী হচ্ছে, গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা ততই তীব্রতর হচ্ছে। অত্র গবেষনায় গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষনায় তাদের প্রকৃতি বিশ্লেষন করা হয়েছে এবং এই বিশ্লেষন মাত্র দু'টি ইউনিয়নের মধ্যেই সীমিত। গবেষনায় দেখা গেছে, গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটরা সমাজের উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করছে। তুলনামূলকভাবে নিম্ন শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। সার্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করায় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আজকাল স্ব-শ্রেণীর লোকদের নির্বাচিত করার প্রেরণা লাভ করছে বলে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য একথা সত্য যে, নিম্ন শ্রেণী থেকে নির্বাচিত হলেও নির্বাচিতরা নিম্ন শ্রেণীটির মধ্যেই অর্থ বিত্তের দিক দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের। মধ্যবিত্তের উপস্থিতি এখানে উচ্চবিত্তের চেয়ে বেশী। সার্বজনীন ভোটাধিকার কায়েম হওয়ায় নিম্নবিত্ত থেকে নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা দিন দিন বেশুমার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি সমাজের অপর দুই শ্রেণীর নেতৃত্ব হ্রাস পেয়ে আসছে। অবশ্য নিম্ন শ্রেণীর এরূপ চেতনা সব সময় সমানভাবে প্রয়োগ হতে দেখা যায় না। সমাজের দরিদ্র ও ভূমিহীনদের মোটেই প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায় না। কারন, সর্বদা পেটের ধান্দায় ব্যস্ত থাকে বলে রাজনীতির দিকে তারা পা বাড়ায় না। তারা স্ব-শ্রেণী বা উচ্চবিত্তকে সমর্থন জানায়। এর ফলে শ্রেণী চেতনার বাস্তব প্রতিফলন সব সময় ঘটে না। সমাজের এই দরিদ্র ও ভূমিহীনদের নিম্ন শ্রেণীভুক্ত দেখানো হয়েছে এবং উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত - এই তিন শ্রেণীর এলিট নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষনায় দেখা যায়, তিন শ্রেণীর এলিটই কম বেশী সম্পদের মালিক। তাছাড়া, এদের বেশীর ভাগই অতিরিক্ত কাজ তথা ব্যবসায়-বাণিজ্যও করে থাকে। এলিটদের সম্পদ ও সম্পত্তি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচনের ব্যয়ভার বহনে সামর্থ্যবান লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনে অংশ নিয়ে থাকে। তবে দু'একটা ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা গেছে, যা অত্র গবেষনায় উল্লেখ করা হয়নি। তা হলো - নিম্নবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহী কতিপয় লোকের আর্থিক সহযোগিতায় নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রার্থী মনোনীত করার দু'টি ঘটনা জানা গেছে। গ্রাম্য কোন্দলের ক্ষেত্র হিসেবে উচ্চবিত্তের সাথে প্রতিযোগিতা মূলক এরূপ প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সনের

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনেই এরূপ দু'টি ঘটনা ঘটেছিল। তবে দু'জন প্রার্থীর মধ্যে কেহই নির্বাচনে জয়ী হতে পারেনি। যাহোক, নির্বাচনে কারও অংশ গ্রহনের মূলে রয়েছে আর্থিক সংগতি। ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকেরা এই ভয়েই নির্বাচনে অংশ নেয় না। এরা কেবল ভোট দেয়, অন্যদের নির্বাচিত করে। কিন্তু নিজেরা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায়না। আজ যারা ইউনিয়ন পরিষদে 'নিম্নবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করছে, তারা একদিন ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের মতই ছিল এবং নিরলস শ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা আজ কিছুটা বিত্তবান হয়েছে। তাদের সব ধরনের সম্পর্ক আজও দরিদ্র শ্রেনীর মধ্যেই সীমিত রয়েছে।

গ্রামীন রাজনীতিতে মহিলাদের অনুপস্থিতিও বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়। তাদের এই অনুপস্থিতির কারনও বিশ্লেষন করা হয়েছে। মনোনীত করে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কায়েম করা হলেও সুষ্ঠুভাবে গ্রামীন রাজনীতিতে মহিলারা তেমন এগিয়ে আসছে না। এমনকি দেখা গেছে, মহিলা ভোটাররা অনেক ক্ষেত্রে তাদের ভোটাধিকারও প্রয়োগ করে না। আর যারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, স্বামীদের উপর নির্ভর করেই তা করতে হয়। ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে প্রতি ইউনিয়নের জন্য যথাক্রমে ২জন ও ৩জন মহিলা মেম্বার মনোনীত করা হলেও তারা ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডের সাথে আদৌ জড়িত হয়েছে বলে প্রমান পাওয়া যায়নি। তারা কেবল মনোনীত মহিলা এবং সরকারী কেতাবে একথাই লেখা আছে। দেখা গেছে, এসব কাজে তারা সময় দিতে পারে না। সংসার নিয়েই তাদের সর্বক্ষন ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে গ্রামীন রাজনীতিতে মহিলাদের পদচারনা নেই বললেই চলে। জাতীয় রাজনীতিরও একই দশা। এক্ষেত্রেও মহিলা এলিটদের অনুপস্থিতি বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়। যদিও কোন কোন দলে মহিলাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তথাপি পুরুষ নেতৃত্বের তুলনায় তারা একান্তই নগন্য এবং তারা এরূপ নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছে। যাহোক, গ্রামীন রাজনীতিতে যে নোংরা পরিবেশ, এই পরিবেশে গ্রামীন মহিলাদের রাজনীতি রীতি মত বেমানান। গ্রামের সুল্প শিক্ষিত মহিলারা এই পরিবেশের কারনেই রাজনীতিতে অংশ নিতে আগ্রহী হয় না।

গ্রামীন রাজনীতিতে আজ পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে সত্য, কিন্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণীটি শ্রেণী চেতনাকে পুরাপুরি কাজে লাগাতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। কেননা, বিত্তবানদের নিকট অনেক ক্ষেত্রে তারা দায়বদ্ধ থাকে বলে উচ্চবিত্ত দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আগে তাদের কাছ থেকে ভোট আদায় করা হত, তারা ভোট দিতে পারত না। তখনকার দিনে প্রার্থী সংখ্যাও ছিল নগন্য। কিন্তু ১৯৭৩, ১৯৭৭ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে দেখা যায়, কম বেশ হলেও প্রতি গ্রাম থেকে দু'জন

Dhaka University Institutional Repository

করে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। আরও লক্ষণীয় বিষয়, তরুণ নেতৃত্বের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে গ্রামে প্রবাদ ছিল বয়স বাড়লে মানুষের বুদ্ধি পাকা হয়। আর এই হিসাবে তরুণরা গ্রামীণ নেতৃত্বে আসার সুযোগ পেত না। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সেই প্রবাদের অপমৃত্যু ঘটেছে। কারন, সেই পাকা বুদ্ধির লোকেরা আর নেতৃত্বে আসতে পারছে না। এলিটদের বয়স এ সময়ে সর্বোচ্চ ৫৫ বছর ছিল। আর সর্ব নিম্ন ছিল ২৫ বছর।

গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটদের পটভূমি আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতাও আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার ফলে গ্রামীণ নেতৃত্বে সম্পর্কে একটা নতুন ধারনার সৃষ্টি হয়েছে। জনগনের ভোটে এলিটরা নির্বাচিত হয়-এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। তবে তারা এমন সব এলিট নির্বাচিত করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা যেমন একেবারে নবীন নয়, তেমনি একেবারে প্রবীন নয়। নবীন আর প্রবীনের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেই এলিটদের নির্বাচিত করেছে। প্রতিনিধি নির্বাচনে নবীন এলিট যেমন নির্বাচিত হচ্ছে, তেমনি প্রবিন এলিট ও নির্বাচিত হচ্ছে। আর এই হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। তবে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে এটার তফাত নির্দিষ্ট মেয়াদে বর্তমানে চার বছর শেষ হলে এলিটদের বৈধতা থাকে না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সকলকে নতুন ভাবে পুনরায় একজন নির্বাচি -ত হতে হয়। Rehman Sobhan লিখেছেন, "Under the Basic Democracies system 85 percent of the sitting basic democrats sought re-election in 1964, and of them 57.74 percent were re-elected." এই গবেষনা অনুসারে দেখা যায় ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ২২জন এলিট ১৯৭৭ সনে পুনরায় নির্বাচিত হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ১২জন পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ৬জন মৌলিক গণতন্ত্রী ও ছিল। আর ১৯৭৩ সনে এরাই প্রবীন ছিল। ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ২জন চেয়ারম্যান এবং ১৯৭৭ সনে নির্বাচিত ২জন চেয়ারম্যান ও মৌলিক গনতন্ত্রী ছিল। অনুরূপভাবে ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ২জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও মৌলিক গণতন্ত্রী ছিল। ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে ১৯৭৭ সনের নির্বাচিত ২জন চেয়ারম্যান ও মৌলিক গণতন্ত্রী ছিল। অনুরূপ ভাবে ১৯৭৩সনে নির্বাচিত ২জন ভাইস-চেয়ারম্যানও মৌলিক গণতন্ত্রী ছিল। ১৯৮৪ সনের নির্বাচনে ১৯৭৭সনের নির্বাচিত সদস্য পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্বাচনে অবতীর্ন হয়। কিন্তু এ নির্বাচনে মাত্র ৮জন এলিট পুনরায় নির্বাচিত হতে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সনের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, ভোট কেন্দ্র দখল, থানায় নিয়ে ভোট গননা, ৩দিন পরে ফলাফল ঘোষনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত নির্বাচনে যিনি কারচুপির আশ্রয় নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, সুষ্ঠুভাবে ভোট অনুষ্ঠিত হলে তাঁর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। গ্রাম্য দলাদলি, সামাজিক মানুষের মাঝে শ্রেণী বিভেদ যারা করে এবং জনগনের প্রতি যারা শ্রদ্ধা দেখায় ও কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি করে না-এই উভয় শ্রেণীই নির্বাচনে প্রার্থী ছিল। আর এসব বিষয় নির্বাচন তিনটিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৭৭ সনে সুষ্ঠু ভাবে ভোট সম্পন্ন হওয়ায় '৭৩ এর নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীই জয়লাভ করেন। আলোচনায় একথাও বলা হয়েছে যে, নির্বাচনে কারচুপি সংক্রান্ত তথ্য শুধু মাত্র উত্তর ইউনিয়ন পরিষদের বেলায়ই প্রযোজ্য। দক্ষিন ইউনিয়ন পরিষদে উভয় নির্বাচনই শান্তিপূর্ন ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনে জনগন সব সময়ই প্রার্থীর ব্যক্তিগত দোষগুন বিচার করে থাকে। সুষ্ঠু নির্বাচন অর্থাৎ কোন রকম কারচুপি বা জোর জবরদস্তি ছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বরাবরই সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব কেবল গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানই নয়, জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদিতেও কায়েম হওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু বাংলাদেশে এমনটি যে কবে হবে বলার উপায় নেই। যাহোক, যাদের অহংকার নেই, বংশ গৌরব বা আভিজাত্যের অহমিকা নেই, মানুষের মাঝে উঁচু নীচু ভেদাভেদ করে না, বরং সবার সাথে একাকার হয়ে বাস করে, মানুষের মাঝে অশান্তির বদলে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে-গ্রামের মানুষ সব সময় তাদেরই নির্বাচিত করতে চায়। ঠিক একই কারনে বিত্তবান পরিবারের হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৯৭৩ সনে দক্ষিন ইউনিয়নে যাকে নির্বাচিত করেছে এবং এই একই ব্যক্তি ১৯৭৭ সনের নির্বাচনেও নির্বাচিত হয়েছে। গ্রামের জনসাধারন অভিজাত ও অনভিজাত উভয় শ্রেনীর এলিটকেই নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত করে থাকে। অভিজাত এলিটদের নেতৃত্ব আশা করলে ইউনিয়ন পরিষদ বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে। কেননা, নির্বাচিত এলিটদের পরিবারের সদস্যরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিনিধির পদ লাভ করার সুযোগ লাভ করবে। আর এমনটি কোন অবস্থাতেই প্রত্যাশিত নয়। বর্তমানে যে ভাবে নবীন ও প্রবীন অর্থাৎ অভিজাত ও অনভিজাতের নেতৃত্ব গড়ে উঠছে এটাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

ইউনিয়ন পরিষদ সর্বনিম্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান হলেও জাতীয় রাজনীতিতে এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। ইহার নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় রাজনীতিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। কেননা, ভোটারদের অধিকাংশই গ্রাম্য সমাজের লোক। কাজেই তারা যে জাতীয় রাজনৈতিক দলকে সমর্থন

Dhaka University Institutional Repository

দিবে সেই দলের সমর্থক ও কর্মীরাই এখানকার এলিট নির্বাচিত হবে। তথাপি গ্রামীণ রাজনীতি জাতীয় রাজনীতির অংশ মাত্র। জাতীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলের আধিপত্য বিরাজমান। আর সেসব দলের নেতৃবৃন্দ হন পশ্চিমা ঘেঁষা আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবী। মোট কথা, তারা পশ্চিমা রাজনীতির অনুসারী। গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের প্রভাব তাদের উপর থাকলেও গ্রামীণ এলিটরা তাদের অনুসারী মাত্র। অপরদিকে, গ্রামীন রাজনীতিতে অর্থ বিত্তের আধিপত্য বিরাজমান। একেবারে বিত্ত হীনের কোন অস্তিত্বই গ্রামীন রাজনীতিতে লক্ষ্য করা যায় না। জাতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে কোন বিশেষ ইজম বা মতবাদ অনুযায়ী। কিন্তু গ্রামীন রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে গ্রামীন মানুষের ঐতিহ্যগত বন্ধন, ধর্ম, আত্মীয়তা, প্রতিবেশী সম্পর্ক, গোষ্ঠী দলাদলি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে। গ্রামের মানুষ কোন ইজম বা মতবাদ বুঝে না। তাই উল্লেখিত বিষয়গুলিই নির্বাচন সময়ে তাদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে থাকে। গ্রামীন মানুষ জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে ততটা সচেতন না হলেও কোন বিশেষ নেতার প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়লে তাকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন দিয়ে যায়। জনগনের এরূপ সমর্থন অনেকটা অন্ধ সমর্থনের মতই হয়ে থাকে। কারণ, তাদের পছন্দনীয় নেতা যখনই তাদের কল্যান করতে অক্ষম হন বা তাদের দুঃখ দৈন্য বৃদ্ধি পায়, তখনই তাদের সমর্থন তারা প্রত্যাহার করে নেয়। জনগনের এরূপ সমর্থনের সুযোগ বিরোধী দল বিশেষ ভাবে কাজে লাগাবার প্রয়াস পায়। এর ফলে জাতীয় রাজনীতিতে উত্থান-পতন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। জনগনকে যে দল যতদিন খুশি খুশি রাখতে সক্ষম হবে, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা তার পক্ষে ততদিনই সম্ভব হবে। সুতরাং একথা বলা চলে যে, গ্রামীণ রাজনীতি জাতীয় রাজনীতির অংশ হলেও তা জাতীয় রাজনীতির চাবি কাঠিও বটে।

আমাদের সমাজ এখনও সনাতন অবস্থায় রয়ে গেছে। যদিও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনেরা আধুনিক পন্থা অবলম্বন করছে, তথাপি গ্রামীন সমাজে প্রাচীন পন্থীরাই এখনও সংখ্যা গরিষ্ঠ। শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামে আধুনিকপন্থীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি উভয় পন্থী লোকের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সংঘাতের ফলে অবশ্য প্রাচীন পন্থীরা দিন দিন গ্রামীণ রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছে। নানাবিধ কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ প্রাচীন পন্থীরা আধুনিক জীবন যাপনে তেমন আগ্রহী নয়। অনেকে আজও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনে নারাজ। এমন এক সময় ছিল যখন রেলে চড়া, মাইক্রোফোন ও রেডিও ব্যবহার এবং শিক্ষিত মেট্রিকের আগন্তু ব্যবহারকে তারা অসামাজিকতা মনে করত, তাদের গোঁড়ামির মূলে ধর্মীয় কোন প্রেরণাও ছিল না। এমনকি তাদের এমনই প্রতাপ সে সময়ে ছিল যে, কথিত সামগ্রী

Dhaka University Institutional Repository

যারা ব্যবহার করত, তাদের সমাজচ্যুত করা হত। আজ তারা পরাজিত-তাদের গোঁড়ামিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে তরুনদের আগমন যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর প্রভাব ততই তিরোহিত হয়ে চলছে। কারন, তরুনরা সাধারনতঃ আধুনিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী লোক গ্রামে বাস করে। সাম্প্রতিক কালের এক জরিপে দেখা যায়, গ্রামে ৮১'৮ মিলিয়ন অর্থাৎ ৮১'৮% ভাগ লোক বাস করে। যুগ যুগ ধরে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি গ্রামগুলো অবহেলিত পড়ে আছে। অথচ সব রকমের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে অবশিষ্ট জনসমষ্টি অর্থাৎ ১৮'২% ভাগ শহরবাসী। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, গ্রামের উন্নতিই জাতীয় অগ্রগতির অন্যতম সোপান। গ্রামোন্নয়নের জন্য ষাটের দশকে অনেক কর্মসূচীই নেওয়া হয়েছিল। এমনকি দেশের স্বাধীনতা লাভের পর আরও ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছু রাস্তা-ঘাট ছাড়া গ্রামের আর তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচী সফল করার জন্য চাই গ্রামীন মানুষের সহযোগিতা। আর এই সহযোগিতা লাভের পথ সৃষ্টি করার দায়িত্ব গ্রামীন রাজনৈতিক এলিটগনের উপরই বর্তায়। এলিটরা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যে কোন কর্মসূচী হাতে নিয়ে জনগনের সহযোগিতা লাভের জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ করবে- এটাই বাঞ্ছনীয়। কারন, এলিটরা নেতা বা অন্য কিছু হউক, আসলে তারা জনসেবক।

অত্র আলোচনাভুক্ত দু'টি ইউনিয়নের এলিটগন নিজেদের জনসাধারনের মত সাধারন মানুষ হিসাবে পরিচয় দিয়েছে। গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কেও তারা ইতিবাচক জবাব দিয়েছে। কিন্তু তথাপি গ্রামের তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না। দুর্নীতির বিষয়ে তারা সকলে মুখ না খুললেও যারা সামান্য কিছু বলেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের সোচ্চার মনে হয় না। অথচ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে কোন কর্মসূচিতেই জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যারা ক্ষমতার ছোঁয়া পায় তারা যে জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধি, একথা একেবারেই ভুলে যায়। যারা জনগনের কথা মনে রাখতে চায়, দুর্নীতির উর্দ্ধে থাকতে চায়, প্রতি পদেই তারা প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করে। এজন্য গ্রামীন রাজনীতিতে ভাল লোকের বড়ই অভাব। তবে অত্র আলোচনার দু'টি ইউনিয়নের এলিটদের মাঝে গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে যে তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে, তা একেবারে নগন্য না হলেও সীমিত পর্যায়ের। যাহোক, জাতীয় স্বার্থে গ্রামের অগ্রগতি সাধন করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি একাজের জন্য যোগ্য এলিটের আবির্ভাবও অপরিহার্য। আর এজন্য

Dhaka University Institutional Repository

তাদের দল নিরপেক্ষ রাখা এবং তাদের দুর্নীতির উর্ধ্বে রাখার জন্য সরকারী কর্তাদের দুর্নীতি মুক্ত করা, এলিটদের কাজের তদারকী করা এবং সরকারীভাবে তাদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা আবশ্যক বলে মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১- এমাজ উদ্দিন আহমদে - তুলনামূলক রাজনীতি : রাজনৈতিক বিশ্লেষণ গ্রন্থে জন বার্কেসের লেখার উদ্ধৃতি, গোল্ডেন বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা -৪।

২- Dankuart A Rustow- The Study of Elites : Who's Who, When and How, World Politics, Vol. 18, No. 4, July, 1966, p-711

৩- Gaetano Mosca- The Ruling Class, New York, McGraw Hill Book Co. 1939, p-50.

৪- M.A. Chaudhury- Rural Government in East Pakistan, Puthighar Ltd. Dhaka, 1969, p-3.

৫- The Bengal Code, Vol. II, Government of Bengal, Lagislative Department, Government Printing, Bengal Government Press, Ali Pore, Bengal, 1939.

৬- Ibid, p- 150.

৭- Rokeya Rahman Kabir- Administrative Policy of the Government of Bengal (1870-1890), National Institute of Public Administration, Dhaka, p-10.

৮- The Bengal Code, Op. cit. Section-14, p-153.

৯- Ibid, Section-15, p-153.

১০- V. Venkata Roa & Niru Hazarika- Local Self-Government in India, S. Chand & Co. Ltd. Ramnagar, New Delhi, India, 1980 p-63.

১১- For details see Administrative Policy of the Government of Bengal (1870-1890), by Rokeya Rahman Kabir.

১২- Ali Ahmed- Administration of Local Self-Government for Rural Areas in Bangladesh, Local Government Institute, Dhaka, 1979, p-1.

১৩- M. Rashiduzzaman- Politics and Administration in Local Councils. Oxford University Press, 1968. p-5.

১৪- Ali Ahmed - Op. Cit. p-16.

১৫- N.C. Roy - Rural Self-Government in Bengal, Calcutta University, 1936, p-131.

১৬- Rehman Sobhan- Basic Democracies, Works Programms and Rural Development in East Pakistan, Oxford University, 1968, p-74.

১৭- Rounaq Jahan- Pakistan : Failure in National Integration, Columbia University Press, New York and London, 1972, p-111.

Dhaka University Institutional Repository

১৮- Ibid, p-119.

১৯- Inayatullah: Basic Democracies : Administration and Development. Pakistan Academy for Rural Development, Peshwar, 1964, p-29.

২০ - Ibid, p-30.

২১ - Rounaq Jahan- Op. cit. p-111.

২২ - Ibid, p-111.

২৩ - Ibid, p-65.

২৪ - Ibid, p- 128.

২৫ - P.O. No. 7 of 1972,
(Bangladesh Local Councils and Municipal Committees (Dissolution and Administration).

২৬ - P.O. No. 17 of 1972
(Bangladesh Local Councils and Municipal Committees (Dissolution and Administration) (Amendment)).

২৭ - P.O. No. 110 of 1972
(Bangladesh Local Councils and Municipal Committees (Dissolution and Administration) (Second Amendment))

২৮ - P.O.No. 113 of 1972
(Bangladesh Local Councils and Municipal Committees (Dissolution Administration) (Third Amendment))

২৯- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, তৃতীয় সংশোধন, ১৯৭৩।

৩০- পূর্বোল্লিখিত।

৩১- P.O. No. 22 of 1973
(Bangladesh Local Government (Union Parishad and Paurashava) Order, 1973.)

৩২- The Local Government Ordinance, 1976 (Ordinance No. XC of 1976).
Bangladesh Gazette, Extraordinary. 22nd November, 1976.

৩৩- Village Court Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXI of 1976).

৩৪- The Local Government Ordinance ,1983 (Ordinance No. LI of 1983), Bangladesh Gazette, Extraordinary, 12th September, 1983.

Dhaka University Institutional Repository

৩৫- V. Pareto- The Mind and Society(1916), 4 Vols. New York, Dover Publication, Inc. 1963 edition, Sections 2031-2034.

৩৬- Ibid, Section 2183.

৩৭- T.B. Bottomore - Elites and Society, London, C.A. Watts Co. 1964, p-14.

৩৮- C.W. Mills - The Power Elite, New York, Oxford University Press, 1956, p-18.

৩৯- Ibid, p- 18.

৪০- এনাম উদ্দিন আহমেদ - পূর্বোক্তস্থান, পৃষ্ঠা- ১৪।

৪১- Lasswell, D. Larner & E.C. Rothwell - The Comperative Study of Elites, Strandford : Hoover Institute Studies, Quoted in T.B. Bottomore's Elite and Society, p- 13.

৪২- Rokeya Rahman Kabir - Op. cit. p-10.

৪৩- এম এ রহিম - বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃঃ- ২৩০।

৪৪- Peter J. Bertocci - Rural Comminuties in Banglades : Hajipur and Tinpara, C. Maloney edited, South Asia: Seven Comminuty Profiles, New York, p- 101.

৪৫- এর ইউনিয়ন দু'টি চাঁদপুর জেলার অধীনে হলেও গবেষণায় এদের কুমিল্লা জেলার অংশ হিসেবেই দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১- দৈনিক জনতা, ৫ জানুয়ারী, ১৯৮৭ ইং।

২- সাবির আহমদ - বাংলাদেশ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ এপ্রিল, ১৯৮৯ ইং।

৩- পূর্বোক্তস্থান।

৪- পূর্বোক্তস্থান।

৫- এম আর আখতার মুকুল - কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬-Sunjeeb Chander Chatterjee- Bengal Ryots : Their Rights and Liabilities , K.P. Bagchi & Company, Calcutta. 1977, p- XXXII-XXXVII.

৭- Moinuddin - Titumir and His Followers in British Indian Records. 1831 - 1833 , p-12.

৮ - এম আর আখতার মুকুল - পূর্বোক্তস্থান, পৃষ্ঠা - ৭১।

৯ - বিস্তারিত জানার জন্য ডঃ মঈনুদ্দিন রচিত পূর্বোক্তস্থান গ্রন্থ দেখুন।

১০- বিপুল রঞ্জন নাথ - বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ , বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা - ১১৯।

১১- Sayed Razi Wasti - Lord Minto and the Indian Nationalism Move-ment 1905 to 1910 , Clarendon Press, Oxford, 1914, p-26.

১২- মোহাম্মদ হান্নান - বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস , ১ম খন্ড, গ্রন্থলোক, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা - ৩[illegible]।

১৩- বংকিম চট্টোপাধ্যায় - আনন্দ মঠ (উপন্যাস) , তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ৩৮।

১৪- Sayed Razi Wasti - Op. cit. p- 29.

১৫- মোহাম্মদ হান্নান- পূর্বোক্তস্থান, পৃষ্ঠা - ৬।

১৬ -Sayed Razi Wasti - Op. cit. p- 33.

১৭- Ibid, p-30.

১৮- Ibid, p-81.

১৯- Ibid, p-33.

২০- বিপুল রঞ্জন নাথ - পূর্বোক্তস্থান , পৃষ্ঠা - ২১।

২১- Moudud Ahmed - Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy 1950 - 1971 , University Press, Dhaka, 1979, p-3.

২২- Ibid, p-4.

২৩- তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া - পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা, ১৯৮১ , পৃষ্ঠা - ২৩

২৪- মোহাম্মদ হান্নান- পূর্বোক্তস্থান, পৃষ্ঠা - ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৪– Rounaq Jahan – Op. cit. p– 37.

২৫– Moudud Ahmed – Op. cit. p– 61.

২৬– [illegible] – পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ২৩।

২৮– M.A. Chaudhury – The Civil Service in Pakistan , National Institute of Public Administration, Dhaka, 1963, p–78.

২৯– মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম – বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ , ইমপ্রেস পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ৫৭।

৩০– পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৫।

৩১– পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৫৫।

৩২– Moudud Ahmed – Op. cit. p– 9.

৩৩– মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম – পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ১৮।

৩৪– পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা –১১।

৩৫– K.B. Sayed – Politics in Pakistan : The Nature and Directi-on of Change , Praeger Publishers, New York, U.S.A. 1980, p– 57 .

৩৬– [illegible] – পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ২৮।

৩৭– পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা –২৫।

৩৮– K.B. Sayed – Op. cit. p– 37.

৩৯– Rounaq Jahan – Op. cit. p– 55.

৪০– আবুল মনসুর আহমদ – শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা – ৩।

৪১– Dawn, 1st January, 1965.

৪২– অলি আহাদ – জাতীয় রাজনীতি ঃ ১৯৪৫ – ১৯৭৫, পৃষ্ঠা – ৩৩১।

৪৩– Mohabbat Khan and Habib Mohammad Zafarullah (edited), Politics and Bureaucracy in a New Nation Bangladesh, Dhaka, 1980, p– 4.

৪৪– আবুল মনসুর আহমদ – পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫ – আবুল মনসুর আহমদ – পূর্বোক্তগ্রন্থ, পৃষ্ঠা – ৬।

৪৬ – বংগ বন্ধুর ৭ই মার্চ, ১৯৭১ সনের ভাষণ। ঐতিহাসিক রেইসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, রেডিও – টেলিভিশনে তাঁর সেই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়নি। জনতার চাপের মুখে পরদিন অর্থাৎ ৮ই মার্চ সরকার উক্ত ভাষণ রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করতে বাধ্য হয়।

৪৭ – মুহম্মদ মুদাসসির হোসেন – মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, ষষ্ঠ অধ্যায়, বুকস প্যাভিলিয়ন, রাজশাহী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা – ৮১।

৪৮ – বয়োবৃদ্ধ লোকের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণিত।

৪৯ – বর্তমানে মহকুমা প্রশাসন নেই। প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

৫০ – ১৯৮২ সনে সামরিক শাসন জারির পর প্রতিটি থানাকে মান উন্নীত থানায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়।

৫১ – চাঁদপুর মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হলেও গোহাটী ইউনিয়নদ্বয়কে এই আলোচনায় কুমিল্লা জেলার অংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে কেবল মাত্র চাঁদপুরের থানাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

৫২ – ইউ এন ও অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৫৩ – এই কাঠামো পুরাতন জেলা ও মহকুমার ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে।

৫৪ – দোয়াল্লাই পরগনার অধীনে আরও অনেক এলাকা ছিল। তবে এই আলোচনায় কচুয়া থানার সে সব এলাকা উল্লেখ করা হয়নি।

৫৫ – উক্ত ইউনিয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৬ – উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস কচুয়া থেকে গৃহীত।

৫৭ – ইউ এন ও অফিস, কচুয়া প্রদত্ত তথ্য।

৫৮ – পূর্বোক্তগ্রন্থ।

৫৯ – ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের দেওয়া তথ্যানুসারে দেখানো হয়েছে। ইউনিয়ন গুলো কোন পরিসংখ্যান গৃহীত হয়নি বলে উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস থেকে জানানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬০-Statistical Pocket Book of Bangladesh 1989: Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, p-72.

৬১- ইউনিয়ন পরিষদ অফিস প্রদত্ত তথ্য।

৬২-Statistical Pocket Book of Bangladesh 1989- Op. cit. p- 72.

৬৩- ইউনিয়ন পরিষদ অফিস প্রদত্ত তথ্য।

৬৪- পূর্বোক্তিস্মরণ।

৬৫-Statistical Pocket Book of Bangladesh 1989- Op. cit. 261.

৬৬- পূর্বোক্তিস্মরণ।

৬৭- 'তোরণাই খুত ছিল কেবলমাত্র ভোগ দখলের অধিকার- জমির মালিকানা পাওয়ার যোগ্য নহে। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে হওয়ার পর এই খুত বিলোপ করে দখলদার মালিকানা প্রদান করা হয়।

৬৮- হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর প্রতি পুরাপুরি সম্মান প্রদর্শনে আগ্রহশীল, কোরান ও হাদিসে পূর্ণ আস্থাবান এবং ইসলামের খলিফা, ইমাম ও পীর-আওলিয়াগণের প্রতি আস্থাশীল মুসলমানরাই সুন্নী হিসাবে পরিচিত।

৬৯- আরবের নেজদের অধিবাসী মোহাম্মদ ইবনে ওহাব এই আন্দোলন প্রবর্তন করেন। তার নামা-নুসারে এই আন্দোলনের নাম হয় ওহাবী আন্দোলন। তার অনুসারীরা ওহাবী নামে পরিচিত এই ওহাবী মতবাদ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আবদুল ওহাব নজদী মুসলমানদের ঐক্য নষ্টে পরিচালনার জন্যই ইসলাম ধর্মে একটি নতুন মতবাদ প্রচার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম কোন মতবাদ নহে, শুধু আল্লাহ প্রেরিত ধর্ম।

৭০- হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর জীবদ্দশায় আবুবকর পূর্বে মোসলমানে এ সম্প্রদায়ের লোক অন্তর্ভুক্তি থাকলেও ইসলাম থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়। তারা এখনই খারিজী নামে পরিচিত। ইসলাম থেকে বহিষ্কারের পরও তারা নিজেদের মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে।

৭১- ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)কে এক সম্প্রদায়ের লোক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য করে এবং খিলাফতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করার জন্য তৎপর হয়। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর অপর তিন সাহাবীকে খলিফা মনোনীত করায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং নানা গোলযোগ সৃষ্টি করে। ফলে হযরত আলী (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর তারা শিয়া নামে তাঁর অনুসারীদের আত্মপ্রকাশ করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য খলিফার খিলাফত অস্বীকার করে। তাছাড়া, তাদের মধ্যে এমনও বিশ্বাস আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) নবুয়ত পাওয়ার যোগ্য ছিলেন।

৭২ – বারেলোর দেওবন্দ নামক শহরের অধিবাসী মাওলানা ইলিয়াসের প্রবর্তিত মতবাদের অনুসারীরা তাবলিগী নামে পরিচিত। ওহাবী মতবাদের মত এই মতবাদ নিয়েও মুসলমানদের বিতর্ক রয়েছে।

৭৩ – ইসলামী জ্ঞানে বিশেষভাবে পারদর্শী, ইসলামী আইন-কানুন পরিপূর্ণভাবে অনুসরণকারী এবং ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ দানে সক্ষম আলেমই কেবলমাত্র পীর হওয়ার যোগ্য।

৭৪ – প্রফেসর মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম – দিনাজপুরের ত্রিধারী ঐতিহ্য ও খলিফার খাতির, দৈনিক ইনকিলাব, ২ জুলাই, ১৯৯০, পৃষ্ঠা – ৮।

৭৫ – পূর্বোক্তিক্রম।

৭৬ – চট্টগ্রাম মাইজভান্ডার শরীফের অনুসারীরা মাইজভান্ডারী নামে পরিচিত।

৭৭ – ইসলাম ধর্মে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশেবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া – এই চারটি তরিকা রয়েছে।

৭৮ – Small Area Atlas of Bangladesh: Mouzas and Mohallas of Comilla District, Bangladesh Statistic Bureau, Planning Ministry, Dhaka, June, 1989, p-28.

৭৯ – ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রকৃত অনুমান ভিত্তিক প্রদত্ত তথ্য।

৮০ – ইউনিয়ন পরিষদ অফিসদ্বয়ের সামনে বোর্ডে রক্ষিত তথ্য থেকে গৃহীত।

৮১ – ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের দেওয়া তথ্য মতে।

৮২ – 'বাতা' স্থানীয় নাম। যে সব ছন গাছে ফুল হয়, সে গুলো বাঁশের কঞ্চির মত শক্ত ও লম্বা হয়। এগুলো সাধারণতঃ ঘরের বেড়া তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৮৩ – ইউনিয়ন পরিষদদ্বয়ের অফিস বোর্ডে রক্ষিত তথ্য থেকে গৃহীত।

৮৪ – ইউ এন ও অফিস, কচুয়া প্রদত্ত তথ্য।

৮৫ – ইউনিয়নদ্বয়ের চেয়ারম্যানগণ প্রদত্ত তথ্য।

৮৬ – Didarul Islam– Rural Finance, Published by A.W. Tarafder, Dhaka, 1986, p- 78.

তৃতীয় অধ্যায়

১ – ১৯৫৪ সনে নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রী এবং সমকালীন লোকের অভিজ্ঞতার আলোকে

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণিত হল।

২ - এর আলোচনার মূলে রয়েছে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তিনটি নির্বাচনই আমি প্রত্যক্ষ করেছি। দু'টি ইউনিয়নে মাত্র ৩টি নির্বাচন কেন্দ্র ছিল। এখানকার বাসিন্দা হিসাবে ইউনিয়নগুলোর নির্বাচনসমূহের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত ছিলাম এবং এরপরও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে আমি স্থানীয় এলিট ও বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নিতে সক্ষম হয়েছি।

৩ - Shamsul Huda Haroon - Bangladesh : Voting Behaviour- A Pse -phologocal Study. 1973. Dhaka University, 1986, p-v.

৪ - ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী দলের চেয়ারম্যানের বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

৫ - ১৯৭৩ সনে পরাজিত উত্তর গৌহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী প্রদত্ত তথ্য।

৬ - সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য।

৭ - পূর্বোক্তস্থান।

৮ - পূর্বোক্তস্থান।

৯ - পূর্বোক্তস্থান।

১০ - পরাজিত ও নির্বাচিত উভয় প্রার্থীর ভোটই গড়ে দেখানো হয়েছে। চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই হিসাব দেখানো হয়েছে।

১১ - প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শ্রেণী ভিত্তিক ভোটের হিসাব দেখানো হল।

১২ - দক্ষিণ গৌহাটীর চেয়ারম্যান ১৯৭৭ সনের পরবর্তী কোন এক নির্বাচনে পরাজিত হয়েছি- লেন বলে জানা যায়।

১৩ - নির্বাচন কমিশন, আঞ্চলিক অফিস চাঁদপুরে গিয়ে জানা যায়, '৮২-এর সামরিক অভ্যুত্থানের পর সরকারী নির্দেশে পুরাতন নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আর তাই ১৯৭৩ ও ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে গৃহীত ভোটের যে হিসাব দেখানো হয়েছে তা প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই দেখানো হয়েছে। কাজেই এই হিসাব একেবারে নির্ভুল নাও হতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

১ - F.R. Khan - District Town Elites in Bangladesh, Asian Survey Vol. XIX, No.5, 1979, pp- 484.

Dhaka University Institutional Repository

২- এলিটদের বর্তমান বয়স থেকে ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনের নির্বাচনোত্তর সময় বাদ দিয়ে তৎকালীন বয়স দেখানো হয়েছে।

৩- সরেজমিনে গৃহীত তথ্য।

৪- নির্বাচনের তিন/চার মাস পরে এক নৌ-দুর্ঘটনায় উক্ত পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান নিহত হলে পরে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে নির্বাচিত এলিটকেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫- সরেজমিনে গৃহীত তথ্য।

৬- ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত ২জন এবং ১৯৫৭ সনে নির্বাচিত ২জন সহ মোট ৪জন মেম্বার কেবলমাত্র নাম দস্তখত করতে জানে। তাই তাদের সাক্ষরিত দেখানো হয়নি।

৭- ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত দশম শ্রেণীর শিক্ষাগত যোগ্যতার ভাইস-চেয়ারম্যান ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে মেম্বার নির্বাচিত হন।

৮- ১৯৭৩ সনের ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষাগত যোগ্যতার ভাইস-চেয়ারম্যান ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সনে মেম্বার নির্বাচিত হন।

৯- গ্রামে অবস্থানকারী বেশ কয়েকজন শিক্ষিত লোক গ্রামীন রাজনীতির প্রতি অনীহা প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, এমন নোংরা পরিবেশে শিক্ষার কোন দাম নেই।

১০- এলিটদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ কালে তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১১ - সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

১২- পূর্বোক্তরূপ।

১৩ - সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য। পুনরায় নির্বাচিত এলিটদের সম্পত্তির হিসাব দুইবার দেখানোর ফলে দুইবার হিসাবে এসেছে।

১৪ - সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করে এই হিসাব দেখানো হয়েছে।

১৫ - সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬ - সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য।

১৭- পূর্বোক্তরূপ।

১৮- পূর্বোক্তরূপ।

১৯- পূর্বোক্তরূপ।

২০- এতদসম্পর্কিত তথ্য সরেজমিনে গৃহীত হয়েছে। এলিটদের সাথে আলাপ করে এবিষয়ে জানা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

১- V.M. Sirsiker- The Rural Elites in a Developing Society, New Delhi, Orient Longman Ltd. 1970. p- 96.

২- ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানগণ প্রদত্ত তথ্য মতে বর্ণিত হলো।

৩- সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

৪- পূর্বোক্তস্থান।

৫- পূর্বোক্তস্থান।

৬- পূর্বোক্তস্থান।

৭- পূর্বোক্তস্থান।

৮- রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম ১৯৬২ সনে শুরু হয়েছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল - রাস্তা ঘাট, পুল কালভার্ট, বাঁধ প্রভৃতি মেরামত করা। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই কর্মসূচীর বদলে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু হয়।

৯- সৈয়দ মকসুদ আলী অনূদিত প্লেটোর রিপাবলিক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ- ১৮৪।

১০- পূর্বোক্তস্থান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১- সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য মতে।

২- ধর্মীয় নামে রাজনীতি করা ১৯৭২ সন থেকে সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।

৩- গবেষনাকালীন ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থানকালে নির্বাচনপ্রার্থীদের দলের মতামত, নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং সমকালীন মুরুব্বীদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই তথ্য পরিবেশিত হল।

৪- ১৯৭৬ সনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী গনতান্ত্রিক দল গঠিত হয়। মূলতঃ কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত এই দলটি ছিল একটি জোট। ১৯৭৮ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই দলের নিজস্ব অংশ ও অন্যান্য শরীক দলের অংশ বিশেষ এবং অন্যান্য দলের দল ছুট নেতাদের নিয়ে বি এন পি গঠিত হয়।

৫- মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলামের মতে, রাজাকারদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মার্চ, ১৯৮৯। অপরদিকে, আলবদর ও হানাদারদের সহযোগী বাহিনী ছিল। এদের সংখ্যাও চল্লিশ হাজারের অনুর্দ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নপত্র

প্রথম ভাগ

১। ক) নাম –

খ) পিতার নাম –

গ) গ্রাম –

ঘ) ওয়ার্ডের নাম –

ঙ) ইউনিয়ন –

চ) ধর্ম –

ছ) লিংগ –

২। ক) বয়স –

খ) জন্মস্থান –

গ) পিতার জন্মস্থান –

ঘ) দাদার জন্মস্থান –

৩। ইউনিয়ন পরিষদে যে পদে আছেন –

১৯৭৩ – চেয়ারম্যান/ ভাইস-চেয়ারম্যান/ মেম্বার।

১৯৭৭ – চেয়ারম্যান/ মেম্বার/ মনোনীত মহিলা মেম্বার।

১৯৮৩ – চেয়ারম্যান / মেম্বার / মনোনীত মহিলা মেম্বার।

৪। ক) আপনি কি ইউনিয়ন বোর্ড / কাউন্সিল / পরিষদে কখনও নির্বাচিত হয়েছিলেন ?

– হাঁ / না।

খ) নির্বাচিত হয়ে থাকলে কবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ?

বৎসর –

গ) আপনার পিতা / স্বামী / কোন নিকট আত্মীয় কখনও ইউনিয়ন বোর্ড / কাউন্সিল / পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন ?

– হাঁ / না।

ঘ) নির্বাচিত কোন চেয়ারম্যান/ ভাইস-চেয়ারম্যান/ মেম্বারের সাথে আপনার আত্মীয়-তার সম্পর্ক আছে কি?

– হাঁ / না।

ঙ) থাকলে নাম বলুন –

নাম –

Dhaka University Institutional Repository

৫। ক) আপনি কি কখনও ইউনিয়ন বোর্ড / কাউন্সিল / পরিষদের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন ?

- হাঁ / না।

খ) পরাজিত হয়ে থাকলে কি কারনে পরাজিত হয়েছেন ?

- কারন উল্লেখ :-

গ) আপনি কি বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চান ?

- হাঁ / না।

ঘ) যদি চান, তবে কি উপায়ে ?

৬। আপনার পরিবার কি যৌথ পরিবার, না একক পরিবার ?

- যৌথ / একক।

৭। ক) আপনি কি ধরনের পরিবার পছন্দ করেন ?

- যৌথ / একক।

খ) আপনার পছন্দের কারন কি ?

- কারন উল্লেখ :-

গ) আপনার পরিবার একক হলে আপনি কখনও যৌথ পরিবারভুক্ত ছিলেন কিনা ?

- হাঁ / না।

ঘ) তাহলে আপনি কবে বিভক্ত হয়েছেন ?

- সময় উল্লেখ :-

ঙ) আপনার পরিবার যৌথ হলে এপরিবার দ্বারা আপনার কি কি উপকার হচ্ছে ?

-

৮। ক) আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত ?

- ১৯৭৩ =

- ১৯৭৭ =

- ১৯৮৪ =

খ) আপনার স্ত্রী কত জন ?

-

গ) আপনার ছেলে মেয়ে কত জন ?
- ছেলে জন মেয়ে - জন।

Dhaka University Institutional Repository

৯। নির্বাচনকালীন আপনার পেশা-

১৯৭৩- (প্রকৃত) (সহকারী)

১৯৭৭- (প্রকৃত) (সহকারী)

১৯৮৪- (প্রকৃত) (সহকারী)

১০। ক) আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা -

খ) আপনার স্বামীর / স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা-

গ) আপনার পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা -

ঘ) আপনার মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা -

ঙ) আপনার সন্তানের শিক্ষাগত যোগ্যতা -

১১। ক) নির্বাচনকালীন আপনার ভূমির পরিমান -

- ১৯৭৩ =

১৯৭৭ =

১৯৮৪=

খ) আপনার পিতার / স্বামীর ভূমির পরিমান -

১২। ক) আপনার কি রেডিও / টেলিভিশন আছে ?

- হাঁ / না।

খ) আপনি কি রেডিও / টেলিভিশনের খবর শুনেন ও টেলিভিশন দেখেন ?

- হাঁ / না।

গ) যদি শুনেন বা দেখেন, তবে নিয়মিত, না অনিয়মিত ?

- নিয়মিত / অনিয়মিত।

১৩। ক) আপনি কি খবরের কাগজ পড়েন ?

খ) যদি পড়েন, তবে নিয়মিত , না অনিয়মিত ?

- নিয়মিত / অনিয়মিত।

১৪। আপনি আপনাকে সমাজের কোন শ্রেণীর লোক হিসাবে বিবেচনা করেন ?

- উচ্চবিত্ত / উচ্চ মধ্যবিত্ত / মধ্যবিত্ত / নিম্ন মধ্যবিত্ত / নিম্নবিত্ত ।

দ্বিতীয় ভাগ

১। এমন ৩টি সমস্যার উল্লেখ করুন যা বর্তমান সময়ে আপনার এলাকার লোকেরা মোকাবেলা

Dhaka University Institutional Repository

করছে -

ক)

খ)

গ)

২।ক) আপনার বাছাই করা সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় সম্পর্কে বলতে পারেন কি ?

- হাঁ / না ।

খ) যদি পারেন, বলুন -

৩।ক) আপনার ইউনিয়নের উন্নতির জন্য সরকারী প্রকল্প ছাড়া আপনি আর কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন কি ?

- হাঁ / না ।

খ) যদি করে থাকেন, তবে নাম বলুন -

৪। ক) আপনি কি মনে করেন আপনার এলাকায় নতুন কোন প্রকল্প নেওয়া উচিত ?

- হাঁ / না ।

খ) যদি তেমন মনে করেন, তবে নাম বলুন -

৫। আপনি কি পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করেন ?

- হাঁ / না ।

৬। আপনি কি ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা মেম্বারদের প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করেন ?

- হাঁ / না ।

৭। আপনি কোন সমস্যার উপর অধিক গুরুত্ব দিবেন ?

- জাতীয় / স্থানীয় / নিরক্ষর ।

৮। আপনার মতে বাংলাদেশের জন্য কি ধরনের সরকার ব্যবস্থা উপযোগী ?

- মন্ত্রীপরিষদ শাসিত / রাষ্ট্রপতি শাসিত / নিরক্ষর ।

৯। আপনার উল্লেখিত সরকার ব্যবস্থা আপনি কেন সমর্থন করেন ?

- কারন উল্লেখ :-

১০। ক) আপনার ইউনিয়নে / ওয়ার্ডে গ্রাম উন্নয়নের কি কি কাজ চলছিল / চলছে ?

-প্রকল্পের নাম :-

খ) আপনি কি সে সবের সাথে জড়িত ছিলেন / আছেন ?

- হাঁ / না ।

গ) আপনি কি মনে করেন সে সব কাজ যথাযথভাবে হইয়াছে / হইতেছে ?

Dhaka University Institutional Repository

- হাঁ / না ।

ঘ) যদি না হয়ে থাকে, তবে কি কারনে ?

-

ঙ) এভাবে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত থাকলে গ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কে আপনি কি আশাবাদী ?

- হাঁ / না ।

১০। চেয়ারম্যান/মেম্বারদের সততা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে আপনার ধারনা কি ?

-

১১। প্রতিদিন সরকারী কাজে আপনি কতটা সময় ব্যয় করেন ?

১২। গ্রামীন বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

তৃতীয় ভাগ

১। ক) আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা সদস্য ?

- হাঁ / না ।

খ) তা'হলে কোন দলের সমর্থক ?

-

গ) আপনি কি দলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন ?

- হাঁ / না ।

ঘ) আপনি কবে এই দলে যোগ দিয়েছেন ?

২। বর্তমান দলের প্রতি সমর্থন দানের আগে আপনি কোন দলের সমর্থক ছিলেন ?

-

৩। ক) আপনি কখন দল ত্যাগ করেছেন ?

-

খ) দল ত্যাগের কারন কি ?

-

গ) বর্তমান দলে যোগদানের কারন কি ?

-

Dhaka University Institutional Repository

BIBLIOGRAPHY

Ahmed, Ali- Administration of Local Self-Government for Rural Areas in Bangladesh. Local Government Institute, Dhaka,1976.

Ahmed, Badruddin-Leadrship in Village Co-Operative. Bangladesh Academy For Rural Development(BARD), Comilla, 1972.

Ahmed, Emajuddin- Bureaucratic Elites in Bangladesh and Their Development Orientations.The Dhaka University Studies,Vol.XXVIII, Part-A, June,1978.

---------- - Military Elites And Their Development Role, Asian Studies,Vol.1, January-June,1980.

---------- -Bureaucratic Elites In Segmented Economics Growth:Pakistan And Bangladesh,University Press Ltd.Dhaka,1980.

---------- -Bangladesh Politics, Center For Social Studies, Dhaka, 1980.

---------- -Dominant Bureaucratic Elites In Pakistan And Bangladesh,Center For Social studies,Dhaka,1979.

Ahmed,Moudud- Bangladesh Constitutional Quest For Autonomy, University Press Ltd.1979.

Ahmed,Mustaq- Government And Politics In Pakistan.Pakistan Publshing House, Karachi,1963.

Ahmed, Moinuddin Khan- Titumir and His Followers In British Indian Records (1831-1833 A.D.).Islamic Foundation, Dhaka, 1980.

Ahmed, Rafiquddin- The Bengal Muslims(1871-1906): A Quest For Identity. Oxford University Press, New York, 1981.

Ahmed,Tajuddin And Hamid Khan Bhashani, Maulana- Bangladesh:Cnstitutional History. Public Relations Deptt. of Bangladesh, Dhaka, 1971.

Alam,Md.,Manjurul-Characterstics of Newly Representative (Chairman, Vice-chairman and Member) of the Union Parishad of Kotwali Thana,BARD,Comilla,1973.

Ali, Azhar- Rural Development In Bangladesh.BARD,Comilla,1979.

Ali,K. - Bangladesh:A New Nation.Ali Publication,Dhaka,1982.

Dhaka University Institutional Repository

Ali,Quazi Azhar- District Administration In Bangladesh.Institute of Public Administration, Dhaka,1978.

Almond,G.A.& Powell,G.B.-Comperative Politics. Little Brown & Co. Toronto, 1966.

Almond, G.A.(With his associates)-Comperative Politics Today. Little Brown & Co.Boston, 1974.

Ambedkar, H.B.-Pakistan or Partition of India.Thaker & Co. Ltd. Bombay, 1946.

Anisuzzaman, Md.-Bangladesh Public Administration and Society. Bangladesh Books International Ltd. Dhaka, 1979.

Ara,Bilquis and Ara,Roushan-Violence and the Union Parishad Leadership.Local Government Quarterly. Vol.3 Nos.1-4,March, June,September & December,Dhaka, 1979.

Barman,Dalem,Ch.-Emerging Leadership Patterns In Rural Bangladesh,A Study. Center for social Studies, Dhaka, 1988.

Bertocci, Peter,J.-Rural Community In Bangladesh:Hajipur and Tinpara,C.Maloney,ed. South Asia:Seven Community Profiles, New York.1970.

Chaterjee,Sunjeeb Chander - The Bengal Ryots:Their Rights and Liabilities ,K.P. Bagchi & Co. Calcutta, 1977,

Chaudhury,G.W. - Democracy in Pakistan ,Green Book House,Dhaka, 1963.

---------- - Last Days of United Pakistan ,C,Hurst,London, 1974.

Chaudhury,Kalyan - Genocide in Bangladesh , Orient Longman Ltd. Bombay, 1972.

---------- - Government And Politics In Pakistan ,Puthi-ghar Ltd. Dhaka, 1968.

Chaudhury, M.A.- Rural Government in East Pakistan , Puthighar Ltd. Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

----- ------- - The Civil Service in Pakistan , National Institute of Public Administration, Dhaka, 1963.

Eckestein,Herry & Apter,D.E.- Comperative Politics ,ed.The Free Press,New York,1962.

Elliot,Tepper - Changing Pattern in Rural East Pakistan ,Pakistan Academy for Rural Development,Comilla,1966.

Franda,Marcus - Bangladesh:The First Decade , Asia Publishers Pvt. Ltd.New Delhi,Madras,1982.

Haroon,M.(edited) - Who's Who in Parliament ,Shaukhin Prokashani, Dhaka,1979.

Harun, Shamsul Huda - Bangladesh:Voting Behaviour And Psepholo-gical Studies , Dhaka University,1986.

---------- - Parliamentary Behaviour in Multinational State:1947-1958 ,Bangladesh Experience,Asiatic Society,Dhaka,1984.

Hoque,A.N.Shamsul - Administrative Reforms in Pakistan ,Institute of Public Administration,Dhaka,1970.

Hossain,M.(edited) - History of Freedom Movement(1831-1905) , Vol.II,Part-2, Pakistan Historical Society,Karachi,1961.

Inayatullah - Basic Democracies - District Administration And Development , Pakistan Academy for Rural Development, Peshwar, 1964.

Islam,A.K.M.Aminul - Bangladesh Village:Conflict and Cohesion Cambridge:SchenkmanPublishing Company,1974.

Islam,Badiul - External Influences Upon the Co-Operative Village Societies ,BARD,Comilla,1967.

Islam,Didarul-Rural Finance. Published by Tarafder,Dhaka,1986.

Islam,Nurul - Development Planning in Bangladesh. C.Hurst & Co. London, 1977.

Jahan, Rounaq - Bangladesh Politics:Problems and Issues ,University Press, Dhaka,1980.

---------- - Pakistan:Failure in National Integration. Columbia University Press,New York & London,

Dhaka University Institutional Repository

Jahangir,B.K.(edited) - The Journal of Social Studies. No.30, October,1987,Center for Social Studies,Dhaka.

Kabir,Golam - Minority Politics in Bangladesh. Vikash Pub. New Delhi, 1980.

Kabir,Rokeya Rahman - Administrative Policy of the Government of Bengal(1870-1890). National Institute of Public Administration,Dhaka.

Khan,F.R. - District Town Elites in Bandladesh. Asian Survey, Vol. No.XIX No.5,May,1979.

Khan,Md.Mohabbat and Trop,J.P. - Bangladesh:Society Politics and Bureaucracy, Center for Administrative Studies, Dhaka,1984.

Khan,Md.Mohabbat and Zafarullah,Habib Md.(edited) - Politics and Bureaucracy in a New Nation Bangladesh. Center For Administrative Studies,Dhaka, 1980.

---------- - Politics, Administration and Change. Bi-Annual Journal,Vol.v,No.2, July to December, 1980. Center for Administrative Studies, Dhaka.

Lasswell,H.D.Lerner,D.And Rothwell,E.C. - The Comperative Study of Elites. Strandford University Press, New York, 1952.

Lipset,S.M. - Elites in Latin America. Oxford University Press New York, 1967.

Mallick,A.R. - British Policy and the Muslims in Bengal(1757-1856), 2nd edition,Bangla Academy,Dhaka,1977.

Maloney,Clarence - Behaviour and Poverty in Bangladesh, The University Press Ltd. Dhaka, 1986.

Mannan,M.A. - Communication and PIan Change in Bangladesh. BARD, Comilla, 1976.

Mannan,Md.Seraj - The Muslim Political Parties in Bengal(1936-1947), Islamic Foundation, Dhaka,1987.

Moniruzzaman,Talukder - The Politics of Development:The Case of Pakistan(1947-1958). Green Book House Limited, Dhaka,1971.

Dhaka University Institutional Repository

------------ - Recent Approaches to the Study of Politics. Administrative Science Review, vol.1,March, 1967, Dhaka.

------------ - Radical Politics and Emergence of Bangladesh. Bangladesh Books International Ltd.Dhaka,1975.

------------ - The Fall of Mujib Regime And Its Aftermath. Asian Survey, Vol.XVI,No.2,February, 1976

------------ - The Bangladesh Revolution And Its Aftermath. Bangladesh Books International Ltd, Dhaka,1980.

Mascarenhas, Anthony - Bangladesh:A Legacy of Blood. Hodder and Stonghton, London,1986.

Michel,Robert - Political Parties(1915). The Free Press, New York, 1956.

Mills. C.W. - The Power Elite. Oxford University Press, New York, 1956.

Mohan, Jag - The Black of Genocide in Bangladesh. Gupta Book Center, New Delhi, 1971.

Mosca, G. - The Ruling Class(1896). McGraw Hill Book Co. 1939.

Muhit,M.A. - Emergence of a New Nation. Bangladesh Books International Ltd. Dhaka,1978.

Nahar, Shamsun - The Agrarics Uprising of Titumir:The Economics Revivalist Movement. The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol.I, 1976.

Organski,A.F.K. - Stages of Political Development. Alford A. Kanof, New York,1956.

Pareto, V. - The Mind and Society(1916). 4 vols. Dover Pub. Inc. New York, 1963.

Parry, Geraint - Elites and Polyarchies. George Allen and Unwin Ltd. London,1969.

Pye, Lucian - Aspects of Political Development. Little Brown and Co. Boston,1966.

Rashiduzzaman,M. - Politics and Administration of Local Councils.

Dhaka University Institutional Repository

Oxford University Press,Dhaka,1968.

Roa.V.Venkata And Hazarica, Niru - Local self Government in India S.Chand & Co. Ltd. New Delhi,1980.

Rose, Arnold,M. - The Power Structure, Oxford University Press, New York, 1967.

Roy,N.C. - Rural Self-Government in Bengal, Calcutta University Press, Calcutta,1930.

Russel,Batrand - Power:A New Social Analysis, Unwin Books,London, 1962.

Rustow,Dankwart,A. - The Study of Elites:Who's Who,When and How, World Politics, Vol.19,No.4,July,1966.

Samad,Abdus - Bangladesh:Facing The Failure, Dhaka, 1983.

Sayeed,B. Khalid - Politics in Pakistan:The Nature and Direction of Change, Praeger Pub.New York,USA,1980.

---------- - Pakistan: The Formative Phase, Oxford University Press, London,1966.

---------- - The Political System of Pakistan, Oxford Univesrity Press,Dhaka,1967.

Shaarma,S.S. - Rural Elites In Inida, Sterling Pub.Pvt.Ltd. New Delhi,1976.

Sirsiker,V.M. - The Rural Elites in a Developing Society. Orient Longmans Ltd,New Delhi.1970.

Sobhan,Rehman - Basic Democracies,Works Programms and Rural Development in East Pakistan, Oxford University Press,Dhaka,1968.

---------- - Crisis of External Dependence:The Political Economic of Foreign Aid to Bangladesh, Dhaka University Press,1982.

Wood,C.D. - The Political Process in Bangladesh:A Research Note on Anwarul Hoque edited Exploitation and the Rural Poor, BARD, Comilla, 1976.

Wasti, Sayed Razi - Lord Minto and the Indian Nationalist Movement, 1905-1910, Clarendon Press,Oxford,1964.

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ, আবুল কালাম – বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, শিকাদাদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩ ।

আলম, মাহবুবুল – বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত, নয়ালোক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৭৩ ।

আহমদ, আবুল মনসুর – বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮২ ।

.... – শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮১

.... – আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৯।

আহমদ ডঃ এমাজ উদ্দিন – তুলনামূলক রাজনীতিঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, গোল্ডেন বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮১ ।

আহমদ, মনিরুদ্দিন – বাংলাদেশঃ বাহত্তর থেকে পঁচাত্তর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮০ ।

আহাদ, অলি – জাতীয় রাজনীতি ঃ ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, বর্ণমালা, মুদ্রায়ণ, ঢাকা ।

ইসলাম, আনোয়ারুল – বাংলাদেশঃ সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ ।

ইসলাম, মোহাম্মদ জহিরুল – বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ, ইমপ্রেস পাবলিকার্স, ঢাকা, ১৯৮৩ ।

ইসলাম, মাজহারুল – বাংলাদেশ লাঞ্ছিত, অনুবাদ গ্রন্থ, মূল-এন্থনী ম্যাসকারেনহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩।

ইসলাম, রফিকুল – লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, [illegible], ঢাকা, ১৯৮৫।

ইসলাম, সিরাজুল – বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা, সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৭৮ ।

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল – সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, দেওয়ান আবদুল কাদের, ঢাকা, ১৯৭৮ ।

উজ্জামান, হাসান – সমসাময়িক রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, নভেল সিটি, ঢাকা, ১৯৭৮ ।

.... – বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন, অনা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

উমর, বদরুদ্দিন- পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, মাওলা ব্রাদার্স, ঢা(কা),
১৯৭০।

.... যুদ্ধ পূর্ব বাংলাদেশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭।

কামাল, মেসবাহ- আসাদ ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, বিবর্তন, ঢাকা, ১৯৮৬।

কাসেম, মোঃ আবুল- বাংলাদেশ জাতি ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

খান, আতাউর রহমান- ওজারতির দুই বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭২।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম- আনন্দ মঠ (উপন্যাস), তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।

চৌধুরী, আসাদ- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

চৌধুরী, আবদুল গাফফার- বাংলাদেশ কথা কয়, মুক্তধারা, ১৯৭১।

চৌধুরী, শামছুল হুদা- একাত্তরের রণাঙ্গন, বিজয় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭১।

ছদরুদ্দিন- বাংলাদেশ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ-নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮০

জমান, আলমগীর- বাংলাদেশের গ্রামীন সংস্কৃতি, ব্র্যাক প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৫।

জলিল, মেজর এম,এ,- সীমাহীন সমর, জনতা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪।

দাস, বিপুল রঞ্জন- বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক দলিল, বুক সোসাইটি, ঢাকা,
১৯৮২।

.... বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, (১৮৬১....) বুক
সোসাইটি, ১৯৮২

বেগম, নাজমিননুর- সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, নবেল জিউ, ঢাকা, ১৯৮৪।

মানিক মিয়া, তফাজ্জল হোসেন- পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল,
ঢাকা, ১৯৮১।

মামুন, এম,(সম্পাদিত)- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংগালী সমাজ, ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র, ইতিহাস বিভা(গ)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুকুল, এম, আর, আখতার- কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৭।

.... পঞ্চাশ দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৩৯১ বাংলা।

মোহাম্মদ, আবু- বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ ও অর্থনীতি, প্রকাশক-শহীদুল ইসলাম, টপর আর্ট প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৭।

রহমান, গাজী শামছুর- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।

রহমান, আবু মোঃ আতাউর- বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষঃ একটি প্রামাণ্য চিত্র, পাপড়ি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩

রহিম, এম, এ,- বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রকাশনায়- নুরজাহান রহিম, ঢাকা, ১৯৭৬।

.... বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

শরীফ, আহমদ- মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭।

শাহজাহান, মোহাম্মদ- বাংলাদেশঃ রক্তের ঋণ, এন্থনী ম্যাসকারেনহাস প্রণীত *A legacy of Blood* গ্রন্থের অনুবাদ, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৬।

সায়ীদ, আবু- বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ, ঢাকা প্রেস, ঢাকা, ১৯৭২।

হক, আবুল ফজল- বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

হান্নান, মোহাম্মদ - বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১ম খন্ড, গ্রন্থলোক, ঢাকা, ১৯৮৬।

PUBLIC DOCUMENTS

The Bengal Code, vol. II, Government of Bengal, Legislative Department, Government Printing, Bengal Government Press, Ali Pore, Bengal, 1939.

Peoples Republic of Bangladesh - Constitution of The Peoples Republic of Bangladesh, Ministry of Law + Parliamentary Affairs, Dhaka, 1972.

Dhaka University Institutional Repository

---------- - Bangladesh Local Councils and Municipla Committee(Dissolution and Administration) Order, 1972,(P.O. No. 7 of 1972), Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Dhaka, 1972.

---------- - Bangladesh Local Councils and Municipal Committee (Dissolution and Administration)(Amendment) Order, 1972(P.O. No. 17 of 1972), Dhaka, 1972.

---------- - Bangladesh Local Councils and Municipal Committees (Dissolution and Administration) (2nd Amendment) Order, 1972. (P.O. No. 110 of 1972).

---------- - Bangladesh Local Councils and Municipal Committees (Dissolution and Administration)(Third Amendment) Order, 1972. P.O. No. 119 of 1972.

---------- - Bangladesh Local Government (Union Parishad and Pourashava) Order 1973 (P.O. No. 22 of 1973), Dhaka,

---------- - The Local Government Ordinance, No.XC of 1976,

---------- - Local Government Ordinance, 1976, (Ordinance No.XC of 1976). Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Dhaka, 1976.

---------- - The Local Government (Union Parishads)(Amendment) Ordinance,1983, Ordinance No. LXXI of 1983, Ministry of Law and Land reforms, Law and Parliamentary Affairs Division, Dhaka, 1983.

---------- - The Local Government (Union Parishads)(Amendment) Ordinance, 1984,Ordinance No. LXXXIII of 1984, Ministry of Law and Justice, Dhaka, 1984.

---------- - Bangladesh Parliament(A Hand Book) Dhaka, 1976.

---------- - Bangladesh Population census, 1974,Comilla District, Statistic Division, Ministry of Planning, 1977.

---------- - 1979 Statistical Year Book of Bangladesh, Ministry of Planning, Statistics Division, Bureau of Statistics, Dhaka, 1979.

---------- - Statistical Pocket Book of Bangladesh 1989: Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, Dhaka, 1989.